শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৪শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ { ৪র্থ সংখ্যা

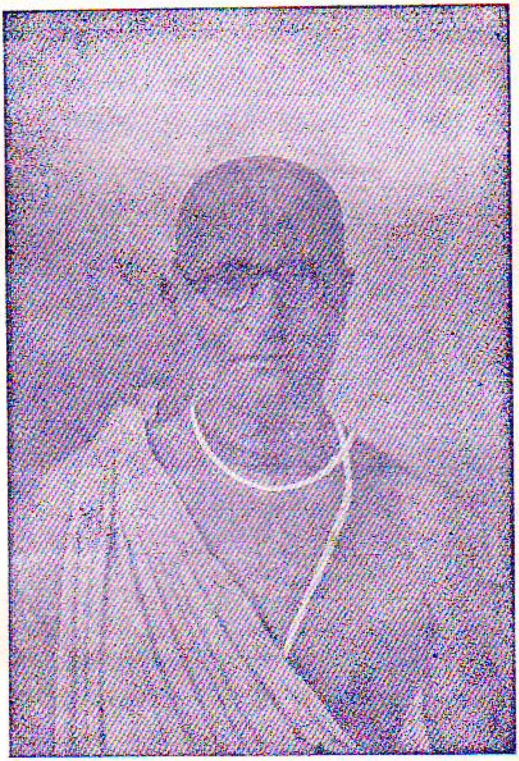

জগদ্‌গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
কার্য্যালয় :—
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৩৩-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী. বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুশ্চত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৫ গোবিন্দ হইতে ৫০৬ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৯ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯২ মার্চ্চ হইতে ১৯৯৩ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

চতুশ্চত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম — **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

অমৃতযোগের সন্ধান — ৫।১৮৭
অনুকরণ ও অনুসরণ — ৩।১০৭
আদৌ গুরু-পদাশ্রয় — ১।১৬
আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামীর শুভাবির্ভাব-বাসরে — ২।৬৮
আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীগুরুদেব — ৪।১৪৬, ৫।১৮০
আমার প্রভুর মহিমা — ৫।১৭৩, ৮।২৯৫
কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা — ৯।৩৪৪, ১০।৩৮২
কাম — ৬।২২৯
কৃষ্ণরূপ-মাধুরী—শ্রী [কবিতা] — ৭।২৬২
কেশবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী — ১২।৪৪১
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল
(১) শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত — ১।৩১
২।৭০, ৩।১১১
(২) চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত ৪।১৫০, ৫।১৯০
(৩) হাজী দেশারথ কলেজ, পাঠানখালিতে প্রদত্ত ৬।২৩৩, ৭।২৭০, ৮।৩১১,
৯।৩৫৪, ১০।৩৮৬, ১১।৪২০, ১২।৪৬৩
গুরুর কৃপা—শ্রীশ্রী — ৩।১১৭
গোবর্দ্ধনাষ্টকম্—শ্রী — ৮।২৮১
গোঁড়ামি কি সঙ্কীর্ণতা ? — ১১ ৪২৯, ১২।৪৫১
গৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব] — ১।১০
গৌর-রূপ-গুণ-বর্ণন—শ্রী [কবিতা] — ১।৩৫
গৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও
জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রী [বিবরণ] — ১০।৩৯৪
গৃহকর্ম্ম—বন্ধন-স্বরূপ বিস্মৃতির ফল — ১২।৪৬১

প্রবন্ধের নাম — **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

চৈতন্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী ১।১
চৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ—শ্রী [প্রতিবাদ] ২।৭৫
"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের শ্রীগৌরপর-ব্যাখ্যা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৭
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৩।১১৯
জগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ৪।১২১
জন্মাষ্টমী [কবিতা] ৬।২২৮
জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ৮।৩১৭
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৫।১৯৯
দশমে দশম লক্ষণ [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব] ৭।২৫১
দীক্ষা ১।১৩, ২।৫১, ৩।৯৪
নববর্ষ ১।৩৬
নবনির্ম্মিত ভজন-কুটীরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম [বিবরণ] ২।৭৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ২।৭৮
নবদ্বীপ-স্তোত্রম্—শ্রীমন্ ১১।৪৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪৩৯
নামের মহিমা [কবিতা] ১০।৩৮০
নিন্দা ৭।২৬৩
নির্ভীক কে ? ৯।৩৪০
নৃসিংহ-স্তবঃ—শ্রী ২।৪১, ৩।৮১
পতিতপাবন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ৯।৩৪৮, ১০।৩৭৭
পঞ্চতত্ত্ব ৬।২২২
পতিতই কৃপা পায় ১১।৪০৯
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৪, ২।৪৩, ৩।৮৪, ৪।১২৫, ৫।১৬৪, ৬।২০৫, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৩, ১২।৪৪৪
প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শুভাবির্ভাব-বাসরে ৩।১০৫
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল ৪।১২৮, ৫।১৬৮, ৬।২০৯, ৭।২৪৯, ৮।২৮৯, ৯।৩২৭, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৫, ১২।৪৪৯
প্রচার-সংবাদ [বিবরণ] ৪।১৬০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রকৃত স্বার্থদর্শী কে ?	৫।১৭৫
প্রমাণ ও প্রমেয় [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৮।২৯০, ৯।৩৩০, ১০।৩৭২, ১১।৪০৬
প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শুভাবির্ভাব-তিথিতে	১১।৪৩৭
প্রকৃত সুখ কি ?	১২।৪৭১
প্রাকৃত কর্ম্মী ও শুদ্ধ ভক্তের পার্থক্য বিচার	৯।৩৩৮
বিশ্বে শ্রীচৈতন্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৬
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [শ্রীপত্রিকার ভিক্ষাবৃদ্ধির বিজ্ঞাপন]	১০।৩৯৯, ১১।৪১৯
বিশ্বরূপ কি শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্বরূপ ?	১১।৪১৫
ব্যাসপূজা ও আরাধনা—শ্রী [কবিতা]	১।১৯
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১২।৪৭৩
ভগবান্ যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ	১।২২, ২।৫৯
ভক্তির সরণি বাহি	১।২৭, ২।৬৩
ভক্তব্রুব [পত্র] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী	২।৫০
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবে—শ্রীশ্রী [কবিতা]	২।৫৭
ভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন—শ্রী	৪।১৫৮
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাবে—শ্রীমদ্ [কবিতা]	৮।৩০৬
ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্	১০।৩৭৪
ভক্ত ও অভক্ত	১১।৪১৩
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবে - শ্রীমদ্ [কবিতা]	১২।৪৭৪
ভাগবত-গোষ্ঠী—শ্রীমদ্ [বিবরণ]	৭।২৭৩
ভ্রম-সংশোধন	৫।১৮৬
মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত	৪।১৩৩
মহাভাবের উন্মীলনে	৮।৩০৩
মহাপ্রভু ও রঘুনাথ [কবিতা]	৯।৩৫২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
যমুনাষ্টকম্—শ্রী	১০।৩৬১
"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"	৫।১৮৫
রাধাষ্টমী-ব্রতম্—শ্রীশ্রী	৬।২০১
রাধিকাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৭।২৪১
রাধাকুণ্ডাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৯।৩২১
শিক্ষাষ্টক [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৩।৯১, ৪।১৩০, ৫।১৭০
শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন	৬।২১৭, ৭।২৫৪, ৮।২৯২, ৯।৩৩২
শিক্ষা—সেকাল বনাম একাল	৮।৩০৭
শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৭।২৭৭
শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১১।৪৩৬
শ্রদ্ধা-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল কেশব গোস্বামীর প্রকট-বাসরে	১১।৪২৭
শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত	৭।২৫৮
সকাতর প্রার্থনা [কবিতা]—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর আবির্ভাব-তিথিতে	৪।১৪৩, ৫।১৭৭
সরলতা ও কপটতা	৮।২৯৮
সনাতন-বিধান [কবিতা]	১২।৪৫৯
সাধন ও সাধ্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৮
সাধুসঙ্গে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা [বিজ্ঞাপন]	২।৫৬
সাধবো দীন-বৎসলাঃ	৩।১০০
সাধুসঙ্গে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সমাচার	১০।৩৯৬
সুদর্শন-মোচন	১।২৫
সুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
সেশ্বর ছাত্র [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	৬।২১৩
"স্বভাব যায় না মলে"	৪।১৩৯
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ	৬।২৩৯
হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা—শ্রী	৪।১৫৬
হুগলীতে শ্রীল আচার্য্যদেব [বিবরণ]	৫।১৯৭
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

নবদ্বীপ মঠের স্বীয় ভজন-কুটীরে ভজনরত
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ২৫ গোবিন্দ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৫ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৯৮, ইং ১৪/৩/৯২ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহিদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১॥

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে

স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ॥ ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্য স্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥

যিনি ইহজগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপদগ্ধ দীন-হীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ? ॥ ৩ ॥

রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥

যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাত-

কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন ? ॥ ৪ ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার রসনায় "হরে কৃষ্ণ" নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৫ ॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

সমুদ্রতীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন ? ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ ।

ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥

সংকীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রব্ধ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

৫৪। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু বৈষ্ণব-জগতের কি করিয়াছেন ?

"শ্যামানন্দ উৎকল-প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তিতেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম প্রদান করেন। দীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভু-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাদৌ যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপা-ভাজন

হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক মূঢ়মতি পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, ঐ সকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি।”

—‘শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী,’ সঃ তোঃ ২।৩

৫৫। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে কেন ‘গীতাচার্য্য’ বলা হয়?

“শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন? তিনজনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী-বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। * * * শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না; কেননা, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত-গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-জ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র-স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোল-যোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস, ঠাকুর মহাশয় ও

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্রন্থ হইয়া নিজ নিজ-ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।" —'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৫৬। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্র-বিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদদিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ঈঙ্গিত আছে যে, **চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র—যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন।** বৈষ্ণব-বাক্য—সকলই সত্য হইতে পারে এবং এই কথাটি সত্য বলিয়াও অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, **শ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর মত এক—কিছুমাত্র ভিন্ন নয়।** তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দজাত ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। **কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে, দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।**"

—'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক', সঃ তোঃ ৯।১০

৫৭। শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলিয়াছেন?

"হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গ-প্রিয় ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু; আর কাহাকে জানাইব?" —বিঃ পঃ ১।৪

৫৮। যুগে যুগে নবোদিত আচার্য্যবৃন্দ পূর্ব্বাচার্য্যগণের কি উদ্দেশ্য সফল করেন ?

"The great reformers will always assert that they have come out *not to destroy the old law, but to fulfil it.* Valmiki, Vyasa, *** and Chaitanya Mahaprabhu assert the fact either expressly or by their conduct."

—*The Bhagavat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের শ্রীগৌরপর-ব্যাখ্যা

যাঁহা হইতে আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বাভিধেয়মূল সঙ্কীর্ত্তনাখ্য শুদ্ধকৃষ্ণভজন উদ্ভূত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; অন্বয় অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীরাধাভাব-মহাভাব-শাবল্যসমূহের সম্যগ্ভাবে পরিজ্ঞাতা এবং ইতর অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে যিনি স্বয়ং শ্রীগৌররূপে নাম-প্রেমদান, জীবে দয়া, ভক্তমর্য্যাদা-রক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-রূপ সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণভজন এই অর্থসমূহে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞ ; যিনি বাল্য-বয়সে চাপল্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্যরসের অদ্বিতীয় আধাররূপে বিলাস করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা-বিলাস-কালে স্বপাণ্ডিত্য-প্রতিভামহিমায় সর্ব্বোচ্চ ও অপ্রতিদন্দ্বিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন অথবা স্বীয় ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু আজানুলম্বিত-ভুজদ্বারা এবং কষিতকাঞ্চনরূপের আভায় অসমোর্দ্ধরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন ; যিনি আদি ভক্ত-মহাকবি শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবত-বর্ণনদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; যিনি গৌড়ীয় ভক্তের আদি মহাজন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমন্বিত অপ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন ; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে আদিরসকবি শ্রীলীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বা শ্রীচণ্ডীদাস বা শ্রীবিদ্যাপতি বা শ্রীজয়দেবের হৃদয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-

রসে নিমগ্ন করাইয়া 'শ্রীকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী'তে বা 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থে লীলাবর্ণন করাইয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভাষার আদিকবি শ্রীগুণরাজ খাঁ অর্থাৎ শ্রীমালাধর বসুর হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া তাহা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কাব্যের উক্তিহেতু তাঁহার বংশধর ও গ্রামবাসিগণের হৃদয়েও বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন; অথবা যিনি নামরসের আদি রসিক শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুশীলন করাইয়া জগতে নাম-ভজন বিস্তার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলাকালের আদি মধুর-রসতত্ত্ব কোবিদ্ পরমহংস বা বিদ্বৎসন্ন্যাসী, 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাটক রচয়িতা শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দের হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ-মহাভাব প্রকটিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁহার দ্বারা কীর্ত্তনমুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদিকবি প্রিয়-স্বরূপ 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীললিত' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ রাগানুগমার্গীয় ভজন এবং ইতর অর্থাৎ বৈধমার্গীয় ভজন বিস্তার করাইয়া আসিতেছেন; অথবা যিনি অপ্রকটকালে গৌড়ীয়-ভাষার আদি তাত্ত্বিক শ্রীগৌরচরিতলেখক ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরজন-মাহাত্ম্য উদয় করাইয়া তৎকৃত মহাকাব্য 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থের দ্বারা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন; যাঁহাতে নাস্তিক, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়াগণ, বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্তবিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছলকবিগণ সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দাদির ন্যায় মায়াবাদী, অশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ, রামচন্দ্রপুরী-প্রমুখ হরি-গুরু বিদ্বেষী সন্ন্যাসিগণ, শ্রীবল্লভ-ভট্টাদির ন্যায় ভক্ত্যেকরক্ষক-স্বামি-বিরোধী পণ্ডিতগণ, লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষীর ন্যায় লীলাকারী শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ও শ্রীবলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্যক্তিগণ, অথবা লোকশিক্ষার্থ অস্থির-বৈরাগ্যের লীলাকারী ছোট হরিদাসের ন্যায় ছলত্যাগের প্রতীকগণ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভিক্ষু পণ্ডিতম্মন্যগণ মোহ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যাঁহাতে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিতত্ত্ব সত্য অর্থাৎ লীলাবিলাসহেতু যিনি এক বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়া স্বয়ং অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ সেবক-প্রভু-বিষ্ণু,—এই বিষ্ণুর ত্রিরূপ যাঁহাতে সত্য, অথবা যাঁহাতে উপনিষৎকথিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্ম অঙ্গকান্তি-

রূপে, যোগ-শাস্ত্র-কথিত আত্মা বা অন্তর্যামী অংশ-বৈভবরূপে এবং ভগবান্ অংশিরূপে ত্রিবিধ আবির্ভাব, প্রকাশ বা রূপ উপাসক-প্রতীতিভেদে ভিন্ন প্রতিভাত হইয়াও অদ্বয়জ্ঞান; অথবা যাঁহাতে সম্বন্ধ-দেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম, অভিধেয়-দেবতা 'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'শ্রীগৌর'-নাম এক ও সত্য, অথবা যাঁহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অভিধেয়-সর্গ সত্য, অথবা ক্ষিত্যপ্‌তেজের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আরোপ বা ভাণ যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহাতে অব্যবহিত সেব্য নাম, মিশ্র-ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ—নামভজনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধেয় সত্য হইলেও নামাপরাধকে নামাভাস ও নাম এবং নামাভাসকে নামরূপে মিথ্যা-কল্পনা, অথবা যাঁহাতে অনাত্ম-ধর্ম্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সহজাত কর্ম্মবিদ্ধা, জ্ঞানবিদ্ধা ও অবিমিশ্রা আত্মধর্ম্ম কেবলাভক্তি—এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুদ্ধভক্তিকে বিদ্ধাভক্তি ও বিদ্ধাভক্তিকে শুদ্ধ-ভক্তি বলিয়া আরোপ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়; অথবা উপাসকের নাগরী-বিচার-মূলে সম্ভোগপিপাসা ও পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবতবিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার—এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ যাঁহাতে মিথ্যা; অথবা যাঁহার উপদেশে কৃত্রিম 'তৃণাদপি' দৈন্য, কীর্ত্তন ব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণাদি কৃত্রিম চেষ্টা ও চিজ্জড়রসতত্ত্বা-জ্ঞান মিথ্যা; অথবা যাঁহার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-ক্লেশানুভূতি মিথ্যা; যাঁহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত—এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা; যিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীমাথুরমণ্ডল—এই অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভবধামে লীলা করেন; যাঁহাতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেতর ইন্দ্রিয়প্রীতি-কামনারূপ মায়িক অনাত্ম-চেষ্টা আদৌ নাই; সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীপত্রিকার স্বরূপ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী প্রেষ্ঠা সেবিকা। সর্ব্বপ্রধানা ও প্রিয়তমা সেবিকাসূত্রে উক্ত সমিতি উভয় সভারই অভিন্না প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র বলিলে ইহাকে উক্ত সভাদ্বয়েরও মুখপত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের অভিন্ন কলেবর এই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাব, ভাষা ও ধারার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভাব, ভাষা ও ধারা অভিন্ন। সংক্ষেপতঃ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীল রূপ ও রঘুনাথের কথার একমাত্র প্রচারিকা।**

সজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ের অবস্থিতি কাল

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্ত্তমান কাল হইতে অনুমান ১১১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিতা হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বর্ষকাল শ্রীল ঠাকুর-কর্ত্তৃক পরিচালিতা হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রিকার সপ্তবর্ষকাল সম্পাদনা করেন। মোটের উপর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল সজ্জন-তোষণী প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশ বর্ষের চতুর্ব্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে অনুমান ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' নিয়ামক মহারাজের সহায়তায় মাসিক সজ্জনতোষণীর অভিন্ন কলেবরস্বরূপে 'গৌড়ীয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাও চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অবধি অবস্থিত থাকিয়া অনুমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাবের কারণ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার মনোভাব অনুযায়ী শুদ্ধ-হরিকথা কিয়ৎকাল যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস

পাইলেও নানাপ্রকার দৈব ও আসুর দুর্ঘটনায় উক্ত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রকৃত সেবা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপরতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তখন হইতে 'গৌড়ীয়' অবাধে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ঘোমটার মধ্যে খেমটা' নীতির পরিপোষক হইয়া পড়িল। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি প্রাণহীন গৌড়ীয়ের কঙ্কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ তৈলের দ্বারা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমশঃ তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তসমূহই গৌড়ীয়ের প্রকৃত আহার। তাহার অভাব হইলে গৌড়ীয়ের প্রাণধারণ একান্ত অসম্ভব। কতকগুলি গুরুদ্রোহীতামূলক অপসিদ্ধান্তপর অপদার্থ অখাদ্য কুখাদ্য গৌড়ীয়কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। এইরূপে গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তথাকথিত পরিচালকবর্গের অপরাধফলে গৌড়ীয় অন্তর্হিত হন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত শুদ্ধ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পত্রিকা নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের অনুকরণে কতকগুলি অপসিদ্ধান্তপর সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহাদের বিচারধারা যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ধারণার প্রতিকূল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিব। কেহ বা অপ্রাকৃত স্মৃতির সহিত প্রাকৃত স্মৃতির মিল রাখিয়া পর্ব্বাদি পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' আরও কতকগুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির দ্বারা গৌরজনগণের চিত্তোল্লাসের কোন সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয়কথা লইয়া, হরিকথার ছলে কেবল মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি-বিরুদ্ধ কথা লইয়া পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া কোথাও বা আত্ম-প্রশংসায় ভরপুর হইয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধ ভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। শ্রীপত্রিকা এই প্রকার সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাবসমূহ ভক্তিকথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবাবিরোধ ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কায় মায়িক-প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পত্রিকা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মতবাদসমূহে যাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন, তাহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিসুখ সন্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীপত্রিকা এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌড়ীয়ের সহিত বিভিন্ন নীতির সম্বন্ধ

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিন্তাস্রোত যেভাবে প্রধাবিত হইতেছে তাহা ধর্ম্মজগতের সহিত কতদূর সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাহা সর্ব্বদাই সমালোচনা মুখে বিশ্লেষণ করিবেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-নৈতিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের সহিত এই পত্রিকার প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যে-স্থলে উক্ত নীতিসমূহ নিত্য সনাতন ধর্ম্মনৈতিক চিন্তাস্রোতের ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মাইবে, সে-স্থলে ইঁহা নির্ব্বাক থাকিয়া জগতের অমঙ্গল আনয়ন করিবেন না। স্বাধীন ভারতের পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতিসমূহের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যাঁহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্বের যাবতীয় সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে সেই বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্যই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শ্রীপত্রিকা তাহা প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সচেতন রাখিবেন। ধর্ম্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মই ভারতের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মের জন্যই ভারত সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের বিজয়-পতাকা সমগ্র বিশ্বের শীর্ষোপরি স্থাপন করিবার মূল-মন্ত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকের' অন্যতম "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকের তাৎপর্য্য জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপত্রিকা সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিবেন।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়-তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণ অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত

মানুষকে অধঃপাতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাঁহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।

শ্রীপত্রিকার ভাষা

এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, অসমীয়া, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।

গভীর গুরুদায়িত্ব লইয়া এই পত্রিকা বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

দীক্ষা

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র লইবার প্রথা দেখা গেলেও ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে দীক্ষার প্রাধান্য দিয়া আপন আপন রুচি-ভেদে দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বর-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই আরাধনায় মন্ত্র প্রদান করত যাঁহারা সহায়তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আমরা 'গুরু' বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। সাধক দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে জীব ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দীক্ষাসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন অনেকে যাহাকে দীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হইতেছে না। তজ্জন্য দীক্ষা কাহাকে বলে, এই দীক্ষা কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং দীক্ষা-গ্রহণকারীর লক্ষণ কি, তাহা বিশদভাবে জানা আবশ্যক। এখানে এই দীক্ষাসম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

যদিও মহাজনগণ শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে এ সব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি মাদৃশ নগণ্য ব্যক্তির আলোচনা করিবার প্রয়াসের একমাত্র কারণ—শাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া নিজের দূরিত ও দূষিত চিত্তকে সংশোধন করা। এই সামান্য প্রয়াসের মধ্য দিয়া যদি পরমার্থ-জীবনে কেহ কিছু লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আমার জীবন ধন্য হইবে মনে করি।

ভারতবর্ষে বহু সম্প্রদায় দেখা যায়, আবার এক একটী সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত; তজ্জন্য দীক্ষার প্রণালী-ভেদও বহুপ্রকার। ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় (১৫।১৫) শ্লোকে বলিতেছেন,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম।" বেদপ্রবর্ত্তক তিনি, আর বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও তিনি। নিত্যধর্ম্ম সৃষ্ট বস্তু নহে; কেহ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন, নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে একথা বলিলে ভুল হইবে।

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্-ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদু ঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।১৯)

সত্য-ধর্ম্মটী সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীত। ভৃগু-প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণাদিগের কথা আর কি বলিব?

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ (ভাঃ৭।১১।৭)

হে রাজন্! যাহার অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ; তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্গণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি।

অতএব যে কোন সম্প্রদায় হইতে লব্ধদীক্ষা প্রকৃত দীক্ষা বলিয়া প্রমাণিত হইবার বাধা আছে। মন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি-স্বরূপ; তাহা স্বয়ং ভগবান্ই, সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে সদ্গুরু পরম্পরায় উহা লভ্য। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ষড়্বেগজয়ী নিরন্তর ভজনপরায়ণ সদ্গুরুই মাত্র তাহা প্রদানে সমর্থ। সেই ভগবৎকৃপালব্ধ ব্যক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত দীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সুদূর পরাহত।

বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভজনপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায়

যায়, কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ বা তান্ত্রিক ; তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতিতে সাধ্য-স্বরূপ যথাযথ নির্ণীত না হওয়ায় তৎ-তৎ সম্প্রদায়ে প্রদত্ত দীক্ষার ফলস্বরূপে যাহা লব্ধ হয়, তাহা পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে ; তবে ঐ সব সাধনপদ্ধতিতে যথাযথ সাধন করিলে ফল কিছু লাভ হইবে না, তাহা নহে ; কর্ম্মমার্গীয় সাধনার ফল ভোগপ্রাপ্তি, জ্ঞানমার্গীয় সাধনায় ভগবৎসম্বন্ধে অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্মদর্শন এবং যোগমার্গীয় সাধনায় ভগবানের আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মসান্নিধ্য পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি, ঈশ্বরে জীব জ্ঞান, কর্ম্ম-কাণ্ডান্তর্গত দেবদেবীতে ঈশ্বরবুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃত দীক্ষার ফল নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-মার্গে যাঁহারা প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া সাধন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কোথাও ক্ষয়িষ্ণু, কোথাও অসম্যক্, কোথাও বা আংশিক ফল লভ্য হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবা তাহাতে লাভ হয় না।

অনেকের মুখে শোনা যায়, মনুষ্য-জীবনে দীক্ষা লওয়া একান্ত আবশ্যক, কারণ মন্ত্র গ্রহণ না করিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না ; কথাটা ঠিক, কিন্তু সদ্গুরু হইতে গৃহীত না হইলে দীক্ষা গ্রহণের কার্য্যটা প্রহসন মাত্র। ঈশ্বরপ্রাপ্তির অবগুণ্ঠনে মনুষ্যসমাজে যে গুরুকরণাদির প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, যথাযথভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, তাহাতে ঈশ্বরপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। কেবল স্ব স্ব রুচির সন্তুষ্টিমাত্র।

সাধকের সাধ্য বস্তু যদি স্থির না হয়, তাহা হইলে সাধনার প্রক্রিয়া গ্রহণ করিলে বাস্তব সাধ্যবস্তু লাভ হইতে পারে কি ? রাজস-তামস-তন্ত্রমার্গীয়, কর্ম্ম-মার্গীয়, জ্ঞানমার্গীয় ও যোগমার্গীয় দীক্ষার দ্বারা যাহা লাভ হইবে, তাহা চরম সাধ্যবস্তু নহে, ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রোক্তি। প্রকৃত দীক্ষা একমাত্র শুদ্ধভক্তিমার্গেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিই তত্বকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। এই ভক্তিই শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥" (মাঠর-শ্রুতি)

অতএব ভক্তি-সিদ্ধ যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট গমন করিলে দীক্ষাসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যাইবে। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

আদৌ গুরু-পদাশ্রয়

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতি-গৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলি পালনের জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়ে অধিক চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন, পতিগৃহে গমন, অতঃপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপনের পূর্ব্বে কোন বালিকা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যসকল অতি সযত্নে করিতে থাকিলেও সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী মঙ্গলের হেতু না হইয়া ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও অন্যায়েরই আবাহন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান'।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুলখেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণমাত্র। পুতুলখেলার দ্বারা বালিকার সত্য সত্য পতিসেবা হয় না, কেবল সাময়িক মানসিক তুষ্টিবিধান হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধ-বিমুখিনী ব্যভিচারিণীর গৃহকার্য্যগুলিও তাহার নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের নিমিত্তই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর গৃহকর্ম্মের প্রত্যেকটীই পতির প্রীতি-কামনায় সাধিত হওয়ায় উহা মঙ্গলজনক ও শান্তি-বিধায়ক হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১১।২।৩৪) শ্লোকের টীকায় ভগবদ্ভক্তের সেবানুষ্ঠান এবং বিষয়ি-অভক্তের অনুরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ গভীর অন্তর বিদ্যমান তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষয়িগণ প্রাতঃকালে মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান-ভোজনাদি বিষয়সুখের জন্যই করিয়া থাকেন, ভগবদ্ভক্তগণও সেই সেই কার্য্য ভগবৎ-সেবোদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন এবং তাহা ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের ও বিষয়ি-কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্ত সকল কার্য্যই ভগবৎপ্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যে করেন, আর বিষয়ী ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক-পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করিয়া

থাকেন। এস্থলে সম্বন্ধ-জ্ঞানই ভগবৎসেবার অনুকূল এবং সম্বন্ধবিহীন অবস্থাই প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করে।

অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সম্বন্ধের পর অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কযুক্ত; একটী ব্যতীত অপরটি সম্ভব হয় না। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয় যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত হয় না। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কখনও অপরের প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না বা তাঁহার সেবার বিনিময়ে অলঙ্কার, বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি পতির সুখের জন্যই পতিসেবা করেন; পতির প্রীতিই তাহার প্রয়োজন; পতির সুখই তাহার সুখ। সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অনুষ্ঠানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের মূল প্রয়োজন।

সাধু-শাস্ত্র বলেন—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ।" ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—সদ্গুরু পদাশ্রয়; তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আত্যন্তিক মঙ্গল জানিবার জন্য শব্দব্রহ্মে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত পারমার্থিক সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে বাস্তব সত্য লাভ করা যায় না। ভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন,– কেহ যদি শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অ-গুরুকেই "গুরু" বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—এরূপ অসদ্গুরু পরিত্যাগই বিধি। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন,—দুগ্ধ যেরূপেই হউক না কেন বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, দূষিত দুগ্ধবিক্রেতা বা গুরুক্রব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের গুণে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকটে 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই সকল কথার সমর্থনে বাজারে বহু মনঃকল্পিত সহজিয়া গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র এইসকল স্বার্থপর মনোধর্ম্মীর কথা সমর্থন করেন না। পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। যিনি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য; উৎপথগামী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কখনও আচার্য্য-পদবাচ্য নহেন।

শিষ্যের পরম ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়—এরূপ কথা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তকর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। সদ্‌গুরুর কোন দোষ থাকিতে পারে না। যিনি শাসিত হন, তিনি—'শিষ্য' এবং যিনি শাসন করেন, তিনি—'গুরু'। অতএব প্রাকৃত জাতি-কুল-পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না' হরিভক্তিবিলাস এইরূপ বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ে কখনও ভক্তির নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই; তাহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের 'উপায়' বলিলেও কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহারা মুক্তিলাভের পূর্ব্বপর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা বলেন। 'ভক্তি' স্বীকার করিতে হইলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়'—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত বলেন,—আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিবিধান করেন। মুক্ত পুরুষ নিত্য স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধাম-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব স্বীকার করেন। নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিলে নিত্যবস্তুই লাভ হয়, অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। তাই বৈষ্ণবগণ নিত্য-সত্যাশ্রয়ী।

শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন, শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। অমানী মানদ ধর্ম্মে দীক্ষিত বাস্তব হরিকীর্ত্তনকারীই নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত এবং তিনিই যথার্থ 'বৈষ্ণব'।

ভক্তিসাধক আমরা সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের জন্য ভগবৎসমীপে ব্যাকুল-

ভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইব। ভগবান্ আমার প্রবল আর্ত্তি দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে গুরু আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, প্রচলিত জনমত যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে —সেইরূপ ব্যাপারে যিনি ইন্ধন প্রদান করেন, তাহাকে 'গুরু' বলিয়া মনে করিলে জীবন বৃথাই বিপথে পরিচালিত হইবে। ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম হাব-ভাব, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত পরম বৈষ্ণব মনে করিয়া ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা চাহেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই মহান্ত-গুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। এইরূপ সদ্গুরু-পদাশ্রয়েই ভক্তিসাধকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা ও আরাধনা

জয় জয় গুরুদেব ব্রহ্মচারী নাম।
যতি-ধর্ম্মপরায়ণ ভকতিপ্রজ্ঞান॥
শুভ তিথি সুমঙ্গল এসে আগুয়ান।
হৃদয়ে ভকতমাঝে আনন্দ উত্থান॥
তিথিবরা গুণমণি করে আনয়ন।
দরশনে পাপ-তাপ করয়ে হরণ॥
গৌড়দেশে পূর্ব্ববঙ্গে উদিত তপন।
পিতামাতা আনন্দিত সব পরিজন॥
সার্থক হইল তবে সব কুল ধন।
জগৎ মঙ্গল হেতু মর্ত্তে আগমন॥
তারণ করেন সদা প্রভু-প্রিয়তম।
সর্ব্বগুণ বিভূষিত নিত্যানন্দ হন॥

কাঞ্চনবরণ অঙ্গ সুচারুবদন।
তিলফুলজিনি নাসা সুস্মিত ইক্ষণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুন্দর দর্শন।
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর অতীত যখন ॥
গৃহ ত্যজি' সরস্বতী করিল বরণ।
ব্রহ্মচারিরূপে শিক্ষা করিল তখন ॥
যতি বেশ ধরি' করে জীব উদ্ধারণ।
ব্যাসানুগত্য লাগি' মানে বেদান্তদর্শন ॥
মায়াবাদ খণ্ডি' করেন ভক্তির স্থাপন।
ভক্তি-প্রতিকূল ত্যাগে সিংহের গর্জ্জন ॥
ব্যাসের স্বরূপ সে ঘন অদ্বয়জ্ঞান।
বেদের বিদ্বত্তত্ত্ব সদা প্রকাশমান ॥
যথার্থ বাস্তব জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান
মঙ্গল প্রসাদস্বরূপ শুভদা কল্যাণ ॥
প্রকাশ বিশুদ্ধ সত্ত্য আলোক প্রদান।
অজ্ঞানতমঃ নাশয়ে পবিত্র বিজ্ঞান ॥
প্রণব সম্বিৎ তত্ত্ব করেন সন্ধান।
শক্তি-শক্তিমান্ যিনি প্রভু ভগবান্ ॥
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কারণকারণ।
অদ্বয়-ব্যতিরেকভাবে যাহা প্রকাশমান ॥
বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান বৈশিষ্ট্য স্থাপন।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন প্রদান ॥
শাশ্বত সনাতনে তত্ত্ব নিরূপণ।
ধরিলে আশ্রয়তত্ত্ব তবে রক্ষা পান ॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বে সর্ব্ব সমাশ্রয়।
ব্যাসাভিন্ন গুরুদেব এই শিক্ষা দেয় ॥
স্বধর্ম্ম ধরিতে যিনি করান যতন।
আদি, মধ্য, অন্তে সবে ভক্তি প্রকাশেন ॥

বেদতত্ত্ব উপনিষৎ রামায়ণ গান।
ভাগবত-গীতাজ্ঞান সবে করে দান॥
যে-পদ আশ্রয় নিলে সবে ভক্তি পান।
সকল বিধান শাস্ত্র করান প্রমাণ॥
হরিনাম দীক্ষামন্ত্র সবে করে দান।
শ্রদ্ধাবান্ ভাগ্যবান্ পান পরিত্রাণ॥
বৈকুণ্ঠ গমনে জীবে সাধন সোপান।
গুরু-পদকমলের আশ্রয়ে সে পান॥
ভবসিন্ধু পারাবার কর্ণধার হন।
বুদ্ধিমান্ সকলে সেই পথে ধান॥
দিব্য ভক্তিযোগ পায় শ্রীগুরুকরুণ।
অনায়াসে হয় তার চক্ষু উন্মীলন॥
প্রকট-অপ্রকটে গুরু নিত্য বিদ্যমান্।
অবিদ্যা-অজ্ঞান মায়া সবার ঘুচান॥
এমন দয়াল প্রভুর মর্ত্ত্যে আগমন।
শুদ্ধভক্তি শিখাইয়া করে পরিত্রাণ॥
করুণাসাগর প্রভু করুণানিদান।
সে কারণে শ্রীবেদান্ত সমিতি স্থাপন॥
মঠ স্থাপি' শাখাকেন্দ্রে করে প্রচারণ।
বর্ণাশ্রমী শিক্ষা পায় আশ্রয় গ্রহণ॥
বৈকুণ্ঠের গুণগান করান শ্রবণ।
কর্ণমধ্যে দেন তারে তত্ত্বসিদ্ধান্ত জ্ঞান॥
মন্ত্রশক্তি দিয়া জীবে পিশাচী তাড়ান।
আনন্দে সকল ভক্ত কৃষ্ণপাশে যান॥
গৌরাঙ্গের ভক্তগণ তারেন ভুবন।
সংসার-সাগর পার হয়েন তখন॥
ভক্তজনে হৃদয়ের গুরু পরশ রতন।
নিত্য পূজা করেন তাঁর করিয়া যতন॥

'ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ' এই সে কারণ।
প্রেমভক্তি পান, যায় অবিদ্যাবন্ধন ॥
আজি শুভদিনে পূজি শ্রীগুরুচরণ।
শ্রেষ্ঠসঙ্গে আরাধন করে হরিজন ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—

— **ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন**

ভগবান্ যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদন-বিষয়ে বেদের মধ্যে বাক্যভেদে দুইপ্রকার বাক্য পরিলক্ষিত হয়। "ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, বিশুদ্ধ, নির্গুণ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সত্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যসকল নির্গুণ বিষয়ক। আর "যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকল বিষয় জানেন, সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষতঃ সকল বিষয় অবগত আছেন, যাঁহার আলোচনা জ্ঞানময়" এইরূপ বাক্যসকল সগুণ বিষয়ক। "পরমাত্মা পাপরহিত, জরা-মৃত্যুহীন" ইত্যাদি বাক্যসকলও সগুণ বিষয়ক। আবার বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতির (কঠ ২।২।১৫)—"ন যত্র সূর্য্যো ভাতি" শ্লোকের "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" শ্লোকে ব্রহ্মকে পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীদেবকী দেবীও "ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্" শ্লোকে নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে ভগবানের জ্যোতি বলিয়াছেন। গীতার (১৪।২৭) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" শ্লোকানুসারে "নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব ভগবান্ই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।" ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০) "যস্য প্রভা প্রভবতো" শ্লোকে এবং শ্রীল জীবগোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম শ্লোকে "যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং"তে ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫৯)
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ-কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ (চৈঃ চঃ আদি ২।১২)

কিন্তু বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে 'পরংব্রহ্ম ভগবান্'কেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। "ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবানে।" ব্রহ্মকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি হিসাবে ধরিলে তাঁহার সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব। তাই পরংব্রহ্ম ভগবানের যুগপৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদন-বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রমুখ আচার্য্যগণ বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন শ্লোকাবলী উল্লেখ করিয়া যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদের নিমিত্তই ব্রহ্মের দুইপ্রকার প্রতীতি

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিপাদন-বিষয়ে বেদের উভয়বিধ বাক্য সত্য হইলে ব্রহ্ম দুইটী হইয়া উঠিবার আশঙ্কায় তত্ত্ববিদগণ বেদবাক্যের সুসামঞ্জস্য করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু, তাহাতে বিকল্পের কোন সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। অগ্নি কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল এইরূপ বলিলে তাহা কেহ বিশ্বাস করিবেন কি ? অনুষ্ঠানসাধ্য কর্ম্মে বিকল্প ঘটাতেই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা হয়। বেদের মধ্যে কোথাও "সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে", আবার কোথাও "সূর্য্যের অনুদয়ে হোম করিবে" এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। উদয় ও অনুদয়—এই দুইটী কালের যোগহেতু হোমও দুইপ্রকার পরিদৃষ্ট হইতেছে। ঐরূপ অতিরাত্রের ক্ষেত্রেও যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের গ্রহণ এবং অগ্রহণ বলাতে অতিরাত্র দুইপ্রকার হইতেছে।

বেদ বাস্তব সত্যের কথাই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে কুহকাবৃত কোন অসত্যের কথা থাকা সম্ভবপর নহে। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ বেদবাক্যই সত্য। বেদ নির্গুণবাক্যদ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণসকলের নিষেধ করিয়া থাকেন এবং সগুণবাক্যদ্বারা ব্রহ্মের অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিধান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৩।৪০)

"নিত্য অপ্রাকৃত গুণসকল অনিত্য-প্রাকৃত-গুণ-সম্পর্ক-শূন্য, নিরপেক্ষ, সর্ব্ব-হিতকারী, সর্ব্বপ্রেমাস্পদ, সর্ব্বান্তর্যামী-স্বরূপ আমার সেবা করিয়া থাকে।" ভাগবতের অন্যত্র নাগপত্নীগণও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন, —

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥ (ভাঃ ১০।১৬।৪৬)

"সকল অপ্রাকৃত গুণপ্রদীপস্বরূপ গুণস্বরূপাচ্ছন্নকারী গুণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত স্বীয় সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা সর্ব্বগুণদ্রষ্টা যে তুমি, তোমাকে নমস্কার।" এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রকৃতি বিকারভূত গুণসকল পরমেশ্বরে নাই, কিন্তু তাঁহাতে স্বরূপানুবন্ধী অনন্ত কল্যাণগুণ আছে।"

ব্রহ্মের সকল গুণ নিত্যসত্য, প্রমাণান্তরদ্বারা প্রাপ্ত নহে

নির্গুণবাদীরা পূর্ব্বপক্ষ করিতে গিয়া বলেন —"বেদে ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় নির্গুণ ও সগুণ উভয়প্রকার বাক্য থাকিলেও ব্রহ্ম কিন্তু এক প্রকার, দুই প্রকার নহেন। ব্রহ্মের গুণবিধানের নিমিত্ত সগুণবাক্যসকল প্রযুক্ত হয় নাই। গুণের অনুবাদমাত্রেই সগুণ বাক্যের তাৎপর্য্য। লোকদৃষ্ট পাপরাহিত্যাদি গুণসকল ব্রহ্মে আরোপিত করিয়া লোকসকলকে আকর্ষণপূর্ব্বক নির্গুণব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যেই বেদে সগুণ বাক্যসমূহ উক্ত হইয়াছে। সগুণ ও নির্গুণ বাক্যসকল পরস্পর বিপরীত। সগুণবাক্যের সহিত নির্গুণবাক্যের একার্থবোধ না হইলে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া উহাদের একার্থতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মই সকল বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু কিছুতেই নহেন।"

নির্গুণবাদিগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহ যুক্তিসম্মত নহে। যাহা অগ্রে প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই 'অনুবাদ'। গুণের অনুবাদ মাত্রই বেদের সগুণ বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ হইতে পারে না। কারণ সগুণবাক্যের অন্তর্গত গুণসমূহ প্রমাণান্তরদ্বারা প্রাপ্ত নহে, বেদে ঐসকল গুণ প্রতিপাদিত আছে। তাই সগুণবাক্যের গুণসমূহের অনুবাদ সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের গুণসমূহ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত নহে বলিয়া আবার পুণ্যশালী দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট গুণসমূহ ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না। বেদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের সকল গুণই নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যসত্য। বাস্তব সত্যের প্রকাশক বেদ কখনও কল্পিত গুণ প্রতিপাদন করিতে পারে না। অখিল গুণের আকর ব্রহ্মের সামান্য কিছু গুণই পুণ্যশালী দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে স্মৃতি বলিয়াছেন, —"বেদোক্ত মহাগুণসমূহ ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ, ইহাদের কখনই বিয়োগ হয় না। যিনি নিজের মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি এইসকল গুণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"ব্রহ্মের পরাশক্তি বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী।" অতএব মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের অন্বেষণ করিবেন, ইহা বেদের হৃদয়ের কথা এবং বাস্তবসত্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

সুদর্শন-মোচন

একদা দেবযাত্রা অর্থাৎ শিবপূজা-উপলক্ষে শ্রীনন্দ-মহারাজ ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-তিথিতে শ্রীশিবপূজা করিবার জন্য অন্যান্য ব্রজবাসিগণের সহিত বৃষভপরিচালিত শকট-সমূহে আরোহনপূর্ব্বক অম্বিকাবনে গমন করেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতী-নদীতে স্নান করিয়া বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ভক্তিসহকারে বিষ্ণুতত্ত্ব গোপেশ্বর সদাশিব এবং অম্বিকাদেবীকে পূজা করিলেন। অনন্তর নন্দমহারাজাদি গোপগণ —"মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ কামনায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী, সুবর্ণ, বস্ত্র, মধু এবং মধুযুক্ত অন্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ-মহারাজ, সনন্দক ও অন্যান্য ব্রতধারী গোপগণ সেই দিবস জলমাত্র পান করিয়া উপবাস করিলেন এবং রাত্রি সমাগত হইলে সকলে সরস্বতী-তীরেই অবস্থান করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা নিদ্রাভিভূত হইলে হঠাৎ এক মহাসর্প সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া নিদ্রামগ্ন নন্দ-মহারাজকে গ্রাস করিল। সর্পগ্রস্ত নন্দ-মহারাজ তখন "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত! আমাকে মহাসর্প গ্রাস করিতেছে; অতএব শরণাগত আমাকে উদ্ধার কর"—এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ চীৎকার শ্রবণপূর্ব্বক অন্যান্য ব্রজবাসিগণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিলেন এবং ব্যাকুলিতচিত্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা সর্পটাকে তাড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সাপ দাহগ্রস্ত হইয়াও কিছুতেই নন্দ-মহারাজকে পরিত্যাগ করিল না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে গমন করিয়া পদদ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ সর্প সর্পশরীর পরিত্যাগ করত অপূর্ব্ব বিদ্যাধররূপ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণ-মাল্যধারী সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি গ্রহণকারী সেই দিব্যপুরুষকে 'তিনি কি কারণেই বা এই নিন্দিত সর্পগতি লাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্ন করত তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্পশরীরমুক্ত সেই দিব্য পুরুষ তখন বলিলেন, "আমি সুদর্শন বিদ্যাধর নামে প্রসিদ্ধ। একদিন আমি আমার রূপসম্পন্না স্ত্রীর সহিত বিমানে দিক্‌সমূহে বিচরণ করিতেছিলাম। সেই সময় অঙ্গিরা-গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া নিজ রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উপহাস করিয়াছিলাম। সেই ঋষিগণ এইরূপ উপহাসগ্রস্ত হইয়া আমার স্বকৃত পাপের ফলস্বরূপ এই সর্পযোনি লাভ করার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাঁহাদের ঐ অভিশাপ আমার

পরম সৌভাগ্যপ্রসূ আশীর্ব্বাদেই পরিণত হইয়াছে। সেই পরম করুণাময় ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমাকে শাপ প্রদানচ্ছলে সর্পযোনি প্রদান করাইয়াছিলেন। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাও যাঁহার পদরজঃ কামনা করেন, সেই ত্রিলোকগুরু সর্ব্ববরেণ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। হে অচ্যুত! আমি আপনার পাদস্পর্শে ও আপনাকে দর্শন করিয়া সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই নিখিল শ্রোতৃবর্গকে এবং নিজকে পবিত্র করে, সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে আজ পবিত্র হইয়াছি, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ভবভীতিগ্রস্ত শরণাগত জনের ভয়হারী হে অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন আমাকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ লোকে গমনের আদেশ প্রদান করুন।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ লোকে গমনের অনুমতি প্রদান করিলে সেই পরমসুন্দর বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া নিজ লোকে গমন করিলেন। ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া সেই অম্বিকাবনে ত্রিরাত্রিবাস সমাপনপূর্ব্বক সাদরে তদীয় প্রভাববার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীউপদেশামৃতের ষষ্ঠ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ণ প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেন-পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

অর্থাৎ—"এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত তাঁহার প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা বা তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম্ম—বুদ্‌বুদ্, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব) কখনও লোপ পায় না।" অতএব আমাদের এই রূপগৌরব কখনও করা উচিত নহে বা কাহাকেও কুৎসিৎ বলিয়া উপহাস করা অনুচিত। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

"রূপের গৌরব কেন ভাই?
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হ'বে ছাই॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।

যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর',
কোথা সব রহিবে তখন ??
দারা-সুত-বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার, কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে ॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর' কৃষ্ণ আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥''

যে দেহের ও যে রূপের এই গতি, তার জন্য আমাদের গর্ব্ব, অহঙ্কার বৃথা। এই প্রাকৃত দেহ ও রূপ পদ্মপত্রোপরি জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অতএব, হে সাধন-ভজনাকাঙ্ক্ষী জীব! তোমরা প্রাকৃত রূপ-গৌরব না করিয়া সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর সেই পরমব্রহ্ম ভগবানে শরণাপন্ন হও, তাহলে তোমাদের নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

"যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥
অতএব মায়া-মোহ্ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥"

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির সরণি বাহি

'পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ।'—পূজার্হ ব্যক্তিতে সম্ভ্রমবোধের অতিরিক্ত যে প্রিয়তাবোধ, তাকেই বলে ভক্তি। লৌকিক সম্বন্ধে আপাতঃদৃষ্টিতে একে ভক্তি বলা গেলে ও বস্তুতঃ 'প্রিয়তাবোধ' আরও গভীর ভাবকে দ্যোতনা করে। ভক্তি-ভাজন গুরুজনকে শুধুমাত্র সম্ভ্রমাত্ম প্রিয়-পর্য্যায়ভুক্ত করে ক্ষান্ত হওয়া চলে না। তাঁর ভাবমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা অবিচলিত থাকবে, তাঁর পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচারক্ষমতায় আস্থা থাকবে, তাঁর নীতি এবং নিষ্ঠায় আগ্রহ উদ্দীপিত হবে, তাঁর উচ্চ-ভাবাদর্শ সর্ব্বক্ষণ অনুকরণ (অনুসরণ)-যোগ্য থাকবে, তিনি সর্ব্বাবস্থায় উচ্চকোটিতে অবস্থান করবেন, তাহলে সেই আধারে ভক্তি সমুচ্ছ্রিত থাকবে। উচ্চকোটির গুণান্বিত

গুরুস্থানীয় ব্যক্তিই ভক্তি-অধিকারীর উন্নতি বিধান করতে পারেন। ভক্তি নিজের উন্নতির জন্য—এই প্রবাদবাক্য তখনই সার্থক হয়। লৌকিক জগতে ভক্তি-ভাজনের চারিত্রিক অপহ্নব ভক্তি অধিকারীর ভক্তির প্রাবল্যে শৈথিল্য আনয়ন করে।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির স্বরূপ আলাদা। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্য সূত্র ১।২)—এটী হল ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুরাগের, প্রিয়তাবোধের শ্রেষ্ঠতার কথা। পারমার্থিক জগতের এই অনুরাগ লৌকিক অনুরাগের প্রতিচ্ছায়া নয়, প্রত্যাশার ফলশ্রুতিও নয়। কোনওরকম লৌকিক বাসনার রঙে রঞ্জিতও নয়। বৈষ্ণব মহাজনগণ এর পরেও বলেছেন। তাঁরা বলেছেন,—এই অনুরাগ জ্ঞান-কর্ম্ম-বিমিশ্রত নয়, পরন্তু আধ্যাত্মিক কোনও বাসনাও এই অনুরাগের সঙ্গে জড়িত থাকবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণ তাকেই বলেছেন—উত্তমা ভক্তি—ঈশ্বরে পরানুরক্তি যার নামান্তর। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ভক্তির জন্যই ভক্তি, ভক্তির জন্য ভক্তির আচরণ। সর্ব্বপ্রকার কামনা বিরহিত না হলে ভক্তি উত্তমা বলে প্রকীর্ত্তিতা হবে না। অন্যাভিলাষ অর্থাৎ সম্পদ, বিদ্যা, স্বর্গ, এমনকি মোক্ষের কামনাও এর সঙ্গে যুক্ত হবে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা এই ভক্তি আবৃত হবে না, কথান্তরে জ্ঞান এবং কর্ম্মের উপরে এই ভক্তির স্থান। "আনুকূল্যেন"-শব্দের অর্থ অনুকূল রুচি এবং প্রবৃত্তির দ্বারা। "অনুশীলন"-শব্দে শ্রবণ, মননাদি এবং সেবা-পরিচর্যা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। "এক্ষণে কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধিবস্তু ও ব্যক্তির অনুকূল ভাবের সহিত অনুশীলন যদি নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানাসক্তি, সকাম, নিষ্কাম কর্ম্মাসক্তি, বর্ণাশ্রমাচার ও যোগাসক্তি বর্জ্জিত হয় তবে সেই অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে।"

এই উত্তমা ভক্তিই শুদ্ধা, অহৈতুকী ও অব্যবহিতা বলে চিহ্নিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৪০) পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে শুদ্ধভক্তের অন্যাভিলষিত শূন্যতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—

"আমার ভক্তরা ভক্তিযোগে আমার সেবায় যুক্ত হয়ে সর্ব্বদাই তৃপ্ত, এবং তাই তারা পাঁচ প্রকার মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা করে না। সেই পাঁচ প্রকার মুক্তি হচ্ছে,—

(১) সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ আমার সাথে এক হয়ে যাওয়া;

(২) সালোক্য অর্থাৎ আমার লোকে বাস করা;

(৩) সার্ষ্টি অর্থাৎ আমার মত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া ;

(৪) সারূপ্য অর্থাৎ আমার মত রূপ লাভ করা এবং

(৫) সামীপ্য অর্থাৎ আমার সঙ্গ লাভ করা।"

শুদ্ধভক্ত কখনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা চান শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি। কারণ তাঁরা জানেন ভক্তি কথাটীর অর্থই হচ্ছে ভগবানের সেবা। তাছাড়া তাঁদের সম্মুখে রয়েছেন শুদ্ধভক্তের অমলিন দৃষ্টান্ত শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর। তাঁর নাম শুদ্ধভক্তের নিকট প্রাণবল্লভ অভিধা ; তাঁর কথা শান্তির নিলয় প্রাণারাম ; তাঁর রূপ নয়নলোভন, দৃষ্টিবিমোহন ; তাঁর গুণ কীর্ত্তনানন্দ মধুনিঃস্যন্দী, তাঁর লীলা নিত্য-আস্বাদনীয় রসকন্দ ; তাঁর ধাম চিত্ত-উন্মেলক দিব্য-দর্শন। তাই শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ধাম ইত্যাদির মহিমা কীর্ত্তনে এতই আকৃষ্ট থাকেন যে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে উদিত হবার অবকাশই পায় না। ঠাকুর শ্রীবিল্বমঙ্গল বলেছেন,—

"হে প্রাণপ্রিয় প্রভু! আমি যখন ভক্তিভরে তোমার সেবায় যুক্ত হই, তখন যেন সর্ব্বত্রই আমি তোমাকে দেখতে পারি। আর মুক্তি তখন করজোড়ে আমার দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার সেবা করবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে।"

আর যিনি গৌড়ীয়ের ইষ্ট, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ভক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে বলেছেন ;—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং বা কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

অর্থাৎ—প্রভু! তব পদ যুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা-ধন-জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি ॥
নিজ-কর্ম্ম গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥

সাত্বত শাস্ত্রাদিতে ভক্তির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বহু শ্লোক বিধৃত আছে। বক্তব্যের সমর্থনে দু'একটী উদ্ধার করা যেতে পারে।

গোপাল পূর্ব্বতাপনী উপনিষদে ১৪শ শ্লোকে ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশিত হয়েছে—"ভক্তিরস্যভজনং তদিহামুত্রো পাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃ কল্পনং এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।"

—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নামই ভক্তি। ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা অবিমিশ্রিত ভাবে চিত্তের প্রসন্নতাজনক শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ যে ভাববিশেষ, তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

৩।৩।৫৩ সূত্র মধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি বচনে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে ;—
"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"
—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট নিয়ে যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভগবদ্ভক্তিকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করেছেন,—(১) সাধনভক্তি, (২) ভাবভক্তি এবং (৩) প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি অনুশীলন-সঞ্জাত ভক্তির নামান্তর। সাধ্যবস্তুর লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-গ্রামকে নিয়োজিত করবার নামই ত' সাধন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সাধনার দ্বারা নতুন গুণ অর্জ্জিত হবে। এ সাধন কোন অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম গুণকে বিকশিত করার প্রক্রিয়া নয়—এ হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক প্রবণতার বিকাশ। শিশুর জন্মাবার সাথে সাথে তার বাক্‌শক্তি, অনুভবশক্তি বা চলচ্ছক্তি তার ভেতরেই নিহিত থাকে। কাল তা সময়মত প্রকাশের সুযোগ দেয় মাত্র। কাজেই সাধন-ভক্তিদ্বারা অনুশীলনদ্বারা উৎপন্ন ভক্তিকে বুঝব না, বুঝব সুপ্ত ভক্তিবৃত্তির স্ফুরণকেই। ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি ভক্তির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আরও দুটী পর্য্যায়। ভক্তির পূর্ব্বাবস্থান যেমন স্বীকৃত, স্বীকৃত তেমনই ভাব ও প্রেমের। ভাব ও প্রেমের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না—একথা গৌড়ীয় মনীষিগণ স্বীকার করেন না। এঁদের মতে ভাব এবং প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। ভাবপ্রসঙ্গে 'ভক্তিরসামৃত'র অভিমত,—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।"

প্রেম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন ;—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

জীবের জীবনে ভক্তির নৈরন্তর্য্য এভাবেই চলতে থাকে। এরই অপর নাম ভক্তির জাগরণ। কিন্তু তাই বলে পূর্ব্বজন্মের সাধনার ক্রম যদি আদৌ না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভক্তির সম্ভাবনা নেই, একথা শাস্ত্রে বলেন না। শুদ্ধভক্তের সাহচর্য্যে ভক্তি-রচনা-উন্মুখী রুচির সৃষ্টি হয় এবং তা অনুশীলনক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে হতে ভক্তির সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে উন্নীত করতে পারে।

স্মরণীয় ঃ—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।"

উল্লিখিত সাধন, ভাব এবং প্রেমের প্রত্যেকটীতে আবার দুটী করে পর্য্যায় স্বীকৃত—বৈধী ও রাগানুগা। (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস**, আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা-৪, তাং-২/১১/৯১

আজ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস। জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে কেবল কৃষ্ণেরই আলোচনা করলে হয় না, তার সঙ্গে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি মহাদেবীরও আলোচনা প্রয়োজন। ভগবান্ ভক্তকে বাদ দিয়ে নন, ভক্ত ভগবানকে বাদ দিয়ে নন। ভগবান্ তাঁর শক্তিকে বাদ দিয়ে নন, শক্তিও শক্তিমানকে বাদ দিয়ে নন। সুতরাং এ সব তত্ত্বদর্শন সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনা করার প্রয়োজন বলে মনে করি।

গতকাল স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে অনেকে জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস করেছেন। আজও আবার জন্মাষ্টমী-তিথি পালিত হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? অনেকেরই বিষয়টা জানা নাই। তথাপি আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু বলতে হয়। কাল যারা জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করেছেন, স্মার্ত্তমতে তারা ওটা করেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় যে বিচার রয়েছে, সেটা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব কাল যাদের জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন হয়েছে, তাদের ওটা সুষ্ঠুভাবে হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে হয় নাই—শাস্ত্রীয় বিচারানুসারে এটা বলতে হয়। কেন?—সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পালন করা নিষেধ আছে স্মৃতি-শাস্ত্রে। কাল যারা অষ্টমী-তিথি পালন করেছেন, তারা সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালন করেছেন। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পালন করলে খুব ভাল ফল কিছু হয় না, বরং খারাপ ফল বেশীটা হয়। প্রমাণ —

"যচ্চ বহ্নিপুরাণাদ্যৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্ ।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া ॥"

অগ্নিপুরাণে বিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালনের ফলটা কি বলেছেন?—"কৃতং তদ্দেবমায়য়া।" দৈবীমায়া বিমোহিতজন যাহারা তাহারই সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালন করে থাকেন। তার ফলটা কি?—সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালনের যে ফল সে ফলটা নিয়ে নেয় অসুরে, রাক্ষসে। আমি খাটব পরিশ্রম করব, উপবাস করব, আর ফলটা কেন দিয়ে দেব অসুরকে, রাক্ষসকে? সুতরাং সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পালন করা নিষেধ।

"পুরা দেবৈঋর্ষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্ ॥"

দেবতাগণ এবং ঋষিগণ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীর একটা ব্যবস্থা দিয়েছেন শাস্ত্রে। কেন?—"স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া"। ভগবানের বিরোধী যারা তাদেরকে বলে অসুর, নাস্তিক। তাদের জন্যই ব্যবস্থাটা দেওয়া আছে। ভগবানের ব্যবস্থানুসারে এই ব্যবস্থা। ভক্তের পথ অবরোধ করে অসুরে, রাক্ষসে। ভগবানের প্রতিবাদীজন যারা তারা ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করে, ভগবানেরও বিরুদ্ধাচরণ করে। ভগবান্ সেইজন্য সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীর ব্যবস্থা দিয়েছেন। যাতে কোন ফল নাই, উল্টো ফল হচ্ছে। তাহলে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালন করতে নাই—এইটাই শাস্ত্রের বিহিত ব্যবস্থা।

সমগ্র ভারতবর্ষ এককালে বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে চলেছে, এখনও চলছে। কিন্তু এখন থেকে ১৫০/২০০ বৎসর পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তা করলেন যে আমাদের জন্য একটা আলাদা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তাই তিনি শাস্ত্রের গৌণ ব্যাখ্যাগুলি নিয়ে তার কর্ম্মজড়-স্মৃতির ব্যাখ্যা দিলেন—শাস্ত্রেই বলা আছে সেটা। কিন্তু গৌণ ব্যবস্থা সেটা, মুখ্য ব্যবস্থা নয়। গৌণ আর মুখ্য বললে আপনারা কিছুটা বুঝতে পারবেন। যেমন একাদশী-তিথি। একাদশী-তিথিতে অনেকে ভগবানের প্রীতিকামনায়, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে একাদশী-তিথি পালন করেন, হরিবাসর-তিথি পালন করেন। আর একদল তারা একাদশী-তিথি পালন করেন একাদশী থেকে অমাবস্যা, একাদশী থেকে পূর্ণিমা। এই সময়ে শরীরটা কিছু রসস্থ হয়, ম্যাচম্যাচ করে। তজ্জন্য তারা কিছু শুকনো-শাক্‌না খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। যেমন অনেকে আটা-ময়দা খান। অনেকে রহস্য করে বলেন—একাদশী করছ, না আটাদশী করছ! সেইদিন ভাল-মন্দ খাওয়া যাবে, মুখটা বদলানো যাবে, সেইজন্য অনেকে লুচি, পুরি, আলুর দম ইত্যাদির ব্যবস্থা

করেন। কিন্তু শাস্ত্রে যে লেখা আছে—ভগবৎপ্রীত্যর্থে একাদশী, জন্মাষ্টমী উপবাস ইত্যাদি করতে হবে। ভগবান্ খুশী হবেন, তার জন্য আমরা কষ্ট করি। 'কষ্ট করলে কেষ্ট পায়।' সাধন-ভজন করতে গেলে কিছু ক্লেশ স্বীকারের কথা আছে শাস্ত্রে। বিনা ক্লেশে কিছু ভাল ফল পাওয়া যায় না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের গৌণব্যাখ্যাগুলি নিয়ে যে কর্ম্মজড়-স্মৃতি রচনা করেছেন, তার ফল স্বর্গ পর্য্যন্ত। কিছু কর্ম্ম করে যাও, কিছু কর্ম্ম করে যাও। কেন?—স্বর্গে যাবে। স্বর্গ পর্য্যন্ত যাদের দৌড়, তারপরে আর কিছু চিন্তা করতে পারছেন না যারা, তাদের ব্রতোপবাস অনুষ্ঠানের ফলটা কি? আমরা মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে বাস করছি। ১৪টা কারাগার। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের একটীতে বাস করছি আমরা। চৌদ্দভুবন বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক, আর তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল—এই সপ্ত অধঃলোক। সব মিলিয়ে চৌদ্দটা হল। এর নাম হল চৌদ্দভুবন। এই চৌদ্দটা জায়গা মহামায়া দুর্গাদেবীর অধীনে। যখন মহাপ্রলয় হয় তখন এই চৌদ্দটা জায়গা নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে যেখানে চিরদিন বসবাস করা যায় না শান্তিপূর্ণভাবে, সেখানে থেকে কি করব বলুন? এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলেছেন,—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" যেখানে গেলে আর এই ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে আসতে হয় না, এমন জায়গাটা হল আমার জায়গা। তুমিও কিন্তু সেখানকারই বাসিন্দা। বর্ত্তমানে কিন্তু তুমি মনে করছ এই সংসারটা তোমার বাসস্থান, এটা ভুল কথা। তোমার নিত্য বাসস্থান হল আমারই বৈকুণ্ঠধাম। সেইখানে ফিরে চল। সেখানে দুঃখ-কষ্ট কিছু নাই, শান্তির স্থান। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাচ্ছেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে বুঝাবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা তিনি ভগবানের নিত্যসখা। ভগবানের সঙ্গে যিনি সখ্যভাব লাভ করেছেন, তাঁর কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই? এ তত্ত্বদর্শন সব তাঁর জানা আছে। তথাপি জগজ্জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আমাদের ন্যায় বোকা, হতভাগা লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্ত, সখা অর্জ্জুনকে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই যে কৃষ্ণচন্দ্র পরমকরুণাময়, যিনি জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করছেন, তাঁর ক্ষেত্রটা যদি আমরা বিচার করি, তাহলে আমরা দেখব তিনি জগতের কল্যাণকামী, জগতের মঙ্গল বিধান করছেন তিনি সবসময়—জগৎকে শাসন করে এবং স্নেহ-মমতা দেখিয়ে। যদি আমরা শুধু বুঝি যে, ভগবান্ কেবল স্নেহ-মমতা করবেন, একথা যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহলে ভুল করা হবে। যিনি কেবল শাসন করেন,

যাঁর কোন স্নেহ-মমতা নাই, তাঁর শাসন করার অধিকার নাই। আর যদি কেহ অন্যায়-স্নেহ করেন, শাসন না করেন, তাহলে তাঁর সে স্নেহের কোন মূল্য নাই। পাশাপাশি দুটো থাকবে। "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।" যদি শাসন আর সোহাগ দুটো পাশাপাশি থাকে, তবে সংসার ঠিক সুবিন্যস্ত উপায়ে চলে।

ভগবানের শাসনও আছে, স্নেহও আছে। 'পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।' এ দুটো জিনিসই পাশাপাশি রেখে চিন্তা করতে হবে। অনেকে প্রশ্ন করেন আমাদের কাছে—ভগবান্ যদি জানতেন সংসারে এত দুঃখ-কষ্ট, তিনি যদি আমাদের মঙ্গলবিধাতা, তাহলে তিনি এত দুঃখ-কষ্ট রেখেছেন কেন? **Guardian** ত' তিনি, দুঃখ-কষ্ট কেন রেখেছেন তা তিনিই বলতে পারেন। যদি জানতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তাঁকেই প্রশ্ন করা উচিত। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটা রাখবার একটা বিশেষ কারণ আছে। কারণটা কি? —স্নেহ-মমতা উপলব্ধি করবার জন্য, সুখ-শান্তি বাস্তবক্ষেত্রে কি—সেটা অনুভব করবার জন্য দুঃখ-কষ্ট রাখা আছে।

তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যগোষ্ঠী, দৈত্য, দানব সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জানেন কেমনভাবে এদের শাসন করতে হবে, পালন-পোষণ করতে হবে। সবটা তাঁর জানা আছে। সেই প্রেমময় ভগবান্ জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করছেন সর্ব্বতোভাবে। অনেকে বলছেন, তাঁর দুইরকম ধরণের বিচার কেন? তিনি কাকেও ভালবাসেন, আবার কাকেও শাসন করছেন—এটা কেন? ভগবানের পরে দোষারোপ করছেন। যেমন আজকালকার ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকদের উপর দোষারোপ করছে, **Show cause** করছে, তেমন স্বয়ং ভগবান্ হয়েও তাঁর রেহাই নাই, তাঁরও সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু উত্তর দেওয়া আছে,—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্জ্জুন! সকলের প্রতি আমার সমান ব্যবহার। আমার কেউ দ্বেষ্যও নাই, কেউ প্রিয়ও নাই। তবে হ্যাঁ, একটা বিশেষ ক্ষেত্র আছে। আমার যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা আমাকে বেশী স্নেহ-মমতা করে, তারজন্য একটু বেশী টান টানতে হয় আমাকে। এটাও আইনে আছে। জগতেও ঐরকম দেখা যায়, উদাহরণ আছে। স্নেহ-মমতার বশীভূত ভগবান্—সেইটা বলছেন। (**ক্রমশঃ**)

শ্রীগৌর-রূপ-গুণ-বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণই গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি,
সঙ্কীর্ত্তন করিলা প্রচার।
ভক্তসঙ্গে গৌরহরি, নাচিলেন প্রেমভরি,
শিক্ষা দিলা নিত্যধর্ম্ম সার ॥ ১ ॥
সঙ্কীর্ত্তনে গৌরহরি, দিলা প্রেম ঝুলি ভরি,
গুপ্তধন করিলা প্রকাশ।
পাষণ্ডীরে গৌরহরি, নামমালা দিলা পরি',
ম্লেচ্ছেরে করিলা নিজ দাস ॥ ২ ॥
বিপ্রশাপ ছল করি', নবদ্বীপ পরিহরি,
ত্যাগ কৈলা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়।
সন্ন্যাস-গ্রহণ করি', কৃষ্ণানুসন্ধান করি',
গোপীজনবল্লভ কোথায় ?? ৩ ॥
বাতুলের প্রায় হরি, ভূমে দেয় গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ বলি' ধূলায় লুটায় ॥
কাঁহা সেই বৃন্দাবন, কাঁহা মোর প্রাণধন,
এই বলি' ঊর্দ্ধ্ব বাহু ধায় ॥ ৪ ॥
রাধিকার প্রেমাবেশে, ভ্রমি' হরি দেশে দেশে,
জগৎ প্রেমেতে ভাসাইলা।
কলিযুগ ধন্য করি', শচীসুত গৌরহরি,
নীলাচলে আসিয়া রহিলা ॥ ৫ ॥
দু'নয়নে ঝরে জল, প্রেমে অঙ্গ টলমল,
হাসে কাঁদে করেন নর্ত্তন।
ওহে মোর গৌরহরি ! রাধাভাব করি' চুরি,
কলিতে হৈলা গৌরবরণ ॥ ৬ ॥
কৈছে প্রণয় রাধার, অদ্ভুত মধুরিমার,
রাধারাণী কি সুখাস্বাদিলা ?

সেই সুখ আস্বাদিতে, রায় রামানন্দ সাথে,
গম্ভীরায় নিজে আস্বাদিলা ॥ ৭ ॥
জগন্নাথ দরশন, সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ,
সঙ্কীর্ত্তনে পরম উল্লাস।
সঙ্কীর্ত্তন-অস্ত্র ধরি', মুখে বলি হরি হরি,
নিত্যপদে কর নিজ দাস ॥ ৮ ॥

— শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

নববর্ষ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে প্রবন্ধের শুভারম্ভে মঙ্গলাচরণ

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেবায় বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নমস্কার ও যশঃকীর্তনদ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবার আবশ্যকতা শিক্ষা দিয়াছেন। তাই তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে তৎকৃপাভিখারী আমরা আজ নববর্ষ-আরম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি,—

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥"

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনার সঙ্কল্প

আজ শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীপত্রিকা চতুশ্চত্বারিংশ-বর্ষে পদার্পণ করিলেন। মাদৃশ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়ের এই প্রপঞ্চে আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ। শ্রীপত্রিকা চিরদিনই অপ্রাকৃত নবীনমদনের উপাসক। সঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার নিত্যকৃত্য। বহুলোক একত্র সম্মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন-পিতা; সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গের পুত্র। আমরা যেন আজ হইতে নবধা ভক্তির মুখ্য কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযাজনের ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক নবদ্বীপপতি শ্রীগৌরসুন্দর ও তন্নিজজন গুরুবর্গের কৃপাভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদের গুণমহিমা নিত্যকাল তাঁহাদের কৃপায় কীর্ত্তন করিতে পারি —ইহাই সকলের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা। সঙ্কীর্ত্তনে বহু শুদ্ধ কীর্ত্তনকারীর সংযোগ হইলে তাহা অধিকতর উৎসবময় ও উৎসাহময় হয়। তাই আমরা আমাদের সতীর্থগণকে এই সঙ্কীর্ত্তনে সমবেত হইয়া আমাদের সামান্য সেবাচেষ্টাকে উৎসবময়ী ও উৎসাহময়ী করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় কৃপাভিক্ষা করিতেছি,—

"একাকী আমার　　নাহি পায় বল,
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি,　　শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥"

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগতি পরমশ্রেয়ঃ

ভক্তিপথ একমাত্র সমীচীন, মঙ্গলপ্রদ, অশোক-অভয়-অমৃত ও সুখদ হইলেও, ভক্তিপথাশ্রয় করিয়া চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়াও কখন ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হইলেও সেই পথে অনেক বিঘ্ন দেখা যায়। ভক্তিপথে এইসকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর ও ভক্তির পোষক। ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—হে মাধব! আপনাতে আসক্ত ভক্তগণ কখনও বিপথগমন করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিঘ্নকে মঙ্গললাভের সোপান করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। সুতরাং ভক্তিবিঘ্ন বিনাশের জন্য একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ—ভগবানের অভিন্নতনু। আমরা সপরিকর তাঁহার বন্দনা করিতেছি,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বহুমুখী মহিমা ও মাহাত্ম্য

শ্রীগুরুদেব অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না। তিনি হরিকথা-কীর্ত্তনবিগ্রহ ও শ্রীহরির পরমপ্রিয়। তাঁহার বাণীই শ্রুতি, তাঁহার কৃপাতেই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই জানিতে পারি। তাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়। তাঁহার কৃপায় জীবের জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী বা শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। তাঁহার কৃপাতেই জীব হরিগুণ-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরির যশোরত্ন ভাণ্ডার। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব)-সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব যে-সে ভক্ত নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। মধুররসে তিনি ব্রজগোপী বা ব্রজাঙ্গনা। শ্রীগুরুদেব আচার্য্যরূপী ভগবান্। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। তাঁহার ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা, তাঁহার কৃপাই কৃষ্ণের কৃপা। গুরুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন, গুরুপ্রীতিই কৃষ্ণপ্রীতি। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥"

নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুবর্গের করুণায় অনর্থাদির নিবৃত্তি

শ্রীভগবান্ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। নিরন্তর হরিসেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই। তিনি সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদামার্গে সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ এবং রাগমার্গে সাক্ষাৎ শ্রীগদাধর। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গসেবায় মগ্ন। তাঁহার পরমপূত ভুবন-মঙ্গল চরিত-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরমপ্রীতি ও পরমসহায় হন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় যাবতীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অনর্থ দূরীভূত হয়। এক শ্রীগুরুদেবের চরিত্র-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যুগপৎ গুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—তিনেরই স্মরণ হয়; শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মাহাত্ম্য! শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের

স্মরণ নিষ্কপটে হইলে আমাদের বিঘ্নবিনাশ অভীষ্টপূরণ নিশ্চয়ই হইবে। প্রীতি ছাড়া স্মৃতি হয় না। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি; যেখানে স্মৃতি, সেখানে প্রীতি। এই হরিবিমুখ জগতে সাধুর বড়ই অভাব। তাই করুণাময় ভগবান্ তাঁর প্রিয়তম কোন নিজজনকে এজগতে সাধুশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন। অসৎসঙ্গের কবল হইতে বা ভোক্তাভিমানের হস্ত হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আজ অপ্রাকৃত নরোত্তমরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা যেন আমাদের নিত্য বান্ধব ও রক্ষক সেই শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অধঃপতিত না হই। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর। তাঁহাকে মরণশীল মানববুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। *তাঁহাতে প্রিয়ত্ববোধ, আপনজ্ঞান বা প্রীতিই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়।* তৎপাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয়। তচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তির কোন ভয় নাই। শ্রীগুরুদেব নিত্যপ্রভু, আর আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভু।

স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের কৃপাই সাধন-ভজনপথে আমাদের একমাত্র বল ও ভরসা।

আমরা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও গুরুকৃপাই আমাদের বল ও ভরসা। প্রভু কৃপা করিলে প্রভুর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। প্রভুর হইলেই প্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে। প্রভুর সঙ্গীই প্রভুর কৃপা পাইবে। আমরা অযোগ্য হইলেও প্রভুর নিত্যকিঙ্কর। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মধূলিই আমাদের নিত্যকাম্য। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও নবপ্রেরণায় বিমণ্ডিত হইয়া আমরা যেন নববর্ষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌড়ীয়ের অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি—ইহাই শ্রীপত্রিকা, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীআচার্য্যদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.

   Nationality Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6 Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,—	Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 92

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ২৬ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ চৈত্র, সোমবার, ১৩৯৮, ইং ১৩/৪/৯২ | ২য় সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]

১। জয় জয়াজিত জহ্যগ-জঙ্গমাবৃতিমজামুপনীত-মৃষাগুণাম্।
ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী, নিগমগীত-গুণার্ণবতা তব॥ ১॥

হে অজিত! আপনি স্থাবর-জঙ্গমের আবরণ-স্বরূপা অনিত্য-গুণাশ্রিতা মায়ার বিনাশ সাধন করিয়া আপনার জয় প্রদর্শন করান, বিজয় ঘোষণা করুন্। আপনি ব্যতীত এই বিশ্বের কেহই কোন কার্য্যে সমর্থ নহে। বেদসকল আপনারই গুণার্ণবত্ব কীর্ত্তন করেন॥ ১॥

২। দ্রুহিণ-বহ্নি-রবীন্দ্রমুখামরা, জগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে॥ ২॥

ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং এই বিশ্ব আপনা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভুত হইতে পারে না। এইজন্যই বহুবিধ মন্ত্র আপনাকেই 'অজ' ও 'বিরাট্‌মূর্ত্তি' বলিয়া বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন ॥ ২ ॥

৩। **সকল-বেদগণেরিত-সদ্‌গুণস্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষি-জনা রতাঃ।**
ত্বয়ি সুভদ্রগুণ-শ্রবণাদিভিস্তব পদ-স্মরণেন গতক্লমাঃ ॥ ৩ ॥

নিখিল বেদ আপনার সদ্‌গুণ প্রচার করেন। এতাদৃশ আপনাতে সকল মনীষিজন আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা অনুরক্ত এবং আপনার শ্রীচরণ-যুগল স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপরহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

৪। **নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি, শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ।**
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং, দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥৪॥

হে নৃসিংহদেব! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা আপনার ভজন না করে, তবে তাহাদের এই শ্বাস-গ্রহণ বা জীবন-ধারণ 'ভস্ত্রা'তুল্য বিফল হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

৫। **ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্।**
ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্ত্তয় ॥ ৭ ॥

হে ঈশ্বর! হে পরানন্দ! আমি আপনার (অণু) অংশ। আপনি আপনার শ্রীপাদ-যুগলের সেবা প্রদান করত আমার ভবদীয়-মায়াকৃত বন্ধন দূর করুন ॥ ৭ ॥

৬। **ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।**
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

আপনি জগন্নাথ, আপনি পরমাত্মা। আপনাতেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট হউক। কখন ভবদীয়-সেবাপর ঈদৃশ মনুষ্য-জন্ম আমার লাভ হইবে?? ৯ ॥

৭। **ক্বাহং বুদ্ধ্যাদি-সংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।**
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥ ১১ ॥

হে ভূমন্! দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! কোথায় আমি বুদ্ধি প্রভৃতিদ্বারা আচ্ছন্ন, আর কোথায় আপনার তেজঃ বা মহিমরাশি! হে নৃহরে! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

৮। **যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ।**
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার সত্তাতে স্বতঃ অসৎ এই জগৎ সদ্রূপে প্রতিভাত হয়, এই অসৎ জগতে যিনি একমাত্র সদ্‌বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন, সেই ভগবানকে আমরা ভজন করি ॥ ১৩ ॥

৯। তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ১৪ ॥

মানবগণ সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া তপস্যা করুক, ভৃগুপাত করুক অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পতিত হউক, তীর্থসকল ভ্রমণ করুক, বেদ-বেদান্তসকল পাঠ করুক, বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করুক অথবা তর্কদ্বারা বাদ-বিসম্বাদই করুক ; কিন্তু শ্রীহরির কৃপা-ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

১০। সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণ-নানাভবতাপতপ্তম্।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্ ॥ ১৯ ॥

হে নৃহরে! সংসারচক্ররূপ করপত্র (করাৎ)-দ্বারা বিদীর্ণ ও উদীর্ণ এবং নানাবিধ ভবতাপতপ্ত, কোনও প্রকারে ভবদন্তিকে আগত ও আপনাতে শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন ॥ ১৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

বিদ্ধোপদেশক বা আচার্য্যব্রুব

১। নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতগণের বিচার ও ব্যবহার কি?

"সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড বা অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে ; তাহা হইলে তুমি বা জগৎ কেহ সুখী হইতে পারিবে না। বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

২। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনাম বা দীক্ষা-দান কি সদ্‌গুরুর কার্য্য?

"যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

৩। বুজ্‌রুক কি গুরু নহেন ?

"বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায়॥" —'উপদেশ' ১৬, কঃ কঃ

৪। গুরুত্যক্ত সন্ন্যাসিব্রুব কি আচার্য্য ?

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম-উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৮

৫। বিদ্ধ ও শুদ্ধ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত কি এক ?

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

সৎসম্প্রদায়

৬। সৎসম্প্রদায়-প্রণালী কি সনাতন,—না অর্ব্বাচীন ?

"সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।" —জৈঃ ধঃ ১৩শ অধ্যায়

৭। কাঁহারা বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন ?

"যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

৮। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের গুরু-প্রণালী কি ? কাহারা তাঁহাদের প্রধান শত্রু ?

"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম

লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।" —শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

৯। কলির গুপ্তচর কাহারা ?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে **গুরুপরম্পরা সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না,** তাঁহারা **কলির গুপ্তচর**।" —শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

১০। ভাবীকালে ভক্তি-তত্ত্বে একমাত্র কোন্ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে ?

"স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে -শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।" —শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

১১। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েব মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কেন ?

"সকল সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের এক মত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।" —প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

১২। সম্প্রদায়-প্রণালী কি জীবের পক্ষে অহিতকর ?

"সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। * * * সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায় বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজারের সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমরা কোনপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১৩। সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ-মত কোন্ সময় সৃষ্ট হইয়াছে ?

"ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে **কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না।** পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত

ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১৪। সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অধিক,—না গুণ অধিক ?

"নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১৫। অসাম্প্রদায়িকগণ কি স্বকপোল-কল্পিত অসৎসাম্প্রদায়িক নহে ?

"সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব। * * * যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী, তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। * * * পরে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিস্ফুটাবস্থার ইতিহাস কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে উহা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা; পরে একটু বিকচিত-ভাবে লক্ষিত; ক্রমশঃ পূর্ণ-বিকচিতভাব-প্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী-সম্মত ভগবজ্-জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্য-গণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নামপ্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৮। পরমার্থ-তত্ত্ব কিরূপে ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত ও পরিপক্ব হইয়াছে ?

"পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ড-কাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্বাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৯। সৎসম্প্রদায়-বিশেষের আনুগত্য কিভাবে সূচিত হয় ?

"শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন ; কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-প্রদত্ত বিচার-বলে ও ভগবৎকৃপায় শারীরক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব স্ব মতে শারীরক-ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতা ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরিউক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

২০। পরমার্থ-তত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা কোথায় হইয়াছে ?

"সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপেই পরমার্থ-তত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগ-ক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াস-লভ্য নহেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সাধন ও সাধ্য

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভীষ্টবস্তুর লাভ হয়, তাহাকে 'সাধন' বলে। ভক্তিশাস্ত্রে উহাই 'অভিধেয়' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অভক্তগণের মধ্যে সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাববশতঃ নানাপ্রকার অভিনব কল্পনামূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত ও প্রবর্ত্তিত আছে। তপঃ, ইজ্যা, পুরশ্চরণ, ব্রত, স্বাধ্যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি বায়ু-সংযমদ্বারা কুম্ভক, পূরক ও রেচকাভ্যাস, নির্ব্বাপণ, ত্যাগ, আসন, ত্রিসবন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্য্যটন, চিত্ত-নিরোধ-চেষ্টামূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম্মপর অর্চ্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহী জনগণকর্ত্তৃক সাধন-রূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীবছলনারই প্রকারান্তরমাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধ-সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব নিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধজীবের ভ্রম, প্রমাদ ও বিঘ্ন আনয়ন করে এবং নিত্যসত্য বাস্তব সাধ্যতত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্যবিচারে মুমুক্ষু-সম্প্রদায়. ত্রিবিধ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণলাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। বুভুক্ষু-সম্প্রদায় ইহামুত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষুগণ নির্ব্বিশেষব্রহ্মসাযুজ্যকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্যবিচারে 'ভগবৎ-প্রেমা'কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গসুখ বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ভাবদ্বয়কে 'কৈতব' বলিয়াই জানেন। তাৎকালিক বঙ্গদেশে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধসাধ্য-সাধন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শ্রুতি ও তদনুগশাস্ত্রের সারগ্রহণে পরমযোগ্যতাবিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুশ্রূষু সুকৃত ব্রাহ্মণ তপনমিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি প্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচ প্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না, —যে-কাল পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনি ধন্য। তাদৃশ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহজগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুক্ত জীব সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে কালে মায়াবদ্ধ দীন জীবগণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য এই সকল ভাগবত-কথা আলোচনামুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যুগোচিত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়।

সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেই-কালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই 'কৃতযুগ' বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞবিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কালে ত্রিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা 'ত্রেতাযুগ' বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। ধর্ম্মের অর্দ্ধাবসানে যুগধর্ম্ম অর্চ্চাবিষ্ণুর অর্চ্চনমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্বিপাদ ধর্ম্মের অধিষ্ঠানহেতু উহা 'দ্বাপর যুগ' নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ-ধর্ম্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য প্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। যে-স্থানে কৃষ্ণনাম-কথা প্রচারের অভাব, সেই স্থানেই প্রচার-রহিত নির্জ্জন-ভজন-মুখে অর্চ্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্ঞবিধি এবং পুনরায় নির্জ্জনভজন-চেষ্টামূলে ধ্যান স্মরণাদির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাগ্‌যুগত্রয়ের সাধন-প্রণালীত্রয় অপেক্ষা নাম-সংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত নাই জানিতে হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিভ্রম

[শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির অনুষ্ঠানও কর্ম্ম হইয়া যায়।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬
ইং ৪।৬।১৯৬৫

স্নেহাস্পদেষু * * *

মগরা হইতে তোমার লিখিত পত্র পাইলাম। তুমি যে খুব প্রচারাদি করিতেছ ইহা আনন্দের কথা, তবে সে প্রচার গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে করিলে তাহা কর্ম্মমার্গে পরিণত হয়। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" **তুমি যেরূপ আদর্শ দেখাইলে তাহা তোমার পক্ষে আদৌ সঙ্গত হয় নাই**। মঠবাসিগণের বিশেষতঃ যাঁহারা পাঠক বা বক্তা তাঁহারা লোক-শিক্ষকরূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিবেন। সুতরাং সকল কথা অসহ্য হইলে চলিবে কেন? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক শারীরিক আঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছেন। "তরোরপি সহিষ্ণুনা" মহাপ্রভুর শিক্ষা কোথায় প্রযুক্ত হইবে? নিজের জীবনে যদি তাহা প্রতিফলিত করিতে না পারা যায় তবে ভজনে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? যাহা হউক তুমি পিছলদা হইতে উৎসবাদি শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।

* * * প্রভুর নিকট তোমার সংবাদ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম। তিনি তোমার প্রাথমিক সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন। পরে লিখিয়াছেন যে, * * * কোথায় আছেন তাহার সংবাদ তিনি জানেন না। তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম, * * *-এর সংবাদ লইয়া পত্রপাঠ তাহাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। তোমার সন্ধান না পাইয়া তিনি পাঠাইতে পারেন নাই।

* * *কে বলিয়াছিলাম, তিনি যেন তোমার খোঁজ লইয়া পিছলদা মঠে লইয়া আসেন এবং উৎসবের পর যেন এখানে পাঠাইয়া দেন। ইতিমধ্যে তোমার সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি পিছলদা হইয়া এখানে আসিবে।

* * * ৩/৪ দিন পরে তোমার অনুসন্ধানে মেদিনীপুর গ্রামাঞ্চলে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমার পত্র আসিয়া পৌছিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে পাঠাইবার আর আবশ্যক নাই।

* * *-এর সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। * * * যাহা হউক, তুমি পিছলদায় গিয়া উৎসব শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার শরীর মধ্যে কয়েক দিন খুব খারাপ হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ভাল হইতেছি। কলিকাতায় আর কয়েকদিন থাকিয়া চুঁচুড়া হইয়া নবদ্বীপ যাইব। * * শ্রীরামপুরে ভিক্ষা করিতে যাইয়া **S. P.**র **Motor**-এ **Accident** হইয়া ওখানে হাসপাতালে আছে। তবে ভয়ের কারণ নাই। কিছুদিন কষ্ট পাইবে। * * * মহারাজ চুঁচুড়ায় গিয়াছেন। * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

দীক্ষা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥"

তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম গুরুতত্ত্বসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। পারমার্থিক ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে সর্ব্বত্রই গুরুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুরুগণকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) দীক্ষাগুরু, (২) শিক্ষাগুরু, (৩) বর্ত্মপ্রদর্শক বা শ্রবণ গুরু ও (৪) চৈত্যগুরু। দীক্ষাগুরু মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। এই দীক্ষাপ্রভাবেই দীক্ষাগুরু শিষ্যকে ভগবানের নিকটে লইয়া যান। গুরুই ভগবানের প্রিয়জন। কোথাও কোথাও তাঁহাকে ভগবানের অন্যতম মূর্ত্তি-রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেই গুরুই বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে চৈত্যগুরুরূপে প্রেরণাদ্বারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৯।৬) এই শ্লোকটি আলোচ্য—

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

এখন কথা হইতেছে—এই প্রকার গুরুর সঙ্গ মায়াবদ্ধ জীব কি-প্রকারে লাভ করিবে ? কারণ সে ত' অজ্ঞানান্ধ। তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা কোথায় ? এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে গিয়া গীতায় (১০।১০) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥"

যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক প্রীতিসহযোগে ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিতে পারেন।

এখানে দেখা যাইতেছে—চিত্তশুদ্ধিই প্রথম কথা ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে চৈত্ত্যগুরু, শ্রবণগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু দীক্ষাগুরুর সান্নিধ্যে লইয়া যান। গুরুতত্ত্বমাত্রই জীবের কল্যাণের জন্য সততচেষ্টাবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিলেও আমাদের সৎ-চিন্তার মধ্যে তাঁহাদের করুণার উপলব্ধি হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে 'গুরু'-শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে,—

'গু'-শব্দ-স্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ 'রু'-শব্দ-স্তন্নিরোধকঃ ।
অন্ধকার নিরোধত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

গুরু—এই দুই শব্দের মধ্যে গু-শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং রু-শব্দের অর্থ সেই অন্ধকারকে দূর করা ; উভয়শব্দের মিলিত অর্থের তাৎপর্য্য—যিনি শিষ্যের অন্তরের যাবতীয় অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করিয়া ভগবজ্-জ্ঞানরূপ আলোকপ্রদান করিয়া থাকেন, তিনি গুরু। বাহিরের আলোক-দ্বারা বাহিরের সমস্ত আলোকিত হইতে পারে ; তাহাতে অন্তরের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত হয় না। যিনি জীবের অন্তরের সেই অন্ধকার দূর করিয়া দেন, তিনি গুরু। সূর্য্যের প্রকাশে তাহার আলোক বা আলোকের আভাস যে-সকল স্থানে পতিত হয় সেই সকল স্থানের বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যে স্থানে ঐ আভাসও পতিত হয় না, সেই সকল গুহা প্রভৃতির দ্রব্যসমূহ অন্য কোন আলোক ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম আলোকস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও আলোকময়। সেই ভগবদালোক গুরুর দ্বারাই জীবের হৃদয়ে পতিত হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া থাকে। কোন মহাজন হিন্দিতে বলিয়াছেন,—

"যে সউ চন্দা উগবহি সুরজ চড়ে হাজার।
এতে চানন হোদিয়া গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার ॥"

অর্থাৎ "উদ্যন্তু শতমাদিত্যাঃ উদ্যন্তু শতমিন্দবঃ।
ন বিনা বিভুষাং বাক্যৈর্নশ্যতেঽভ্যন্তরং তমঃ ॥"

যদি আকাশে শত চন্দ্র, শত সূর্য্যের উদয় হয়, তাহা হইলে বহিঃ জ্যোতির্ম্ময় হইবে বটে, কিন্তু লোকের হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হইবে না। তাহা একমাত্র গুরুর উপদেশেই সম্ভব; কারণ, গুরুর উপদেশের দ্বারাই অন্তরের অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ"—এই দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ আনন্দ ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' করে বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান ॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম ॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥

তুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
তুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
তুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

এই কয়েকটি পয়ারের মধ্যে সাধ্যবস্তু, সাধন এবং সাধ্যবস্তুকে পাইবার বাধক সমস্তই সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্ববস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে পাইবার উপায় ভক্তি। ভক্তির ফল হইতেছে প্রেম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম পাইবার বাধক শুভাশুভ কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—কর্ম্মিগণের কাম্য এই ত্রিবর্গ; এতদ্ব্যতীত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের কাম্য সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধক। ইহারাই তমঃস্বরূপ হইয়া বাস্তব জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র আজ আচার্য্য-লীলার অভিনয়কারী শ্রীগৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্বিমুখ জীবকুলের মায়াতমঃ বিনাশার্থে মহাভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র-গণের দ্বারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রেমভক্তিরস জীবহৃদয়ে সঞ্চার করিবার জন্য বাস্তব দীক্ষা-প্রদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

'জন্মাদ্যস্য' (ভাঃ ১।১।১ শ্লোকের 'সত্যং পরং ধীমহি'—এই দীক্ষা-মন্ত্রের গূঢ় রহস্য, পরম সত্যবস্তু যে ভগবান্ তাঁহাকেই একমাত্র ধ্যান করিবার কথা বলা হইতেছে। তিনি ধ্যেয় ও জ্ঞেয়। ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপজ্ঞানলাভে মায়াগ্রস্ত জীব সর্ব্বদাই ভ্রান্ত হইতেছে; এই ভ্রান্তি সূরিগণে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'; সুতরাং সামান্য মনুষ্যগণ যে সেই তত্ত্ব-নিরূপণে মোহগ্রস্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

মন্ত্র আমাদিগকে মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। দেহ-মনোধর্ম্ম থাকা পর্য্যন্ত মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধির বিষয় হয় না। বহির্ম্মুখ জগতের দীক্ষা সম্বন্ধে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে বিচারের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া অন্ধবিশ্বাসিগণ মনে করেন না। যাহার যেরূপ রুচি, সেইরূপ দীক্ষা-মন্ত্র পাঁচ-মিশালী গুরু (?) হইতে গ্রহণ করিলেই হইল। ঐ শ্রেণীর গুরুগণও (?) মন্ত্রের বিপণি খুলিয়া বসিয়া আছেন। যিনি যে মন্ত্র প্রার্থনা করেন, তাঁহার অধিকার বিচার না করিয়া অর্থ ও গুরুর গৌরব লাভের জন্য তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া থাকেন। সদাচার-পালনের কোন কথা তাঁহারা শিষ্যদিগকে বলেন না; বলিবার সৎসাহসও অতি অল্পব্যক্তিতেই আছে, কারণ ঐ শ্রেণীর গুরুগিরি-ব্যবসায়ে লিপ্ত জনগণ

নিজেরাও সদাচার পালন করেন না। যাঁহারা শাশ্বতী শান্তির জন্য দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই উপদেশ স্মরণ রাখিতে হইবে --

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

আরাধ্যবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে ভ্রান্তি থাকিলে দীক্ষার ফলও সেইরূপই হইবে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীঃ ৭।৭)

গীতার এই শ্লোকে পরতত্ত্ব যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীদের পরতত্ত্ব বলিতে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমিড্যম্॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।৭)

অতএব আরাধ্যবস্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত, সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাই জীবের পূর্ণতম কল্যাণ-বিধানে সমর্থ। এইজন্যই শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুক্তি—

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্ততো দীক্ষাদিশিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

এখানে গুরুসম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্ত ও একভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে সদ্‌গুরু বলিয়া জানিতে হইবে। গুরুদেব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য-বিজেতা, শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ এবং ভগবদ্‌দ্রষ্টা —দয়ার সমুদ্র। পূর্ণবস্তুকে লাভ করায় তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; তিনি সকলের উপকারক, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যায় পারঙ্গত, শিষ্যের যাবতীয় সংশয় ছেদনে সমর্থ এবং আলস্যরহিত। এই প্রকার গুরুর নিকট হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি নিত্য-কল্যাণ লাভে সমর্থ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নিরসনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে কৃষ্ণদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা জগৎকে জানাইবার জন্য গয়াধামে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে শ্রীগুরুরূপে বরণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, —

"সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান॥"

"কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।"—এই কথাটি ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। এই অমৃত-প্রদানের যোগ্যপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদ, গ্রহীতা শিষ্য-লীলাভিনয়কারী ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি, যিনি মাধুর্য্যলীলায় স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ। তিনি ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া দীক্ষাপ্রার্থী। দীক্ষার ফল-সম্বন্ধে তিনি পুরীপাদকে বলিতেছেন,—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

দীক্ষার প্রভাবে জীবনের অনন্তকোটি অনর্থরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং ভগবানের প্রেমসেবার জন্য চিত্ত উন্মত্ত হয়, তখন শিষ্য আর ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয় হইতে দূরে থাকিতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে পদব্রজে

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

২২শে আশ্বিন, '৯৯ (ইং ৯।১০।৯২) শুক্রবার

সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবে

মাঘী-কৃষ্ণ-তৃতীয়ায়
গৌরচন্দ্রের কৃপায়
এক গৌরজন।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম
প্রচারিতে এই নাম
প্রকটিত হন॥

সন তেরশত চার
মাঘ বারো সোমবার
পরিশুদ্ধ অতি।

জীবজগতের কাছে
চিরস্থায়ী হয়ে আছে
এক পূর্ণ জ্যোতি॥

ইঁনি বিনোদবিহারী
দুর্জ্জনের দর্পহারী
নিত্য প্রেমদাতা।

প্রভুপাদ কৃপাধন্য
গৌড়ীয় বিশ্বে অনন্য
বদ্ধজীবত্রাতা॥

মহান 'উপদেশক'
আশ্রিতের সুরক্ষক
যোগ্য 'কৃতিরত্ন'।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন
পায় হেথা সর্ব্বক্ষণ
প্রীতি, স্নেহ, যত্ন॥

মহাপ্রাণে প্রাণবান্
তেজদীপ্ত নিষ্ঠাবান্
ত্যাগের আধার।

কর্ত্তব্য প্রতিপালনে
বাধা-বিঘ্ন উতরণে
শ্রেষ্ঠ মূলাধার॥

সমস্যাদি সমাধানে
ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশনে
বৈষ্ণবপ্রধান।

মঠাদি সংগঠনে
যথাযথ মূল্যায়নে
অতি শ্রদ্ধাবান্॥

ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায়
নিত্য নূতন ব্যাখ্যায়
অদ্বিতীয় যিনি।

জড়বুদ্ধি দিয়ে তাঁরে
এ জগৎ-সংসারে
কতটুকু চিনি॥

একদিন শিশুকালে
দুর্ঘটনা ঘটে ভালে
অতি ভয়ঙ্কর।

দয়াময়ের দয়ায়
বিঘ্ন হতে রক্ষা পায়
নব গুণধর॥

তখনই মনে হয়
এই শিশু শিশু নয়
অতি ভাগ্যবান্।

ধর্ম্মীয় অনুশাসনে
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারণে
নিবেদিত প্রাণ॥

ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশনে
জীবচিত্ত বিনোদনে
প্রেরণাস্বরূপ।
আচার্য্য ভক্তিপ্রজ্ঞান
তাঁর সুষ্ঠু সেবাজ্ঞান
অতি অপরূপ॥
গুরুদেবে গুরুভক্তি
তাঁর আকর্ষণী শক্তি
বড়ই মধুর।
প্রেমের সেতু নির্ম্মাণে
গভীর আনন্দদানে
থাকে ভরপুর॥
একদা শ্রীমায়াপুরে
প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে
শ্রদ্ধাদান পরে।
ক্রন্দনে ব্যাকুল হন
জলে ভরে দু-নয়ন
ঝর্ ঝর্ ঝরে॥
'প্র'-অক্ষর উচ্চারণে
প্রভুপাদ আকর্ষণে
কণ্ঠরোধ হয়।
শ্রীগুরু-শিষ্যের এই
অন্তরঙ্গ মাধুর্য্যেই
পাষাণ গলয়॥
কোলদ্বীপে উচ্চ মঠ
শুদ্ধ হৃদয়ের নট
জ্ঞান গরিমায়।

সুন্দর ভক্তিমন্দির
অলঙ্কৃত তার শির
নিত্য শোভা পায়॥
শ্রীকেশব গোস্বামীর
পূতঃ সমাধি-মন্দির
এক পীঠস্থান।
শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের
শোকবিহ্বল চিত্তের
শ্রেষ্ঠ অবদান॥
বেদনায়, চেতনায়
বক্ষস্থল ভেসে যায়
অতি ধীরে ধীরে।
অশ্রুসজল নয়ন
চেয়ে থাকে অনুক্ষণ
সমাধি-মন্দিরে॥
গুরু-মহারাজ হেথা
বেদী 'পরে পূর্ণচেতা
পূর্ণ কলেবর।
জীবের কল্যাণ তরে
জ্ঞানচক্ষু দান করে
পূর্ণ শশধর॥
পূজা, পাঠ, দীক্ষা হয়
ভক্তিরসে রসময়
অপার্থিব ধন।
আরতির ক্রিয়া-কর্ম্ম
অন্তর আত্মার ধর্ম্ম
তোলে শিহরণ॥

ভক্তিবেদান্ত সমিতি
ভারতের মহামতী
গৌড়ীয় প্রধান।
শুদ্ধ শ্রীল কেশবের
তত্ত্বনিষ্ঠ অন্তরের
এক অবদান ॥

চৌদিকে ফুলের মালা
সাজান বরণডালা
দেবানন্দ মঠে।
অতীব নিষ্ঠার সাথে
ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাতে
ভক্তবৃন্দ ছোটে ॥

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ**, সেবাসুহৃদ্, সাংবাদিক, পি. টি. আই.

ভগবান্ যুগপৎ সগুণ ও নিগুর্ণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞাদি গুণসমূহ নিত্যসিদ্ধ—কাল্পনিক নহে

নিগুর্ণবাদীরা নিজমতের পোষণার্থে যুক্তি দেখাইতে গিয়া বলিয়া থাকেন,—"বেদ বাক্যের দ্বারা বাক্যরূপ ধেনুকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যেরূপ ধেনু হইতে ভিন্ন যে বাক্য তাহাতে ধেনুত্ব আরোপ করা হয় অর্থাৎ বাক্যকে ধেনুস্বরূপ বলা হয়, তদ্রূপ সগুণপ্রতিপাদক বাক্যসকল নিগুর্ণ ব্রহ্মে আরোপিত হয়। চিত্ত উপাসনাদ্বারা মার্জ্জিত হইলে তাহা নিগুর্ণ ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে। অব্যুৎপন্ন বালককে যেরূপ চন্দ্রদর্শন করাইবার জন্য প্রাচীন ব্যক্তি প্রথমতঃ বৃক্ষশাখায় চন্দ্রদর্শন করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ বেদ অজ্ঞ ব্যক্তিকে নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়া থাকেন। উপাসনার কার্য্যান্তে ব্রহ্মের গুণসমূহের তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে বেদ-বাক্যের ভেদাপত্তি ঘটে এবং তাহা হইলে সগুণ ও নিগুর্ণ এই দুই ব্রহ্মের আপত্তি হয়।"

নিগুর্ণবাদিগণের মতবাদ "শিক্ষক ছাত্রকে বিদ্যা শিক্ষা দেন তাহাকে মূর্খ করিয়া তুলিবার জন্য" ন্যায় হাস্যাস্পদ। গুণহীন বস্তুর কখনও কোন উপাসনা সম্ভব হয় না। উপাসনার কথা আসিলে অবশ্যই বস্তুর গুণ স্বীকার করিতে হইবে। "আত্মাকেই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে আত্মার উপাসনা উক্ত হইয়াছে, নিগুর্ণবাদীর মতানুসারে আত্মার কোন গুণ না থাকিলেও উপাসনার কার্য্যে তাহাদের অবশ্যই আত্মার কাল্পনিক গুণ স্বীকার করিতে হইবে। আবার গুণহীনে

গুণভজন অসম্ভব। ব্রহ্ম বা আত্মার কাল্পনিক গুণসমূহের উপাসনাও অবাস্তব। উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মের কাল্পনিক গুণসমূহ স্বীকার করিলে তাহার অনাত্মত্বের প্রাবল্য ঘটে। যিনি উপাস্য, তিনি কল্পিত; এইরূপ বলিলে নির্গুণবাদীর নিজ-মতেরই ব্যাঘাত ঘটে। নির্গুণবাদী বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ ও অষ্টত্রিংশ সূত্রে উদ্ধৃতি করিয়া বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম উপাস্য।" ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম কখনও কাল্পনিক হইতে পারে না। অতএব যেক্ষেত্রে উপাস্য বিষয়ে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্মসমূহের সত্যত্ব স্বীকৃত হইল, সেইক্ষেত্রে ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞাদি গুণসমূহের সত্যত্ব স্বীকারে অসুবিধা কোথায়? অতএব ব্রহ্মের কল্পিত গুণসমূহ নহে, উপাস্যরূপে ব্রহ্মের নিত্য গুণসমূহের উপাসনার কথাই বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্তিত কথা।

ব্রহ্মের গুণসকল কল্পিত বলিলে নির্গুণবাদীর নাস্তিকতাপত্তি ঘটে

নির্গুণবাদীদের মতে,—"ব্রহ্মের ব্যবহারিক গুণসমূহ বোধগম্য করাইবার জন্য বেদে সগুণপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে, আর ব্রহ্মের পারমার্থিক গুণাভাব প্রতিপাদন করাই বেদের নির্গুণ বাক্যসমূহের চরম উদ্দেশ্য।" নির্গুণ-বাদীদের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কারণ বেদে সগুণপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের মধ্যে 'ব্যবহারিক' শব্দটি কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। নিজমত পোষণের সুবিধার্থে কাল্পনিক 'ব্যবহারিক' শব্দ প্রয়োগ করিলে তত্ত্বজ্ঞগণ তাহা কখনও মানিয়া লইবেন না। নির্গুণবাদীর উল্লেখিত ব্রহ্মের গুণসমূহ কল্পিত বলিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। "সত্যের প্রকাশক বেদ মিথ্যাভূত গুণসমূহ প্রতিপাদন করিয়াছেন" বলিলে বেদের অপ্রামাণ্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। "বন্ধ্যা পুত্রের" ন্যায় বেদ তখন কাল্পনিক হইয়া পড়ে। বাস্তব সত্য বেদকে কাল্পনিক প্রতিপন্ন করিবার ফলে নির্গুণবাদীর নাস্তিকতাপত্তি ঘটে। তাঁহাদের মতের বহুমানন করিলে শ্রুতির "সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই ছিলেন" ইত্যাদি উক্তিসমূহ মিথ্যা হইয়া যায়। এক্ষেত্রে সত্তার অভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্বের বিলুপ্তি হয় অর্থাৎ শূন্যভাবাপত্তি হয়। অতএব যেক্ষেত্রে ব্রহ্মের কোন অস্তিত্বই নাই, সেইক্ষেত্রে নির্গুণবাদীরা কি করিয়া "নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা বেদের চরম উদ্দেশ্য" বলিতে পারিবেন? আবার "তিনি অসৎই ছিলেন" ইত্যাদি বেদবাক্যের অনুসরণকারী অসদ্বাদীর নিন্দা করিয়া সদ্বাদী যে প্রস্তাব করেন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। নির্গুণবাদীর মতানুসারে অতিরাত্রে যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের গ্রহণ ব্যবহারিক এবং অগ্রহণ পারমার্থিক বলিলে পূর্ব্বমীমাংসার সহিতও বিরোধ ঘটে।

ব্রহ্মের সাক্ষিত্বাদি-ধর্ম্মসমূহ সগুণেরই পরিচায়ক

নির্গুণবাক্যে ব্রহ্মের 'সাক্ষিত্বাদি' ধর্ম্মসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতে (ভাঃ ১০।১৪।১৪) ব্রহ্মা স্তবের মধ্যে "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাম্" শ্লোকে ব্রহ্মকে 'অখিললোকসাক্ষী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মী বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে 'সাক্ষিত্বাদি' শব্দসমূহ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহজগতে দেখা যায়, যিনি সাক্ষ্য দেন তিনি সাক্ষী। সাক্ষ্য দেওয়াই সাক্ষীর ধর্ম্ম। সাক্ষীর ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে সাক্ষীর অস্তিত্বই থাকে না। ব্রহ্মে সাক্ষী শব্দ প্রয়োগের নিমিত্ত অবশ্যই তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। আবার ধর্ম্মস্বীকারে সাক্ষিত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সগুণত্ব অনিবার্য্য হয়। ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণের মধ্যে সুসামঞ্জস্য হয় না। ভগবান্ সূত্রকার সমন্বয়াধ্যায়ে ব্রহ্মের গুণ-সকলের প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"সূর্য্যের বা অক্ষির অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা ; কারণ এই প্রকরণে ও অন্তর্বর্ত্তী পুরুষের উদ্দেশ্যেই 'অপহতপাপত্ব' অর্থাৎ কর্ম্মবশ্যতারাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। জীবের ক্ষেত্রে 'কর্ম্মবশ্যতারাহিত্য' শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ জীব কর্ম্মবশ। আবার দেবতাদিগেরও সম্বন্ধে যে 'লোকেশ্বরতাদি' পদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহাদের স্বাভাবিক নহে, ঈশ্বর আরাধনা করিয়া তাঁহারা তাহা লাভ করিয়াছেন। দেবতাগণের ফলদাতৃত্বও ঈশ্বরাধীন। তাঁহাদের উপাস্যতাও ঈশ্বরের স্বরূপে নহে ফলে তাঁহারা উপাস্য বলিয়া শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না। দেহসম্বন্ধ প্রতীতিবশতঃ অক্ষের অন্তর্বর্ত্তী পুরুষকে কখনও জীব বলা যাইবে না, কারণ পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদি "আমি এই মহান পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক দেহবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া জানি" ইত্যাদি শ্লোকে পুরুষের অপ্রাকৃত দিব্যদেহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সাক্ষিত্বাদি গুণ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র চিন্মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা এ সকল শব্দের লক্ষ্য, ইহা বলা যাইতে পারে না। 'সাক্ষিত্বাদি' প্রভৃতি ধর্ম্মসকলদ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্বের পরিচয়ই দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের 'সাক্ষিত্বাদি' ধর্ম্মের কথা শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই আবার তাঁহার শ্রুতিদ্বারা অনুবাদ সম্ভব হয় না। অতএব অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণরত্নাকর হরি সর্ব্ববেদবাচ্য, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

গুণবানই আকর্ষক, গুণহীন কাহাকেও আকর্ষণে অসমর্থ

কথায় বলে,—"রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি" অর্থাৎ কেবল রূপ আদরণীয় নহে, গুণই আদরণীয়। রূপযুক্ত বস্তু গুণহীন হইলে তাহাতে কেহ

আকর্ষণ বোধ করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ গুণহীন রূপযুক্ত বস্তুর দ্বারা আকর্ষিত হইলেও পরে তাঁহাদের মোহভঙ্গ হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম কাহারও আকর্ষক অথবা সগুণ ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। "তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক দৃষ্ট হয় না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (গীতা ৭।৭) তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নির্গুণবস্তু তুচ্ছতার নিমিত্ত কাহারও অনুরাগের বিষয় হয় না। সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই মোক্ষরূপ পুরুষার্থের জনক। এই প্রসঙ্গে শ্রুতিতে (মুণ্ডক ৩।১।৩) পাওয়া যায়,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

"দ্রষ্টা জীব যখন রুক্মবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপকর্ম্ম সমূলে পরিত্যাগ করত নিরঞ্জন অবস্থায় পরমেশ্বরের সাম্য লাভ করিয়া থাকেন।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতার (গীতা ৫।২৯) "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্" শ্লোকে বলিয়াছেন,—"যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও সুহৃৎ আমাকে জানিয়া জীব মোক্ষলাভ করে॥" অতএব শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্যসমূহ ব্রহ্মের সগুণত্বকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম বেদবাচ্য, কিন্তু গুণের আনন্ত্যহেতু জীবের 'অবাচ্য'

নির্গুণবাদীদের কেহ কেহ ব্রহ্মের সগুণত্ব খণ্ডন করিয়া নির্গুণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির কয়েকটি বাক্যের অবতারণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাছাই করা শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে প্রায়শঃ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, "যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" অর্থাৎ যাঁহাকে শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যিনি শ্রবণ সামর্থ্য প্রকাশ করেন, "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" অর্থাৎ যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যিনি বাক্যকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম—এই বাক্যগুলি পরিদৃষ্ট হয়। "যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ, অহং চান্যে ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ" অর্থাৎ যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, অন্য দেবতাসকল ও আমি যাঁহাকে জানিতে পারি নাই, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যসমূহ তাঁহাদের মনোনীত বাক্যসমূহের অন্তর্গত।

তাঁহাদের মতানুসারে "যিনি দেবতাগণের অজ্ঞাত, বাক্যদ্বারা অবাচ্য এবং মনের দ্বারা অপ্রাপ্য, সেই ব্রহ্ম কি করিয়া সগুণ হইতে পারেন ?"

নির্গুণবাদীদের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলা যাইতে পারে, বিষ্ণুর গুণ অনন্ত ; যাহা অনন্ত তাহা সাকল্যে জানা যায় না ; তাই তাঁহাকে অবাচ্য বলা যাইতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী ভাগবতের (ভাঃ ৬।৯।১২) টীকার মধ্যে বলিয়াছেন,—"পদ্যে অক্ষরসমূহকে পরিমিতভাবে সজ্জিত করিতে হয়, তাহাতে হরির অনন্তগুণ উচ্ছ্বাসের সহিত পরিমাপ করিয়া বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং দেবগণ পদ্যে স্তব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গদ্যে স্তব করিলেন। ভাগবতের (ভাঃ ১১।৪।২) অন্যত্র নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীদ্রুমিল ঋষিও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি জগদীশ্বর শ্রীহরির গুণসমুদয় গণনা করিতে ইচ্ছা করে, সে অতিশয় অজ্ঞ, যেহেতু— পুরুষ যদ্যপি সুদীর্ঘকাল ভূমিস্থিত ধূলিকণাসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীহরির গুণসমুদয় গণনা করিতে সমর্থ হয় না।" শুদ্ধ পরিপূর্ণ বিষ্ণুর বেদবাচ্যত্ব প্রসঙ্গে ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন,—"বেদবাচ্যত্ব দর্শনহেতু ব্রহ্ম অশব্দ অর্থাৎ বেদে অপ্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বেদবাচ্য হন। অশব্দ পদে প্রকৃতিকে বুঝাইবে না, যেহেতু 'অজামেকাং' প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রকৃতির বেদবাচ্যত্বই দৃষ্ট হইয়া থাকে।" আবার 'সর্ব্ব বেদা যৎপদমামনন্তি' অর্থাৎ সকল বেদ ভগবানকে প্রতিপাদন করে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্ব প্রমাণ করে। অতএব অপ্রাকৃত সর্ব্বগুণপ্রযুক্ত এবং প্রাকৃত সর্ব্বগুণরাহিত্য প্রতিপাদনদ্বারা সমস্ত বেদই ভগবানকে নির্দেশ করেন—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারকথা।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির সরণি বাহি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর]

"বৈধী ভক্তি হল শাস্ত্রনির্দেশ এবং প্রবৃত্তির ফলে অনুশীলিত মার্গ।" আর 'রাগানুগা' হল বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, উদ্ধবাদির অনুগামী যে ভক্তি। রাগাত্মিকার অনুগত বলে রাগানুগা। রাগাত্মিকায় ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্যবোধ বা পূজনীয়তাবোধ নেই।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তির ৬৪ প্রকার অঙ্গের উল্লেখ করেছেন তাঁর ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে,—(১) সদ্গুরুর চরণাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ও নিয়মিত

দীক্ষান্ত শিক্ষাগ্রহণ, (৩) গুরুদেবের আদেশ পালন, (৪) গুরুসেবা, (৫) গুরুবর্গের (আচার্য্যবর্গের) পদাঙ্কানুসরণ, (৬) গুরুদেবের নিকট ভগবদ্ভক্তির অগ্রগতির পন্থানুসরণ, (৭) ভগবতুষ্টির জন্য ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুতি, (৮) ধামবাস, (৯) প্রাকৃত জগতের সঙ্গে প্রয়োজনভিত্তিক সম্বন্ধ-স্থাপন, ১০) ব্রতাদি পালন, (১১) তুলসী, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষপূজা, (১২) তিলকধারণ, (১৩) দেহে হরেকৃষ্ণ নাম লিখন, (৪) প্রসাদী 'ফুল ও মাল্যধারণ, (১৫) বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য, (১৬) দণ্ডবন্নতি প্রদর্শন, (১৭) শ্রীমন্দিরে দণ্ডায়মান থাকা, ১৮) শ্রীবিগ্রহ-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ, ।১৯) শ্রীমন্দির গমন ও বিগ্রহ-দর্শন, (২০) শ্রীমন্দির পরিক্রমা, (২১। শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন, ,২২) পরিচর্য্যা, (২৩। ভগবানের যশঃকীর্ত্তন করা, (২৪) সংকীর্ত্তন, (২৫) জপ, ২৬। বিজ্ঞপ্তি, (২৭। স্তবপাঠ, ।২৮) প্রসাদ-আস্বাদন, (২৯। পাদোদক আস্বাদন, (৩০) নিবেদিত ধূপ ও মাল্যাদির আঘ্রাণ গ্রহণ, (৩১) শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, ।৩২) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, (৩৩) আরতি, (৩৪। সাত্বত গ্রন্থ-শ্রবণ, ৩৫ প্রার্থনা, (৩৬) স্মরণ, (৩৭) ধ্যান, (৩৮ দাস্য-ভাব-সেবা, (৩৯। সখ্য-ভাব পোষণ, ।৪০) আত্মনিবেদন, (৪১) প্রিয়োপকরণ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন, (৪২। অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, (৪৩) শরণাগতি, (৪৪) তুলসীসেবা, ৪৫) ভক্তসেবা, (৪৬ মহোৎসব অনুষ্ঠান, (৪৭) দামোদর-ব্রত পালন, ।৪৮। জন্মাষ্টমী পালন ও উদ্‌যাপন, ৪৯) শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন, ।৫০। ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন, (৫১) উচ্চকোটির সাধুর সঙ্গ গ্রহণ, ।৫২। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ, ।৫৩ শাস্ত্রার্থে বিতণ্ডাবর্জ্জন, ।৫৪। অন্যদেবতায় অনবজ্ঞা, (৫৫) প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া, ।৫৬) সেবাপরাধ পরিহার, (৫৭। নামাপরাধ বর্জ্জন, ।৫৮। তুলসী সেবন, ।৫৯) নিষ্কপট ব্যবহার, ৬০) লাভ ও ক্ষতিতে সমভাবসম্পন্ন, (৬১) ভগবানের ও ভক্তের নিন্দা পরিহার, (৬২) ভগবানকে স্বাগত জানাতে দণ্ডায়মান হওয়া, ।৬৩) সর্ব্বভূতে প্রীতি (অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং) ও (৬৪) সর্ব্বমঙ্গল চিন্তন।

মহাপ্রভু এই চৌষট্টি প্রকার ভক্তির মধ্যে পাচটীকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন ;—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

এই পাঁচের মধ্যে আবার একটীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, এবং তা হল—নাম-সংকীর্ত্তন।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
"কৃষ্ণপ্রেম" কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

এই প্রেমধন লাভই ভক্তের চরমতম কাঙ্ক্ষিতবস্তু। অথচ তা' লাভ করতে প্রয়োজন কেবল নিরপরাধে নাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা অবদানই হল এই। ভক্তির সরণি বাহি সেই দুর্ল্লভ প্রেমধন মানুষের জীবননদীর পারে এসে ঠেকে। ভক্তির এবম্বিধ গুণরাজির জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর মর্ত্ত্যলীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছেন, ভক্তির মহিমা-দ্যোতক শাশ্বত গাথা রচনা করে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণভজনে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব জীবনাচরণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ভক্তের জন্য ভক্তির সরণি রচনা করে গেছেন। ভক্তির সরণি বাহি ভক্ত যাতে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভপূর্ব্বক তাঁর সেবা-সৌকর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করে জীবন ধন্যাতিধন্য করে, তিনি তা অভ্রান্তভাবে লোকলোচনের গোচরীভূত করে গেছেন।

ভক্তি কথাটির অর্থই হচ্ছে ভগবানের সেবা। সব রকমের সেবাতেই এমন একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য্য থাকে যা মানুষকে সেই সেবায় অনুপ্রাণিত করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু মানুষকে সেই সেবায় উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। ভক্তির সরণি বাহি মানুষ ঈশ্বরসেবারূপ সম্পদলাভে কৃতকৃতার্থ হচ্ছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সহচরগণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়ে প্রমাণ করেছেন এই মহাসত্য।

শাস্ত্রবিচারপরায়ণ শান্তিপুরনিধি অদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্রের জ্ঞানমূলা ব্যাখ্যা করে জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তে তাঁর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হল—তিনি ভক্তিরসসিঞ্চিত হলেন। তাঁর যাবতীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা ভক্তিরস-পরিস্রুত হয়ে বিতরিত হতে লাগল। শাস্ত্রজ্ঞ অদ্বৈতাচার্য্যের রূপান্তর ঘটল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বে অভিষিক্ত হলেন অদ্বৈতাচার্য্য। জ্ঞানী অদ্বৈতকে ভক্তির সরণিতে নামিয়ে প্রেম-নৃত্য-গীতের জয়যাত্রা সূচনা করলেন।

বারাণসীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যমণি, বিতর্কিতব্যক্তিত্ব বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শাস্ত্র-বিতর্কে পরাভূত হয়ে ভক্তি-সুধারসে নিষ্ণাত হলেন।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, প্রতাপরুদ্রের সভাকবিদের মধ্যমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌম অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ছিলেন। তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপস্থিতিতে সপ্তাহকালব্যাপী নিরন্তর বেদান্তব্যাখ্যার পর অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হলেন। ভক্তির গোমুখী ধারাস্নানে সার্ব্বভৌম পরিষিক্ত হলেন।

বাংলার নবাব হোসেন শাহের সাম্রাজ্যের দুই স্তম্ভ সাকর মল্লিক ও দাবীর

খাস—সাম্রাজ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য দুই অদ্বিতীয় শক্তিপ্রতিভূ। এল তাঁদের কর্ণে হৃৎকর্ণ-রসায়ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র নাম—ভক্তির সরণি বাহি তাঁরাও একে একে অগ্রসর হলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদপুষ্ট হয়ে রূপান্তরিত হলেন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদে। ষড়্‌গোস্বামীর অগ্রগণ্য দুই অনিন্দ্যসুন্দর ব্যক্তিত্ব। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ রচনা করলেন 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মত কালজয়ী গ্রন্থ আর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ উপহার দিলেন গৌড়ীয়ের জীবনচর্চ্চা ও জীবন-চর্য্যার অমৃত-মঞ্জুষা 'হরিভক্তিবিলাস'।

স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গের কুলিশকঠোর নির্দ্দেশ এল সুবুদ্ধি রায়ের নিকট। মুসলমানের করোয়ার পানী গ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্তের মৃত্যুর পরোয়ানা। করুণাঘন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সুবুদ্ধি রায় পেলেন অমৃতলোকের সন্ধান। পাথেয় তাঁর অকপটে কৃষ্ণনাম। ভক্তির সরণি বাহি সেদিনের তাঁর সেই জয়যাত্রা আজও মর্ত্ত্যলোকবাসীর নিকট অমর্ত্ত্যলোকের যাত্রাপথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ হয়ে আছে।

নদীয়ার কালান্তক অমঙ্গল-প্রতিমূর্ত্তি জগাই-মাধাই। ভক্তির ত্রিসীমানায় তাদের চরণরেখা সমাপতিত হয়নি কোনদিন। দুই পাষণ্ড নরাধমের ভক্তির সরণিতে উপনীত হবার নান্দী রচনা করলেন আপন তনু-বিগলিত রক্তরেখায় অবধূত নিত্যানন্দ। মহাপ্রভুর করস্পর্শে নরাধম নরোত্তমে পরিণত হল। ভক্তির প্রস্রবণ উন্মোচিত হল। যাঁর নামে নবদ্বীপ পরিপ্লাবিত হল ভক্তিপ্লাবনে—দুই ভাই তাতে অবগাহন করে তৃপ্ত হলেন, জন্ম-জন্মান্তরের দেবঋণ পরিশোধে বিগলিত-হৃদয় পুলক-শিহরিত হতে লাগলেন। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহমানব সোনার মানুষে রূপান্তরিত হলেন। ভক্তির সরণি বাহি তাঁদের জীবনযাত্রা নতুন করে সুরু হল।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌড়ীয় জগতের পুণ্ডরীকই বটে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের মান বাড়াতে তাঁকেই ডেকেছেন "বাপ পুণ্ডরীক" বলে। দুগ্ধফেননিভ বিশ্রম্ভাসন, সঙ্গে ভোগের নানা উপকরণ চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র সম্বিৎহারা হয়ে অঝোরে কেঁদেছেন। ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে উদ্‌ভ্রান্তের মত 'কই কৃষ্ণ', 'কোথা কৃষ্ণ' বলে উতরোল হয়েছেন। দুস্তর ব্যবধানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে সস্নেহ আহ্বান জানিয়েছেন, আর পুণ্ডরীক ভক্তির সরণি বাহি ছুটে চলেছেন বাঞ্ছিতের সান্নিধ্যে। পুণ্ডরীকের মত ভক্তির সরণি বাহি ছুটে চলেছেন কৃষ্ণান্বেষণে লক্ষ কোটি মানুষ। ভক্ত ছুটে চলেছেন ভক্ত্যাধীনের কাছে—

"জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছে যারে—
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।
সর্ব্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোমহুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

একদিকে আহ্বান, অন্যদিকে সাড়া। একদিকে হাতছানি, অন্যদিকে কাতর আর্ত্তি। একদিকে অপরূপ নয়ন-বিমোহন, অন্যদিকে ভক্তিবিলোচনে নির্নিমিখ অবলোকন। একদিকে অন্তর্দ্ধান, অন্যদিকে অন্বেষণ।

ভক্তির সরণি বাহি যা অপ্রতিহত গতিতে চলেছে, যুগ হতে যুগান্তরে, কাল হতে কালান্তরে। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাময়িকভাবে জ্ঞানপর ব্যাখ্যাকারী শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তির এই ভজনপথে এনে ভক্তির যে জয়যাত্রা ঘোষণা করেছিলেন, ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ভক্তির এই স্রোতকে তিনি অনর্গল করলেন সবার জন্য। চিরাচরিত সাধনার পথ ছেড়ে ভক্তির অনন্যত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেলেন সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বমানবের জন্য।

—**শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস**, আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

৯৪তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথি-বাসরে দীনের

আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় জয় প্রভুবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
জয় বিশ্বগুরুবর বৈষ্ণব-প্রধান॥
প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ তুমি গুরুগত-প্রাণ।
নিখিল ভুবনে তুমি মহামহীয়ান্॥
শ্রীবিনোদ-সরস্বতী-ধারা সংরক্ষক।
জয় ভক্তিদাতা জয় জীব-উদ্ধারক॥
তোমার উদয়-তিথি আজি সমাগত।
ভক্তগণে তব গুণ গাহে অবিরত॥
আমি অতি মূঢ়মতি অপরাধীজন।
সাধন-ভজন বিনা ব্যর্থ এ জীবন॥
হরিনাম দানি' মোরে কৈলে আকর্ষণ।
বুঝিতে নারিনু তবু তব কৃপা-কণ॥
বহু মাস, বহু বর্ষ হয়েছে অতীত।
তবু নামে অনুরাগ হয়নি বর্দ্ধিত॥
কি করেছি এতদিন? ভাবি মনে মনে।
তৎপর হৈনু এবে আত্মবিশ্লেষণে॥
আদেশ পালনে কি করেছি যতন?
প্রতিদিন সংখ্যা-নাম হয় কি পূরণ??
বৈষ্ণব-পাশ শাস্ত্র কি করেছি শ্রবণ?
সাধুসঙ্গে শ্রীনাম কি করেছি কীর্ত্তন??
ভক্তগণে যথোচিত করিনি সম্মান।
ত্যজিতে পারিনি কভু বিষয়াভিমান॥
অনর্থ নাশের তরে করিনি যতন।
আজিও পারিনি নিতে ষড়ঙ্গ শরণ॥

কুসঙ্গে পড়িয়া মুই ভুলেছি ভজন।
আমা সম অপরাধী নাহি কোন জন ॥
ভজনে উন্নতি মোর হবে কবে আর !
তোমার করুণা মাত্র ভরসা আমার ॥
তব গুণ-কথা এবে করিছি কীর্ত্তন।
কৃপা করি' মোর চিত্ত করহ শোধন ॥
গৌড়ীয় গগনে তুমি দীপ্ত দিবাকর।
শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট পূরণে তৎপর ॥
তব জ্ঞানালোকে পৃথ্বী হয় আলোকিত।
তোমার সুযশ গাহে জ্ঞানী-গুণী যত ॥
উত্তুঙ্গ খ্যাতির মোহ ছিল না তোমার।
তবু খ্যাতি তব পিছে ধায় অনিবার ॥
বচন-ভঙ্গিমা তব অতি সুমধুর।
শুনিলে তা' প্রাণে জাগে আনন্দ প্রচুর ॥
'চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে'র ধর্ম্ম-সভাতে।
'মঠাদির আবশ্যকতা' বিচার করিতে ॥
হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি-সাথে।
বহু জ্ঞানী-গুণীজন ছিলা সে সভাতে ॥
বক্তৃতার পালা যবে আসিল তোমার।
সূচনায় জানাইলে বক্তৃতার সার ॥
মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা বুঝে।
প্রধান বিচারপতি এসেছেন নিজে ॥
মঠ-মন্দিরের যে আছে প্রয়োজন।
ইহাই তাহার হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ ॥
তোমার শ্রীমুখে হেন বাণীর স্ফুরণে।
মহানন্দে করতালি দেয় সর্ব্বজনে ॥
মঠ-মন্দির সম্পর্কে দানিলে ভাষণ।
তোমার বৈশিষ্ট্য হেরি' মুগ্ধ বিজ্ঞজন ॥

সর্ব্বগুণে বিভূষিত তোমার চরিত।
মহান্ আদর্শ তব সবার বিদিত॥
সাধন-সম্পদ-সার তোমার চরণ।
তোমার কৃপাতে টুটে এ ভব-বন্ধন॥
তুমি মোর প্রভু, আমি তোমার কিঙ্কর।
তব সেবা-কার্য্যে মোরে রাখ নিরন্তর॥
প্রণমি' তোমার পদে লইনু শরণ।
অন্তকালে পাই যেন তব দরশন॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
ইং ২১।২।১৯৯২
৩ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৫০৫

ভবদীয় শ্রীচরণের সেবাভিলাষী —
—**শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী**
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর]

ভগবানকে কিভাবে বশীভূত করা যায়?—শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা। 'কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।' "ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।' 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'—গীতা, ভাগবতে ভগবান্ এসব কথাগুলো বলেছেন। ভক্তিই আমাকে বশীভূত করতে পারে, অন্য কিছু পারে না।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত যারা, তারা যে বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছেন, সে ব্যবস্থা পালন করলে তদ্দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে। আরও কিছুদূর যাওয়া যেতে পারে। কতদূর?—মহঃ, জন, তপঃ, সত্যলোক পর্য্যন্ত। তারপরে আর নয়। যেখানে এই যৎসামান্য ব্যবস্থা তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকতে বলছেন ভগবান্। বেশী বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছেন। কিন্তু এইক্ষেত্রে কথাটা উল্টে গেছে। 'ভূমৈব সুখম্', 'নাল্পে সুখমস্তি'—এইক্ষেত্রে তত্ত্বদর্শনটা উল্টেছে। অল্পে সন্তুষ্ট হয়ো না। সাধন-ভজনের ক্ষেত্র এটা, অর্থাৎ তোমার সাধন-ভজনের চরম যে অবস্থা, চরম যে উন্নতি, সেটা তোমাকে দেখতে হবে এবং তোমার শেষ চিন্তাটা থাকবে সেই পর্য্যন্ত।

কোন বাচ্চা যদি বলে, আমি এম, এ, পাশ করব, ইচ্ছা যদি তার থাকে

তাহলে সে কোনদিন বি, এ, পাশ করতে পারে। কিন্তু; যদি তার প্রথম থেকেই সুদৃঢ় ইচ্ছা বা সঙ্কল্প না থাকে তাহলে পাশ করার ক্ষমতা নাই তার। ঠিক শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলেও এসব বিষয় আমাদের আলোচনা রাখতে হবে।

শাস্ত্র মানে শাসনবাণী। কার শাসনবাণী ?—সর্ব্বসমর্থ ভগবানের শাসন-বাণী। তিনি সব বিধি-ব্যবস্থাগুলো দিয়েছেন, যাতে আমাদের কল্যাণ হয়। সময় ত' খুব কম আমাদের। যখন কেউ কিছু আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন, তখন সবাই বলছেন—সময় নাই, সময় নাই আমাদের। আমার সময় আছে একথা কেউ বলছি না আমরা। সময় হাতে থাকলেও বলছি না, যার প্রচুর সময় আছে, তিনিও বলছেন না। আর সত্যই যার হাতে সময় কম, সংসারের সেবাকাজ করে, বিভিন্ন কাজ করে যার সময় কম আছে, দুজনে একই কথা বলছেন। ব্যাপারটা কি ? সময় যদি সত্যই কম তাহলে সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের। শাস্ত্রে সেই ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

সত্যযুগের লোক তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করতেন। হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করার সময় ছিল তখন। ত্রেতাযুগের লোকের কিছু পরমায়ু কমল। তাঁরা যাগ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন। দ্বাপর যুগের লোকের পরমায়ু আরও কিছু কমল। তাঁরা বিশেষ পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতেন। কলিজীব আমরা। কলিযুগে আমাদের পরমায়ু খুব কম—'আয়ুঃ বর্ষশতম্'। মাত্র শতবর্ষ পরমায়ু আমাদের। কিন্তু ১০০ বৎসর খুব কম লোক আমরা বাঁচি। সেকারণে ব্যবস্থাটা একটু সংক্ষিপ্ত দেওয়া হয়েছে। 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'। ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করবেন—কথাটা আছে। কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তন মুখে বললে ত' হচ্ছে না। বলতে সহজ, কিন্তু করতে গিয়ে ত' অনেক মুস্কিল্। হরিনাম করতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। বাধা-বিপত্তির নাম অপরাধ। আমি নাম করতে যাচ্ছি নামাপরাধ, ধাম দর্শন করতে যাচ্ছি ধামাপরাধ, সেবা করতে যাচ্ছি সেবাপরাধ হচ্ছে। যদি সব জায়গায় অপরাধের ব্যাপার, তাহলে আমি কি করে অগ্রসর হব ? ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সেগুলো মেনে চলতে হবে আমাকে, তবে ফলটা আমার লাভ হবে। জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করি, আর একাদশী-তিথি, রাম-নবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী পালন করি, সবটার ভিতরে একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মানুযায়ী আমাকে চলতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী কথাটার ভিতরে কিছু বিচার দেখতে পাই আমরা। সাধারণ

মানুষের ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু কথাটা এসেছে। কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ, মনুষ্য বিশেষের ক্ষেত্রে জন্ম এবং মৃত্যু এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়। দেহী আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করছেন, তখন বলা হয় জন্ম। প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য মনুষ্যের ক্ষেত্রে এই জন্ম-মৃত্যুর কথা এসেছে। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আবির্ভাব। তাহলে এখানে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী—কৃষ্ণের ক্ষেত্রে কেন জন্ম-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? এ প্রশ্ন হতে পারে অনেকের। শাস্ত্র এর খুব সুন্দর মীমাংসা দিয়েছেন। আবির্ভাব-শব্দের মধ্যে কিছু ঐশ্বর্য্যপর ভাব আছে। কিন্তু জন্ম-শব্দ ব্যবহার হয়েছে এখানে, এখানে ঐশ্বর্য্যের ব্যাপার নাই। মাধুর্য্যমণ্ডিত রসময় বিগ্রহ ভগবান্, তাঁরই জন্ম। বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহের আধার যে ভগবান্, তাঁর জন্ম। তত্ত্বদর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা আছে। এখানে জন্ম-শব্দটা আপনারা প্রাকৃত কিছু মনে করবেন না। ভগবানের কোন কিছু প্রাকৃত নয়। গীতার মধ্যে তিনিই বলেছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন! আমার যে জন্ম, এটা দিব্য, অলৌকিক, অপ্রাকৃত; সাধারণ মানুষের মত নয়। কর্ম্ম, কর্ম্মফল ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ভগবান্ কর্ম্মফল-বাধ্য নহেন; তার অতীত—একথা বলা আছে। যাঁরা এই তত্ত্ব জেনেছেন, তাঁরা তত্ত্বজ্ঞ। তাঁদের কখনও এই প্রাকৃত জগতে এসে কর্ম্মফল ভোগ করতে হয় না, তাঁদের বার বার করে এ সংসারে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এখানেই ত' ভগবান্ স্বয়ং খণ্ডন করেছেন যুক্তিটা।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

ভগবান্ অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত। প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু তাঁর নাই। 'অজ'-শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্জ্জুনকে বুঝাচ্ছেন কি?—আমি অজ, তথাপি 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—অব্যয়াত্মা আমি নিখিল প্রাণীজগতের সর্ব্বোপরি মালিক। আমি ভক্তের বাঞ্ছাপূরণের জন্য এ সংসারে আসি প্রয়োজন হলে। কিন্তু আমার সেই জন্মটা কর্ম্মফল ভোগের জন্য নয়, জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য। আমি কিভাবে আসি?—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়'। এই যে প্রকৃতি বলছেন, এই প্রকৃতি কি জড়াপ্রকৃতি, না ভগবানের নিজস্ব প্রকৃতি? 'স্বরূপঞ্চ স্বভাবঞ্চ' তাকে বলে প্রকৃতি। অমরকোষের মধ্যে রয়েছে শব্দ দুটো। ভগবানের স্বরূপের নাম হল প্রকৃতি অর্থাৎ যোগমায়া। যোগমায়া আর মহামায়াকে এক মনে করবেন না।

একেবারে **Diamatrically opposite** দুটো। মহামায়া এই জড় জগতের কারা-রক্ষয়িত্রী। আর ভগবানের নিজস্ব যে শক্তি, যে শক্তি নিয়ে ভগবান্ লীলাবিলাস করেন, তাঁর নাম হল যোগমায়া। এটা ধার করা কিছু নয়। এটা তাঁর নিজস্ব শক্তি। সেখানে বলছেন,—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" অর্জ্জুন, আমি যে এ জগতে আসি, এটা কোন প্রাকৃত ব্যাপার নয়। জীবের কল্যাণের জন্য আমি আসি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। আমি কারও কোন ধার করা জিনিষ নিয়ে আসি না, সবই নিজস্ব জিনিস নিয়েই আসি। তফাৎটা বুঝাচ্ছেন। নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মগণ তাঁরাও কর্ম্ম, কর্ম্মফল ভোগ করেন না। কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করেন বা শুভ লগ্ন ও মুহূর্ত্তের অপেক্ষা রাখেন—এইরূপ আচরণ দেখান।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুইটী সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ। শুক্লমার্গদ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গ গতিদ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণমার্গে যদি দেহান্ত হয়, তাহলে সদ্‌গতি হয় না। ভীষ্মদেবের এটা জানা ছিল। তাই তিনি উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন উত্তরায়ণ এল, তখন তিনি দেহত্যাগ করছেন। ইচ্ছামৃত্যু বরণকারী এরূপ বহু ব্যক্তি বসে আছেন আজও সংসারে। ভগবানের নির্দ্দেশেই তাঁরা আসছেন এবং ভগবানের নির্দ্দেশেই তাঁরা যাচ্ছেন। জগতের সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁদের কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ নাই। সংসারে আমরা সবাইকে প্রায় একরকম দৃষ্টিতে দেখতে চাই, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ত' রয়েছে, তা আমাদের নজরে পড়ে না। শাস্ত্র সেইগুলো উদাহরণ দিয়েছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ এক একজন নন। বহু ধ্রুব, প্রহ্লাদ বসে আছেন। উদাহরণস্থলে এক একজনকে লওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে উদাহরণের অভাব নাই। একটা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন। আমাদের এই রকম হতে হবে।

জন্মাষ্টমী-শব্দের আরও কিছু অর্থ দেখাচ্ছেন। সেটা কিরকম?—ঐশ্বর্য্যপর বিচার, আর মাধুর্য্যপর বিচার। "যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দেবকী উদরে। মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥" কার্য্যক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বহু জায়গায় লেখা আছে। বাসুদেব কৃষ্ণ, নন্দনন্দন কৃষ্ণ, যশোদানন্দন কৃষ্ণও কোন কোন জায়গায় লেখা আছে। ব্যাপারটা কি? বহু ব্যক্তির ধারণা—নন্দনন্দন বা যশোদানন্দন ধার করা ছেলে। পালন-পোষণ করেছেন, সেইজন্য

ওরকম নামকরণ হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। এটা বিশেষ আলোচনা, বুঝে রাখতে হবে। কি বিশেষ আলোচনা? ভগবান্ কৃষ্ণ যে এসেছেন, ইনি হলেন নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র। ধার করা, পালন-পোষণ করা ছেলে নয়। তবে বসুদেবের ঘরে এলেন কেন? দেবকীদেবীর কুক্ষিগত কেন হলেন? প্রমাণ আছে, তিনি দেবকীদেবীর কুক্ষিগত হয়েছেন। ভগবান্ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন, দেবতাগণ এসে স্তব-স্তুতি করছেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

তাহলে এটা সত্য ঘটনা। কংসের কারাগার আলোকিত করে রাত্র দ্বিপ্রহরে অষ্টমী-তিথিতে ভগবান্ বাসুদেব-মূর্ত্তিতে—চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন—ইতিহাস বলছেন। চার হাত বের করে আসায় বসুদেব-দেবকীর খুব আপত্তি—'তুমি এই রূপ সম্বরণ কর।' কংস জানতে পারলে এখনই এসে মুস্কিল করবে। চার হাত বের করে কেন এসেছেন, ভগবান্ সে উত্তর দিয়েছেন। আমি যদি এই চার হাত বের করে না আসতাম, তাহলে তোমরা আমাকে সাধারণ কর্ম্ম-কর্ম্মফল-বাধ্য শিশু বলে মনে করতে পারতে। সেজন্য আমি দেখালাম আমি নারায়ণ ভগবান্ এসেছি তোমাদের পুত্ররূপে, যা কথা ছিল। তারপর 'বভূব প্রাকৃত শিশুঃ'—সাধারণ শিশুর ন্যায় দেবকীদেবীর কোলে বসে গেলেন।

কিন্তু আমরা আরও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করে দেখতে পাচ্ছি, পাশাপাশি একই সময়ে দুই জায়গায় কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এক জায়গায় বাসুদেব-কৃষ্ণ, আর এক জায়গায় যশোদানন্দন কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। একই সময়ে দুইস্থানে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, এই জিনিসটা আপনারা জানেন কিনা জানি না, তবে শাস্ত্রে আছে ওটা।

গর্ভকাল আগে শুনতাম ১০ মাস ১০ দিন, এখন শুনছি ৯ মাস ১০ দিন। কিন্তু এখানে ৮ মাসে উভয়স্থানে সন্তান হয়েছে। প্রমাণ আছে শাস্ত্রে—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

অষ্টমী-তিথিতে একদিকে মথুরায় কংস-কারাগারে, অন্যদিকে নন্দালয়ে—দুই জায়গায় একই সময়ে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। অসম্পূর্ণ গর্ভকাল মানে আট মাস, 'তে স্ত্রিয়ৌ' মানে দুইজন স্ত্রীলোক—দেবকী এবং যশোদা। যদিও কোন কোন জায়গায় লেখা আছে, মা যশোদার দুটো নাম ছিল, এটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। কোন জায়গায় যশোদানন্দনকে বলা হচ্ছে দেবকীসুত। সেখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—মা যশোদারও দুটো নাম ছিল—যশোদা ও দেবকী। যদিও দেবকী নামে বসুদেবের পৃথক্ স্ত্রী ছিলেন একজন। ভগবানের ঐশী লীলা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না, মাথায় ঢুকবে না। (**ক্রমশঃ**)

শ্রীচৈতন্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—নাস্তিকতা ও অপরাধ (৩)

(২০) লেখক পুস্তকের সর্ব্বশেষ ৩২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"এই হলো চৈতন্যের মৃত্যু ও মৃতুজনিত প্রচ্ছন্নতার আদিপর্ব।" লেখক 'চৈতন্যের মৃত্যু'—এই কথাটি উল্লেখ করায় প্রশ্ন জাগে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জীববং জন্মগ্রহণই নাই, অতএব তাঁহার মৃত্যু হইবে কি-প্রকারে? শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হওয়ায় অপ্রকটকালেও তাঁহার অপ্রাকৃত তনু ধারণ বর্ত্তমানই থাকে। কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের জন্ম আছে, সুতরাং মৃত্যুও আছে। যাহার সৃষ্টি আছে তাহারই বিনাশ হয়। যাহার সৃষ্টি নাই, তাহার কি বিনাশ হইতে পারে? সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, তাই বলিয়া সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে জন্ম ও পশ্চিমদিকে মৃত্যু হয়—একথা কেহ বলে না। তেমনই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুও ঘটে না। যাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার মৃত্যুজনিত প্রচ্ছন্নতাও থাকিতে পারে না। তবে তিনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্ন লীলা করিয়া প্রকটলীলা সম্বরন করিলেন অর্থাৎ লোক-লোচনের অন্তরালে গমন করিলেন। লেখক নিবেদনের শেষে লিখিয়াছেন,—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ইহাতে চৈতন্যদেবের লীলার নিত্যত্ব লেখক স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে লেখক তাঁহার পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় 'চৈতন্যের মৃত্যু'—এই কথা লেখায় চৈতন্যের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁহার লীলাও শেষ হইয়া যায়—ইহাই বুঝাইতেছে। সুতরাং লেখক 'নিবেদনে' চৈতন্যের লীলা নিত্য বা সদা বর্ত্তমান স্বীকার করিয়াও পুস্তকের শেষে 'চৈতন্যের মৃত্যু'—এই কথা লিখিয়া চৈতন্যের নিত্যত্ব অস্বীকার করিতেছেন কিনা এবং 'নিবেদনের' উক্ত মন্তব্য ও পুস্তকের শেষের উক্ত মন্তব্য পরস্পরবিরুদ্ধ কিনা তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

লেখক পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"প্রভু কি সত্যিই কলঙ্কিত?
তারই সত্যাসত্য সন্ধানে—
"শ্রীচৈতন্যঃ অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ।"

লেখক শ্রীচৈতন্যদেবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করত চৈতন্য-ভক্তের মুখোস পরিধান করিয়া বাহ্য অভিনয় দেখাইয়াছেন। লেখক ২০ পৃষ্ঠায় উক্ত মন্তব্য

লিখিবার পূর্ব্বের পৃষ্ঠাতেই শ্রীচৈতন্যদেবের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। সমগ্র পুস্তকটির ভাব, ভাষা, চিন্তাধারা প্রভৃতি আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নিন্দা করিবার জন্যই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত-গণের অন্তরে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটি লিখিত হইয়াছে। বেদ-নিন্দক ও নাস্তিক চার্ব্বাককে বহুমানন করিয়া তাঁহার উক্তি এই পুস্তকে দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'— এই প্রামাণিক গ্রন্থদ্বয় লেখক মহাশয় পাঠ করিয়াও তন্মধ্যে পরমসত্য কথা বিস্মৃত হইয়া চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিক ব্যক্তি-গণের লেখনীতে আস্থা স্থাপন করিয়া এবং কুবর্ত্মবৎ কল্পিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামে অবৈধ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া পুস্তকটি লিখিয়া কলির চেলাদের নিকট 'বাহবা' কুড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করিলে আরও বহু অযৌক্তিক ও অসামঞ্জস্য ক্রটী-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে তদালোচনায় বিরত থাকিলাম।

যিনি শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি নিজ যোগ্যতা অনুসারে শাস্ত্রার্থ বোধগম্য করিতে পারেন ও তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীর কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ;—"স্বাতি-নক্ষত্রের জল যখন সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, তখন তাহাতে বহুমূল্য মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই মুক্তা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের গলদেশে মালিকা-স্বরূপে এবং রাজন্যবর্গের রাজমুকুটোপরি বর্ত্তমান থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করে। আর সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলই যখন সর্পের উপরে পতিত হয়, তখন তাহাতে সর্পের বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; সেই বিষধর সর্প হইতে সকলে ভীত এবং সর্পের দংশনে জীবন সংশয়াপন্ন হয়। গঙ্গাতীরে নিম্ব, কপিত্থ, আম্র ও কদলী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাদপরাজি সকলেই এক গঙ্গার জল পান করিলেও ফল প্রদান-কালে নিম্ব ও কপিত্থ তিক্ত এবং কষায় ফল প্রদান করে, আর আম্র ও কদলী সুমধুর ফলই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গ্রহণকারীর যোগ্যতানুসারে এবং একই বস্তুর সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহারফলে সৎ ও অসৎ ফল লাভ ঘটে।"

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচন বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়া একই মন্ত্রের তাৎপর্য্য দুইজনে ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝিয়াছিলেন। যাহার ফলে ইন্দ্র দৈবসিদ্ধান্ত ও বিরোচন আসুরিক মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কাজেই বিভিন্ন পাঠকের বিভিন্ন যোগ্যতা থাকায় একই বস্তুর বিভিন্নভাবে ধারণার পার্থক্য হয়।

এক্ষণে লেখক শাস্ত্র পাঠ করিয়াও শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গেলে বৈষ্ণব-সন্নিধানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১-১৩২)

শাস্ত্রের উক্ত হিতোপদেশগুলি অযথা প্রযুক্ত হয় নাই। আমাদের বাস্তব কল্যাণের নিমিত্তই উহা লিখিত হইয়াছে। লেখকের মস্তিষ্কে শ্রীচৈতন্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধির চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ভগবান্ চৈতন্যদেবকে তাঁহারই ন্যায় জীববিশেষ মনে করিয়াছেন। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই বাণী অনুসারে লেখক নিজের মত শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা নিত্য-সত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। তাহা চিন্ময় জীবের চিন্ময় ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। লেখক পরমার্থজ্ঞ হইলে তবে ত' অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা বুঝিতে পারিবেন? লেখক চৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধত্ব বুঝিতে না পারিয়া চৈতন্যদেবকে দেশ-কালের অধীন তত্ত্ব ভাবিয়া অযথা চৈতন্যদেবের অমর্য্যাদা করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মর্য্যাদাহানি শ্রীচৈতন্য-কিঙ্করগণ কেহই অনুমোদন করিবেন না। পুস্তকটিতে লেখক শ্রীচৈতন্য-দেবের নিন্দা করিয়া যে ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য-গৌরব নাস্তিকগণের নিকট প্রশংসিত হইতে পারে, কিন্তু সুবুদ্ধিবিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট ধিকৃত হইবে—সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের প্রচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত, নতুবা দেশ নাস্তিকতায় কলুষিত হইবে এবং গৌড়ীয়োপাস্য প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রতি লোকে বিকৃত ধারণা পোষণ করিয়া বিপথগামী হইবে। ইহা পাঠ করিলে ভগবচ্চরণে মহা অপরাধী হইয়া নরকগামী হইতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান! এই পুস্তকটির পঠন-পাঠন অবিলম্বে বর্জ্জন করুন।

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

নবনির্ম্মিত ভজন-কুটীরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান বর্ষে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য তথা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের একটী নূতন ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হয়। উক্ত ভজন

কুটীরটী তুই কক্ষ-বিশিষ্ট। একটী ভজন-কুটীর এবং অপরটী তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার।

গত ২২শে ফাল্গুন ১৩৯৮, ইং ৬ মার্চ্চ ১৯৯২, শুক্রবার গৌর-দ্বিতীয়া-তিথিতে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সঙ্কীর্ত্তন পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত ভজন-কুটীরে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। স্বয়ং সহ-সভাপতি মহারাজ ও যুগ্ম-সম্পাদক মহারাজ সভাপতি-আচার্য্যের আরতি করেন। তৎপরে উপস্থিত মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন-কুটীরে পদার্পণের তুইদিন পরে ২৫শে ফাল্গুন সোমবার সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ উক্ত ভজন-কুটীরের অপর কক্ষে (গ্রন্থাগার) প্রবেশ করেন। এতত্নপলক্ষে দিবসদ্বয়ে বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বলাবাহুল্য, এই ভজন-কুটীর নির্ম্মাণে যাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা, সেই বিশ্রম্ভ সেবক শ্রীকমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবাপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ও বৈষ্ণবগণের বিশেষ কৃপাভাজন হন। এই ভজন-কুটীরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহাদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক—শ্রীভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

—**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"

শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ, শ্রীগদাধরাভিন্নতনু শ্রীগৌরনিজজন জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম-পরিক্রমার বাণীকে সার্থক করিতে জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বদ্ধপরিকর। শ্রীসমিতির পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত লীলাক্ষেত্রসমূহ দর্শনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামের নয়টী দ্বীপ পদব্রজে পরিক্রমা করেন।

এতত্নপলক্ষে পূর্ব্ব-প্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রায় পঞ্চ-সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে লইয়া গত ২৮শে ফাল্গুন ১৩৯৮,

ইং ১২।৩।৯২ বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। অনন্তর পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার মহিমা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন।

২৯শে ফাল্গুন, ইং ১৩।৩।৯২, শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে যখন শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের মঙ্গলধ্বনিতে এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত তখন সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা বিজয়-বিগ্রহ সমারূঢ় হন। শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি ও যাত্রিগণ দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমদ্বীপান্তর্গত নৃসিংহপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শনমানসে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধিস্থল স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে তাঁহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করত সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হন। তথায় পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ তাঁহার সুদীপ্ত কণ্ঠে শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বর্ণন করেন। তদনন্তর যাত্রিগণকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

অতঃপর শ্রীমধ্যদ্বীপান্তর্গত মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা ও হংসবাহন হইয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩০শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ২রা চৈত্র সোমবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য), শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য), শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—মামগাছি, শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য) ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থানসমূহ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। বহুদিন গঙ্গাপার হইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ গঙ্গা পারাপারের সুবন্দোবস্ত করায় যাত্রিগণ পরমোল্লাসে গঙ্গাপার হইয়া শ্রীরুদ্রদেবকে দর্শন ও পরিক্রমা করেন।

৩রা চৈত্র মঙ্গলবার অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমার দিন সকল যাত্রী তথা সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের নিকট এক মহানন্দের দিন। কারণ ঐদিন কলিযুগপাবনাবতারী রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীযোগপীঠ, বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শনের এক সুবর্ণ সুযোগ। সর্ব্বোপরি সাধুসঙ্গে শ্রীধাম দর্শনের যে অনুভূতি তাহা লাভ।

ভোরে মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে যাত্রীবৃন্দ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হন। তৎপরে একে একে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির, **ISCKON**-এর চন্দ্রোদয়

মন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধর-অঙ্গন, শ্রীবাস-অঙ্গন, চাঁদকাজির সমাধি ও শ্রীগৌর-জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন ও পরিক্রমা করত শ্রীধাম পরিক্রমা সমাপ্ত করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন স্থানে শ্রীধাম-মহিমা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যাত্রিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শারীরিক অসুস্থতাহেতু শুশ্রূষু ভক্তগণ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণে বঞ্চিত হন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবস অর্থাৎ ৪ঠা চৈত্র বুধবার সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। অদ্য শতাধিক শুদ্ধভক্তি-যাজনকারী হরিভজনোৎসুক ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করত তাঁহাদের সাধন-ভজনের পথ প্রশস্ত করেন। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ অভিষেক ও আরতি হয়। আরাত্রিকান্তে যাত্রিগণকে অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

রাত্রে ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও শ্রীসমিতির আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মহাজন পদাবলী ও ব্রজে প্রচলিত পদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। তৎপরে ভি.ডি.ও. যোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা'র ছবি প্রদর্শন করান হয়।

৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সাধারণ-মহোৎসব দিবসে যাত্রীবৃন্দকেও আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রি-সাধারণকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

পরিশেষে, এই উৎসবে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবর্ষণ করুন—ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যা'তে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ২৭ মধুসূদন, কারণোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ | ৩১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৯, ইং ১৪/৫/৯২ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]

১১। যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে,
পদং মনো মে ভগবল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিল-সাধনশ্রমঃ,
শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥ ২০ ॥

হে ভগবন্! হে পরানন্দগুরো! যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার মন আশ্রয় লাভ করিবে, তখন আপনার কৃপাতেই অখিল-সাধন-শ্রম বিদূরিত হইবে এবং পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব ॥ ২০ ॥

১২। ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্ঘনঃ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

(হে নৃসিংহদেব !) ভজনকারিগণের নিকট আপনিই সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্ঘন প্রাণ-স্বরূপ ; অতএব ইহার পর তুচ্ছ কলত্র-পুত্রাদির প্রয়োজন কি ?? ২১ ॥

১৩। **মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গসঙ্গমনীশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্**

সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্।

নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-

স্রোতঃ-সংপ্লব-সংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥ ২২ ॥

হে নরহরে ! পুত্র-কলত্রাদির অঙ্গসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকেই অহর্নিশ চিন্তা করিতে করিতে, বিগতাহঙ্কার সাধুগণ যেই যেই আশ্রম ও তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকেন, সেই সেই স্থানে বাসপূর্ব্বক নিত্য সেইসকল সাধুগণের মুখপদ্ম-বিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃত-স্রোতজলে সম্যক্ স্নাত হইয়া আমি পুনর্জ্জন্মভাক্ হইব না ॥ ২২ ॥

১৪। **উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ**

কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবংপরঃ।

অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা

বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥ ২৩ ॥

পুষ্পমালিকা হইতে উদ্গত সর্প যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ সৎ-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত হইলেও জগৎ সৎ নহে অর্থাৎ অনিত্য। কনকরাশি বিবিধ অলঙ্কাররূপ কার্য্য করিয়াও যেরূপ অবিকৃত, বেদ কিন্তু তদ্রূপ নহে অর্থাৎ গৌণার্থদ্বারা বেদার্থও কল্পিত হয়। পরন্তু, আপনার **শুদ্ধ অদ্বৈত** (অসমোর্দ্ধ্ব) **ভাবই** সত্য, অতএব আনন্দের সহিত রমা-সেবিত আপনার সুন্দর পরমানন্দপ্রদ শ্রীপদযুগল আমি বন্দনা করি। হে হরে ! আমি আপনার চরণে প্রণত, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ২৩ ॥

১৫। **মুকুট-কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী, পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।**

মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা, নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ ॥ ২৪ ॥

কনক অর্থাৎ স্বর্ণ মুকুট কুণ্ডল-বলয়-কিঙ্কিণীরূপে পরিণত হইলেও বস্তুতঃ কনকই বটে, তদ্রূপ মহৎ বা চিত্ত, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি শ্রীনৃসিংহ-বিষ্ণু হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে ॥ ২৪ ॥

১৬। **নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কাল-স্বভাবাদিভি-**

র্ভাবান্ সত্ত্ব-রজোস্তমগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্।

মামাক্রম্য পদা শিরস্তুতিভরং সম্মর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽহস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥ ২৫ ॥

মায়া আপনার ঈক্ষণরূপ অঙ্গনগতা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কাল-স্বভাবাদি-দ্বারা সত্ত্ব-রজোস্তমগুণময় বহু ভাব প্রকাশ করত আতুর বা অসমর্থ আমার মস্তক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণপূর্ব্বক আমাকে সম্মর্দ্দিত করিতেছে ; হে নৃহরে ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আপনার মায়ার প্রভাব নিবারিত করুন ॥ ২৫ ॥

১৭ । **দণ্ড-ন্যাসমিষেণ বঞ্চিত-জনং ভোগৈকচিন্তাতুরং**
সমুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্‌যোগক্লমৈরাকুলম্ ।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতা-সম্মাননা-সম্মদং
দীননাথ-দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥ ২৬ ॥

হে দীন-অনাথ-দয়ানিধান ! হে পরমানন্দময় প্রভো ! আমি দণ্ড ও সন্ন্যাস-গ্রহণচ্ছলে কেবল ভোগচিন্তায় পীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তি, আমি নিরন্তর অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, আমি নিজ-বিরচিত-কর্ম্ম-ক্লেশে আকুল, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ এবং অজ্ঞজনগণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অহঙ্কার-যুক্ত ; আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

১৮ । **অবগমং তব মে দিশ মাধব,**
স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ ।
শ্রবণ-বর্ণন, ভাবমথাপি বা-নহি
ভবামি যথা বিধি-কিঙ্করঃ ॥ ২৭ ॥

হে মাধব ! আপনার স্বরূপের জ্ঞান ও আপনার বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আসক্তি প্রদান করুন, যেন আমার বিষয়জনিত সুখ-দুঃখের সঙ্গম না হয়, যেন আমি কেবল প্রেমশূন্য বিধির কিঙ্কর না হই ॥ ২৭ ॥

১৯ । **দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে**
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎপাদম্ ॥ ২৮ ॥

হে অনন্ত ! দেবগণ আপনার অন্ত জানেন না, **আপনিও আপনার অন্ত জানেন না,** শ্রুতিসার-সকলও আপনার তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ নহেন । অতএব

'আপনাকে নমস্কার', 'আপনার জয় হউক, জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে আপনার সেই দুর্ল্লভ চরণযুগল ভজন করি ॥ ২৮ ॥

২০। সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-নিরাজিত-পদাম্বুজম্।

ভোগ-যোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মি-নম্রয়োঃ ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মী ও ভক্তের পক্ষে যাঁহার পদ-যুগল ভোগ ও যোগপ্রদ এবং যে শ্রীপাদপদ্ম নিখিলশ্রুতি-শিরোরত্নসমূহদ্বারা নিরাজিত, সেই মাধবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলাদির বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল কি ভিন্ন তত্ত্ব ?

"গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥" —শরণাগতি

২। নবদ্বীপ, ব্রজ ও গোলোক এক তত্ত্ব হইয়াও কেন বিচিত্র স্বরূপ হইয়াছেন ?

"নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব ; কেবল প্রেম-বৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।" —ব্রঃ সঃ ৫।৫

৩। গোলোক, ব্রজ ও শ্বেতদ্বীপে কৃষ্ণের যথাক্রমে কি কি লীলা ?

'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটী পরব্যোমের অন্তঃপুর। **গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়লীলা. শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট।** গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৪। নবদ্বীপ ঔদার্য্যধাম কেন ?

"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয় ॥

অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥" —নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ধামের চিন্ময়ত্ব কোন্ সময় দর্শন হয়?

"মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥" —নঃ ভাঃ তঃ ১১

৬। গোদ্রুম অভিন্ন-নন্দীশ্বর কেন?

"**গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর**-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ-বিলাস॥
পূর্ব্বাহ্ণে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই॥" —নঃ ভাঃ তঃ ৪৪

৭। গৌরজনের শ্রীগোদ্রুমবাস-লালসা কিরূপ?

"**নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।**
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে?
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥" —নঃ শঃ ১০০

৮। কোলদ্বীপের নিকট গৌরজনের কি প্রার্থনা?

"কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে।
দেহ' নবদ্বীপবাস ভক্তজন-সনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ' অধিকার।
জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার॥" —নঃ ভাঃ তঃ ৭৫

৯। কোলদ্বীপ বা অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কোথায়?

"বর্ত্তমান (সহর) নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারস্থ তৎকালের কুলিয়া গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থানে দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে চিনাডাঙ্গা

প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে 'কোলের গঞ্জ' এখনও বলে, সেই সমস্ত ভূমিতে তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ১।১৫১

১০। শ্রীভক্তিবিনোদ চম্পাহট্টকে ব্রজের কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"**চম্পাহট্ট** গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পকলতা করে যথা কুসুম চয়ন ॥
নবদ্বীপে **শ্রীখদিরবন** সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম ॥" —নঃ ভাঃ তঃ ৭৮

১১। মোদদ্রুমদ্বীপকে কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডির হয় একতত্ত্ব।
যথা পশু-পক্ষিগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব ॥" —নঃ ভাঃ তঃ ১১০

১২। "কলির ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতার অধিবাসীর প্রতি শ্রীভক্তিবিনোদের কিরূপ পরমাশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষিত হইয়াছে ?

"হে কলিকাতা-মহানগরী-নিবাসী ভাইসকল! তোমরা ধন্য। তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশে বলিলেও হয়—বরাহনগর গ্রাম। যেখানে গৌরলীলা, সে-স্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অন্তরঙ্গ ভাগবতাচার্য্যের সেবা-ভূমি পরম আদরের স্থান। ** হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ! কবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন হইব ? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।" —'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

— জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিশ্বে শ্রীচৈতন্য

বস্তুসমূহের আধারকে বিশ্ব বলে। বিশ্ব-পর্য্যায়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ প্রভৃতি নামান্তর প্রাপ্ত হই। বিশ্ব বস্তুজাতীয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সেব্যবস্তু বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর-নামে সংজ্ঞিত হন। বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ —অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান। বিশ্বসৃক্ চতুর্ম্মুখ, বিশ্বপাঃ বিষ্ণু ও বিশ্বহর রুদ্র—

দেবত্রয় বিশ্বনিয়ন্তা। গুণত্রয়ের ও তাহাদের পরস্পর ন্যূনাধিক সংযোগ-বিয়োগেই দ্রব্য ও ব্যাপারসমূহের অবস্থানাত্মক বিশ্ব। ভাষান্তরে গুণমায়ারচিত বিশ্বে বা জগতে কর্ত্তাভিমানী বিশ্বাতিরিক্ত পদার্থের শুভাগমন। বিশ্বাতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বভোগ বা গ্রহণাভিলাষে বিশ্বে আগমন করেন। বিশ্বত্যাগাকাঙ্ক্ষায় গ্রহণের বিপরীতভাব তাহাতে দেখা গেলেও তৎকালে বিশ্বান্তর্গত অভিজ্ঞতা-গন্ধ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। বিশ্বের বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ত্যাগ-পর্য্যায়ে বিভিন্ন দিক্ থাকিলে নবাগত অতিথি বিশ্ব লইয়া ব্যস্ত থাকেন। বিশ্বে আধার-জ্ঞান, জ্ঞেয়-বিচার তাঁহাকে ভিন্ন তাৎপর্য্যপর বুঝিতে দেয় না। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সুষুপ্তিমাত্রই তাঁহার গন্তব্যপথের সীমা মনে করায়। কিন্তু বিশ্বে বাসকালে বিশ্ববাসী প্রভু যেকালে নিজ-স্বরূপধর্ম্মের কথা শুনিতে পান, তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা কীর্ত্তনপ্রভাবে নিজস্বরূপে পুনঃ প্রতিনিষ্ঠিত হইবার কোন কোন স্থলে রুচিও দেখা যায়।

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥

—যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, যে চৈতন্যকে বিশ্ব উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে না, যে চৈতন্য নিদ্রিত ও সুষুপ্তিকালেও জাগ্রত থাকেন, যে চৈতন্য সকলকে জানেন এবং সেই চৈতন্যকে কেহই জানে না—এই কথা (ভাঃ ১।৭) মনু ভগবানকে বলিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় চিজ্জীবের চেতনকে অবরুদ্ধ করিয়া গুণমায়া-রচিত বিশ্বের অচিদধিষ্ঠানের পোষণ করে। বিশ্বের সহিত চিদধিষ্ঠানের সম্বন্ধ ঘুর্ণাক্ষরেও জানিতে দেয় না। চিদ্বস্তুতেই স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম অনুস্যূত। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আপনাকে বিশ্বের গুণত্রয়ের ক্রীড়াপুত্তলী জ্ঞান করেন, বিশ্বের বিচিত্রতার অশেষত্ব অচেতন বিশ্বের ধর্ম্মমাত্র গণনা করেন। চেতনে চিত্রতা নাই, অচিতের বিচিত্রতার বিপরীত-বিচারে চিত্রহীনতাই চিদ্ধর্ম্ম জ্ঞান করেন। বিশ্বসেবায় অর্জ্জিত চিন্তা অণুচেতনকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিলে জীব অনুচিদ্‌বৃত্তি-রহিত হইয়া বিশ্ববৈচিত্র্য ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন এবং বৈচিত্র্য-বিরোধী হইয়া চিদ্ধর্ম্মে বিচিত্রাভাব স্থাপন করিয়া অচিদ্বিশ্বান্তর্গত তাৎকালিক চিন্মাত্রে অনিত্যভাব সংযোজন করেন। বিশ্বজ্ঞানের মূঢ়তা অচিন্মাত্রবোধ প্রতীতি তাঁহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার বুঝিতে দেয় না। জড়নির্ব্বিশেষ-ভাবের প্রাবল্যে তিনি শুদ্ধ চিদ্বিলাসের উপলব্ধির অভাবে চিন্মাত্র শব্দোচ্চারণমুখে অচিদ্বিলাস-বৈভবের অন্যতমতার দাস্য করেন। মনুর বাক্যের সার্থকতা জন্য অধোক্ষজ ভগবান্ আধ্যক্ষিক বিশ্ববিচার-নিপুণকে অধোক্ষজ-প্রতীতিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে

স্বীয় নিত্যশিক্ষক-তনু প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে অধোক্ষজ ভগবজ্-জ্ঞান-দাতা জানিতে পারিলে জীবের বদ্ধপ্রতীতি অর্থাৎ ভোগ্য বিশ্বের উপলব্ধি হইতে অবসর লাভের যোগ্যতা হয়। বদ্ধ অণুচেতন স্বধর্ম বিস্মৃত হইয়া বিশ্বকে ভোগ্যজ্ঞান করেন। শিক্ষক ভগবান্ স্বীয় অধোক্ষজ স্বভাবক্রমে মায়াকারাগারে যোগ্যতাবিচারে ভাগ্যহীন জীবের অণুচেতন-বৃত্তি তৎকালে রুদ্ধ করেন। কৃষ্ণের গীতকথিত "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—এই বাক্য বুঝিতে না পারিলেই কৃষ্ণজ্ঞানে জীবের অধিকার লাভ ঘটে না। "আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥"—এই বিচার তাঁহাকে বিশ্বের ভোক্তা হইবার যোগ্যতা-পথে যাইতে নিষেধ করে। লৌহ যে-প্রকার অগ্নিশক্তি লাভ করিয়া তাৎকালিক দহন-যোগ্যতা লাভ করে, মুক্তপুরুষ শ্রীচৈতন্যদাসও সেইপ্রকার বিশ্বস্থিত খণ্ডিত দ্রব্যে মমতারহিত হইয়া উহাদিগকে ভগবৎ-সেবোপকরণজ্ঞানে স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই জানেন। লৌহের দহনশক্তি নাই, বিশ্বের অচিৎ পদার্থ অপ্রাকৃত সেবায় চিরবঞ্চিত। ভগবান্ চৈতন্যদেবের শিক্ষা-গ্রহণ না করিলে জীবের সেই সম্মোহিত ভাব কখনই বিদূরিত হয় না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ হরিসম্বন্ধী বস্তুতে অপ্রাকৃত শক্তি আহিত হয় নাই মনে করিয়া বিশ্বস্থিত পদার্থকে নিজ ভোগ্য মাত্র মনে করেন। তজ্জন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" উপদেশ দিয়া বিশ্বের ভোগি-ভোগ্যবস্তু-ধারণারূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হরিসম্বন্ধী বস্তুগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিলাভ করিয়া ভগবৎসেবোপকরণরূপে সেবোন্মুখের নিকট লক্ষিত হয়; ভাগ্যহীন জীব তখন তাহার দুর্ভাগ্য অপসারিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বস্থিত হরিসম্বন্ধী বস্তুগুলিকে শ্রীচৈতন্য-কৃপালব্ধ জানিতে পারেন। ভোগ্যজড় হইতে পৃথক্ সেব্য-কৃষ্ণের চিন্ময়তনু-বিষয়ক জ্ঞান-প্রদাতা চৈতন্যদেব অণুচেতন জীবের সহিত নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জানাইয়া দেন—বিশ্বের অন্যতম বদ্ধজীব তাঁহার প্রাকৃতভাব পরিহার করিবার যোগ্যতা লাভ করেন এবং দৃশ্য বিশ্বে সেবোন্মুখতারূপ পরমাত্মভাব তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হয়। বিশ্বে ভোক্তৃভোগ্য-ভাবান্বিত জীব তখন জানিতে পারেন যে, ভোগ্য বিশ্বস্বরূপে ভগবৎসেবা-তৎপর। তখন শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের চিন্ময়ী শিক্ষা-দৃষ্টিতে বিশ্বও তাঁহারই ন্যায় চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশ্বান্তর্গত নিজদেহে প্রাকৃত বুদ্ধিও বিশ্বকে ভোগ্য জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবদ্ধামবোধরূপ অনুভূতি লাভ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

"ভূর্ভুর্বঃস্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্ত পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

সপ্ত পাতালবর্ণনে অপর শাস্ত্র বলেন,—

"অতলং নিতলং চৈব বিতলং চ গভস্তিমৎ।
তলং স্থতল-পাতালে পাতালানি তু সপ্ত বৈ ॥"

আবার শাস্ত্রান্তর বলেন,—

"অতলং বিতলং চৈব স্থতলং চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম্ ॥
ততঃ পাতালমিত্যেবং সপ্ত পাতাল-সংজ্ঞকাঃ।
এতে স্বর্গাধিকসুখা বিলস্বর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সংসার প্রভৃতি শব্দের চতুর্দ্দশটী বিভাগ আছে—সপ্ত ব্যাহৃতি ও সপ্ত তললোক। অতল-বিতলাদি সপ্তলোক বা অধোভুবন স্বর্গাধিক স্থখপ্রদ, কিন্তু নিম্ন গুহায় অবস্থিত। এই পাতালাদি সপ্তলোক মেদিনী প্রভৃতিকে বহন করে। উপর্য্যধঃ পর্য্যায়ে চতুর্দ্দশলোক—(১) সত্য, (২) তপঃ, (৩) জন, (৪) মহঃ, (৫) স্বর্গ, (৬) অন্তরীক্ষ, (৭) পৃথিবী, (৮) অতল, (৯) বিতল, (১০) স্থতল, (১১) তলাতল, (১২) মহাতল, (১৩) রসাতল ও (১৪) পাতাল। এই চতুর্দ্দশ লোকবাসিগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবরাজসকল তত্তদ্দেশের অধিবাসিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের নিত্য অধিবাসী এবং এই চতুর্দ্দশলোকে বাসকালে পরিমিতকাল পর্য্যন্ত তত্তৎস্থান লাভ হয়। গৃহস্থগণ স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকগণ সত্য, তপঃ, জন ও মহলোকে কোন কোন সময়ে গতিলাভ করেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে পুনরায় ভূলোকে গতিলাভের জন্য প্রেরিত হন।

জীবমাত্রেই তটস্থ-ধর্ম্মক্রমে সেবোন্মুখতা বা সেবাবিমুখতা—এই উভয়দিকে গতিশীল। চতুর্দ্দশ বাধক-লোক যে কালে সাধনসিদ্ধ বিষ্ণুসেবাপর জনগণের গতি রোধ করে, সেইকালে তাহারা ভোগী ও কিঞ্চিৎপরিমাণে ত্যাগী বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়া থাকে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজগণের অনুগ্রহ লাভ করিলেই জীবের বৈকুণ্ঠগমনে ও সেবাসুখ-তৎপরতায় রুচি উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত ভক্তগণ নানাবিধ বিষ্ণুভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ও

ভগবৎসেবা-শ্লথ সাধারণ বৈষ্ণবগণের উপকারের জন্য পরদুঃখ-দুঃখিসূত্রে সকল বিষ্ণুভক্তের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা তৎপর। এই বিশ্বে বৈষ্ণবরাজগণ জীবকল্যাণের জন্য শুদ্ধভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদন-ক্রমে বৃন্দাবনীয় গোস্বামিগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইঁহারা চারিপ্রকার ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের অসম্পূর্ণতায় সম্পূর্ণতা সাধন ও বিহিত মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন ও করিয়া থাকেন। বিশ্বনিস্তার কার্য্যে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার সাধনভক্তির কথা স্বীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া অনুমোদন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ স্বীয় অনুগত জনগণের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করেন। চতুর্দ্দশ লোকসমূহে উচ্চাবচ-ভাব বিরাজমান। বৈকুণ্ঠপুরুষগণের মধ্যে তাটস্থ্য ধর্ম্ম লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে। কিন্তু বোধ-সৌকর্য্যার্থ জীবকুল তটস্থধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥"

চতুর্দ্দশ ভুবনের বেষ্টনস্বরূপ বিরজা নদী। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গুণত্রয়ের অবস্থান। চতুর্দ্দশভুবন প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত বলিয়াই কথিত। তাহা অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী অবস্থিত। তথায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা দেখা যায়। বিরজার একপারে চতুর্দ্দশ ভুবন, অপরপারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক কেবল সলিলবিশেষ নহে, কিন্তু চিন্মাত্র ভূমিকা। সেখানে চেতনবিপরীত অচিদ্ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। মানবের যে-কাল পর্য্যন্ত বিরজা-স্নানে অধিকার না হয়, তৎকালাবধি চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণকার্য্যে যোগ্যতা থাকে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা ও নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয়, এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থিত তেজ, তন্মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত তেজ-রশ্মি এবং তেজ-প্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্য-তত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারিপ্রকার রূপ নিত্যসিদ্ধ। শক্তিমান্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারিপ্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য-সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র-বিক্রমময়ী। তাঁহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরাশক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্য দেদীপ্যমানা। অন্তরঙ্গা শক্তি-সহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় মায়াবৈভব ; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য —এই তিন নিত্যভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণ-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। রূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোকবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধামবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎ-সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎপরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী ; তটস্থাশক্তিদ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট ; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৈভব-মধ্যস্থিত ; মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব-স্বরূপভ্রমজনিত জড়াভিমানদ্বারা জড়ধর্ম্মরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার-দুঃখাচ্ছন্ন। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ তদ্বিভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্তলীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বৃন্দাবন; যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসবিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌরদেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ড-বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌরভূমির আনন্দবিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্য, ওঢ্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধহরিভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারকদ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ মত প্রচার এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন;—

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা॥
প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধ জীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত

তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্" এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরেশ-বৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকারদ্বারা শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের জড়মলকর্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসার-দুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়াসঙ্গরূপ বৈধর্ম্ম পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়ান্তর্গত ভূত-ভবিষ্যতাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানের নাম সম্বন্ধজ্ঞান। "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণম্" এই অর্দ্ধপদদ্বারা অভিধেয়তত্ত্বস্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি-দ্বারাই সাধিত হয়,—এইরূপ শাস্ত্রার্থাবধারণরূপা শ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধু-গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এইপ্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বজাত-শ্রদ্ধা বা ভগবন্মাধুর্য্য-লোভ যখন পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাব-দশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ জড়োদ্ভূত স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসাধিকার-বিশেষ রস-যোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুররসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপ-শক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিদ্ধামের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চিৎসামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্রসের নিত্যতা-ধর্ম্মবশতঃ তখন ভূতভবিষ্যদ্রূপ জড়মল-দূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদাভাবজনিত বিশুদ্ধচিন্ময়-তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অণুচৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সর্ব্বাত্মস্নপন-

রূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের সিদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজনতত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান মার্জ্জিত। শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রয়োজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং'-শব্দদ্বারা ভক্তি ও মুক্তি-সাধক ধর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরিকীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

দীক্ষা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৬ পৃষ্ঠার পর]

দীক্ষা কাহাকে বলে? উত্তরে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বিষ্ণুযামল-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"

সহজ কথায়, যাহার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে নাশ হয়, ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

ভজনে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানের। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ না হইলে কোন কিছু হইবার উপায় নাই।

দীক্ষার দ্বারা পাপাদি-নাশ বড় কথা নহে। আলোর প্রকাশে যেমন অন্ধকার আপনা আপনি পলায়ন করে, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্বের প্রকাশে পাপাদি আপনা আপনি চলিয়া যায়। দীক্ষার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রেমভক্তিলাভই প্রয়োজন। ভগবান্ গীতায়ও (১৮।৬৬) বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

অনেকে উৎসাহের সহিত বলিয়া থাকেন,—"দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই শারীরিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছি, সাংসারিক বহুপ্রকার সুবিধা হইয়াছে। যাহারা শত্রুতা করিয়াছিল তাহাদেরও দমন হইয়াছে।" এই সমস্ত ফল দীক্ষার বাস্তবফল নহে। ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে দীক্ষার প্রকৃত ফল লাভ হইল না। আবার দীক্ষার পরে স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে মনে ক্লেশ বোধ করিলেও দীক্ষার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, বুঝিতে হইবে। ভোগ বা ত্যাগ

উভয় হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণসেবায় স্বাভাবিকী অনুরক্তিই দীক্ষার মুখ্যফল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রধানমন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে একটী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

* * "ইহা আমি কর্য়াছি বিচার।
বিষয়-ভোগে খণ্ডাইল কৃষ্ণ সে তোমার॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট একটী ভোটকম্বল ছিল। উহা তাঁহার ভগ্নীপতি-প্রদত্ত। মহাপ্রভু সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এক গৌড়ীয়াকে প্রদান করত বিনিময়ে ছেঁড়াকাঁথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উপরিউক্ত কথা বলিয়াছিলেন। এই সনাতন গোস্বামী পরবর্ত্তিকালে সম্বন্ধ-তত্ত্বের আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির পরমনিধি-স্বরূপ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অবদানরূপে আমরা বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসপ্রাপ্ত হইয়াছি।

দীক্ষা ও দীক্ষাপ্রদানকারী গুরুদেবের সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে দীক্ষা-গ্রহণকারীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ক্ষুধা ও পিপাসা যদি না থাকে, তাহা হইলে খাদ্যবস্তু ও পানীয় জলের প্রাচুর্য্য থাকিলেও নিকটস্থ ব্যক্তির যেমন তাহাতে কোন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে না, তদ্রূপ ভগবৎ-সম্পত্তির প্রাচুর্য্য লইয়া সদ্গুরু আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলেও তাহার প্রয়োজন-বোধ না হইলে আমরা তাঁহার নিকটে ঐ সম্পত্তির প্রার্থী হইব না। এইজন্য সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের আরাধনার প্রয়োজনবোধ আমাদের চিত্তে জাগরূক হওয়া দরকার, সঙ্গে সঙ্গে তদুপলব্ধির বাধক ভোগাদির অকিঞ্চিতকরতা উপলব্ধি করাও দরকার। তজ্জন্য ঐকান্তিক শরণাগতি লইয়া সদ্গুরুর নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। আমি কিছু জানি, এই প্রকার অহমিকা লইয়া তাঁহার নিকটে গেলে হইবে না। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে যোগ্যক্ষেত্র প্রস্তুত করাই যেমন কৃষকের কার্য্য, তদ্রূপ দীক্ষা-গ্রহণকারীরও হৃদয়রূপ ক্ষেত্রটীকে দীক্ষা-গ্রহণের যোগ্য করা প্রয়োজন। যোগ্য ক্ষেত্রে যোগ্য বীজ পড়িলে, যোগ্য ফল হইয়া থাকে; তদ্রূপ যোগ্য শিষ্যের হৃদয়ে যোগ্য গুরুর যোগ্য দীক্ষামন্ত্র প্রদত্ত হইলে যথাযোগ্য ফল কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইবেই।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥" (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি কৃষ্ণকৃপাতে সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে; তাঁহার কৃপালব্ধ দীক্ষার সাধনার দ্বারা কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ হইয়া থাকে।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

এইভাবে গুরুকরণ-প্রণালীর মধ্যে শিষ্যের ভজনের যথাযথ পন্থার কথা আমরা অবগত হই।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

দীক্ষার দ্বারা যে বিপ্রত্বসিদ্ধির কথা আমরা শুনিতে পাই, সেই বিপ্রত্বে গুরু-বৈষ্ণবগণের দাসত্ব বিদ্যমান্। তাহাতে ত্রিগুণান্তর্গত অহঙ্কারের স্থান নাই। এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে আমরা জানিতে পারিব—সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণতার এবং বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে বৈষ্ণবতার প্রকাশ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবতায় গুণগত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ঊর্দ্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগতি। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গাহিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥”

অতএব সমস্ত প্রকারের অভিমান ও অস্মিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ণতম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণতম উপলব্ধিতে শিষ্যের জীবন ধন্যাতিধন্য হয়। ইহাই ভাগবতীয় দীক্ষার ফল। ভাগবতীয়-দীক্ষা দুইভাগে বিভক্ত—মন্ত্রদীক্ষা ও নামদীক্ষা। মন্ত্র-দীক্ষা হইতে বিষয়মোচন হয়, কিন্তু শ্রীনামদীক্ষা হইতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। প্রমাণ—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥

অতএব সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত (৮।২৩।১৬) বলিয়াছেন,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমণুসংকীর্ত্তনং তব ॥

—স্বরভ্রংশজনিত মন্ত্রগত, ক্রম-বিপর্য্যয়াদিদ্বারা তন্ত্রগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যে-সকল ছিদ্র অর্থাৎ বৈগুণ্য হয়, আপনার (ভগবানের) নাম-সংকীর্ত্তনে সে-সকল বৈগুণ্যরহিত অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্বসার শ্রীনামদীক্ষারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

“প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর ॥

অতএব নামদীক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা ; ইহা পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা বা পুরশ্চরণের অপেক্ষা-রহিত। তথাপি শাস্ত্রে কোথাও কোথাও বিষয়-পীড়িত-চিত্ত-সংশোধন

এবং জাড্য ও স্বাভাবিক দৌর্জ্জন্য-অপসারণের জন্য মন্ত্রের আবশ্যকতা লিপিবদ্ধ আছে। শুদ্ধচিত্তে নাম উচ্চারিত হইলে ক্রমে নামপ্রভাবে নামী হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥ (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

ভাগবত-মার্গে নামই সাধন এবং নামই সাধ্য। সাধ্য ও সাধনে এখানে কোন ভেদ নাই। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে সাধ্য ও সাধনায় ভেদ রহিয়াছে। কর্ম্ম-কাণ্ডীয়-বিচার-মতে দিব্যজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে মন্ত্রের যে উপদেশ দেখা যায়, তাহা ভোগকেই নির্দ্দেশ করে। জ্ঞানিগণের দীক্ষামন্ত্র ভাগবতমার্গীয় দীক্ষার দিব্য দর্শনের সহিত এক নহে। তাহাতে উপলব্ধির কোন কথা নাই। নির্ব্বাণের কথা আছে মাত্র; তাহাতে ত' জীবাত্মার লোপ, সুতরাং নির্ব্বাণ-মুক্তিতে আস্বাদন নাই। আস্বাদন একমাত্র সেব্য-সেবকের প্রেমাত্মিক-সম্বন্ধে বিদ্যমান। কর্ম্ম-কাণ্ডে ভোগবাদ। জ্ঞানকাণ্ডে ত্যাগবাদ। যোগমার্গে কৈবল্যমুক্তি। এই সমস্তের ঊর্দ্ধ্বে বিধিমার্গীয় ভক্তের বৈকুণ্ঠে নিত্য নারায়ণ-সেবার ভূমিকা। তদুপরি গোলোকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাগাত্মিক-সেবা, যাহাতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করে। রাগমার্গীয় সেবকগণের নিকটে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য— বৈকুণ্ঠস্থ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিও স্থান পায় না। দিব্যজ্ঞান-প্রদান-কার্য্যে যে মন্ত্রের উপদেশ দেখা যায়, তাহাতে প্রণবের সংযোগ ও বীজপুটিত করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক দুই প্রকারের এবং পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষার কথা আমরা শুনিতে পাই। অধিকার-বিচারে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা, আর অনধিকারীকে অধিকারি-জ্ঞানে যে

মন্ত্র প্রদত্ত হয়, তাহা বেদানুগা পৌরাণিকী দীক্ষা। শ্রীনারদ গোস্বামী ধ্রুবকে এই দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহা হইলে বুঝা গেল, দীক্ষা তিন প্রকার, যথা— (১) বৈদিকী, (২) পৌরাণিকী ও (৩) পাঞ্চরাত্রিকী।

অনেকে বলিয়া থাকেন—দীক্ষার প্রয়োজন থাকিলে ত' গুরুকরণের কথা। দীক্ষার কোন প্রয়োজনই নাই, মনই আমাদের গুরু। অতএব আমাদের মন যখন যাহা বলিবে তাহা করিলেই শান্তি। এই বিচার সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আমাদের মন অসংশোধিত, মায়াপ্রপীড়িত ও ভ্রান্তিপূর্ণ। মনোধর্ম্মরূপ অজ্ঞতার পশ্চাতে প্রধাবিত হইলে জ্ঞানলাভ হইবে কি? বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম ত' মায়িক; দিব্য-জ্ঞানের উদয় হইবে কি-প্রকারে? সংসার-ক্ষেত্রেও কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে গুরুর বা উপদেষ্টার প্রয়োজন, আর যে ভূমিকার জ্ঞান আমাদের যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহা লাভ করিতে হইলে সেই জ্ঞানসমৃদ্ধ গুরুদেবের পদাশ্রয় ব্যতীত কিরূপে সম্ভবপর? যদি কেহ অজ্ঞান-নাশপূর্ব্বক ভগবচ্চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষার একান্ত প্রয়োজন; ধ্রুবই তাহার সাক্ষী। শ্রীনারদ গোস্বামী মন্ত্র প্রদান না করা পর্য্যন্ত তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয় নাই। ইহা ত' সাধকের কথা, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ও জগতে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকল্পে স্বয়ং গুরুকরণ করিয়াছিলেন।

আমার বক্তব্যের সার কথা এই যে, ভাগবতমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-নামদীক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা, তাহাও ঐকান্তিক শরণাগত, ভগবানের প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের দীক্ষাও গুরুদেব হইতে গ্রহণ করিতে হইবেই।

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

"জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তাহলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।" **— শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ**

সাধবো দীন-বৎসলাঃ

একদা পরম দয়ালু শ্রীনারদ গোস্বামী প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিবার জন্য অরণ্যমধ্যস্থিত পথ অতিক্রম করিতে করিতে ভূপতিত বাণবিদ্ধ ও ভগ্নপাদ একটী হরিণকে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করেন। তথা হইতে কিয়দ্দূরে অনুরূপ বাণবিদ্ধ, ভগ্নপাদ ও যন্ত্রণাকাতর একটী শূকরকেও ধড়্‌ফড়্ করিতে দেখিয়া অধিকতর দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একই অবস্থাপ্রাপ্ত একটী শশককেও দেখিলেন এবং জীবদুঃখে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আরও কিছুদূর গমন করত এবম্প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম্মকর্ত্তা শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, মহাভয়ঙ্কর যমসদৃশ একটী ব্যাধকে বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া উদ্যতবাণ অবস্থায় দর্শন করিলেন। ইহাতে তিনি আর উদাসীন হইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজপথ পরিত্যাগ করত বনমধ্যস্থিত ব্যাধসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষীকৃত মৃগগণ পলায়ন করাতে ব্যাধ ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীনারদ গোস্বামীকে পরুষ-বচনে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেও মুনিবরের প্রভাবে ব্যাধের তিরস্কার করিবার ক্ষমতা হইল না। সে বলিতে লাগিল—গোসাঞি, তোমার পথ পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে কি জন্য আসিলে? তোমাকে দেখিয়া আমার লক্ষ্য-মৃগগণ পলায়ন করিল। শ্রীনারদ বলিলেন,—বাবা, পথ ভুলিয়া গেলাম, সে কারণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিলাম। আরও একটী সংশয় জন্মিয়াছে, তাহারও খণ্ডন করিবার জন্য আসিলাম। পথে আসিতে যে মৃগ ও শূকরাদি বাণ-বিদ্ধ ও ভগ্নপাদ অবস্থায় ধড়্‌ফড়্ করিতে দেখিলাম, সেগুলি তোমারই বলিয়া মনে করি। ইহাই কি ঠিক্? প্রত্যুত্তরে ব্যাধ কহিল,—তুমি যাহা ভাবিয়াছ, তাহাই ঠিক্; ওগুলি আমারই।

নারদ কহিলেন,—তুমি ব্যাধ, পশুকে হত্যা করা তোমার কার্য্য; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হত্যা না করিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়া রাখ কেন? ইহাতে তোমার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে? ব্যাধ কহিল,—শুন গোসাঞি, আমার নাম 'মৃগারি'। আমি পিতার নিকটে জীবহত্যার শিক্ষালাভ করিয়াছি। জীবকে পলায়নে অক্ষম করিয়া অর্দ্ধমৃত রাখিলে সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে; তাহা দেখিয়া আমার মনে আনন্দ লাভ হয়। সম্পূর্ণরূপে হত্যা করিলে তাহা হয় না।

ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করত কৃপালু নারদ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—আমি তোমার নিকট একটী বস্তু ভিক্ষা চাহি; তুমি আমাকে তাহা দিবে কি? ইহা শ্রবণ করত

ব্যাধের প্রসন্নচিত্তে শ্রীনারদের ন্যায় সাধুকে সেবা করিবার সদিচ্ছার উদয় হইল। সে কহিল,—তোমার যদি প্রয়োজন হয়, মৃগাদি লইতে পার; অথবা মৃগ কিম্বা ব্যাঘ্রচর্ম্মের আবশ্যক হইলে, আমার ঘরে চল। তোমার যেটী মনোমত হয়, তাহাই আমি তোমাকে দিব।

এই ব্যাধ আজ তাহার অজ্ঞাত সুকৃতির কি মহান্ ফল লাভ করিতে চলিয়াছে, তাহা বিচার করিলে ব্যাধের সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা উদয় হয়। সে পূর্ব্ব-জীবনে ভগবদ্ভক্ত বা ভগবানের অজ্ঞাতভাবেও নিশ্চয়ই সেবা করিয়াছে, যাহারই ফলস্বরূপে আজ শ্রীনারদ গোস্বামীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের সহিত আলাপন ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার প্রতি সেবাবুদ্ধির উদয় হইয়া তাহার পরম কল্যাণ লাভ হইতে চলিতেছে। হে মৃগারি! তুমি মহাভাগ্যবান্, তুমি অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, যাহাতে অধমগণও ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইতে পারে। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃপূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

শ্রীনারদ গোস্বামী এইভাবে সুকৃতিমান্ ব্যাধকে আত্মসাৎ করিয়া কহিলেন,—মৃগ বা মৃগচর্ম্মাদি কিছুই আমি চাহি না। আমি চাহি—আগামীকল্য হইতে তুমি যে সমস্ত পশুকে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে অর্দ্ধমৃত না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রথমেই হত্যা করিবে।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ কহিল,—ইহাতে আমার নিকট হইতে তোমার দানগ্রহণ করার কি হইল? আর তুমি অর্দ্ধমৃত রাখিতে নিষেধ করিতেছ কেন? অর্দ্ধমৃত রাখিলে কি হয়? আমাকে ইহা বল ত'!

শ্রীনারদ বলিলেন,—জীবকে সম্পূর্ণরূপে প্রথমেই হত্যা করিলে তাহাকে যে পরিমাণ দুঃখ প্রদান করা হয়, তাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিলে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক দুঃখ প্রদান করা হয়। অন্যকে দুঃখ প্রদান করিলে তাহার প্রতিফলস্বরূপে নিজের সেইরূপ দুঃখ বা কষ্ট পাইবার যোগ্য কার্য্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং অন্যকে দুঃখদান করার অর্থ—নিজেরই ঐ প্রকার দুঃখ পাইবার ব্যবস্থা করা। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ—তুমি যে সমস্ত জীবকে ঐ প্রকার কদর্থদ্বারা হত্যা করিয়াছ, তাহারা জন্মজন্মান্তরেও তোমাকে অনুরূপ কদর্থ দিয়া হত্যা করিবে।

বেদবাক্যে দেখা যায়—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।'

মনুও বলেন—'মাং স খাদতি অমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।'

ব্যাধ যদিও অত্যন্ত নিষ্ঠুর-হৃদয়, তথাপি শ্রীনারদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে তাহার হৃদয়ে পাপকর্ম্মের ভয়াবহ পরিণামের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের যোগ্যতা

লাভ হইল। সে নিজজীবনে এই প্রকার বহুকৃত পাপকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ক্লেশ-জনক ফল চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং সে কহিল —বাল্যকাল হইতে আমি এই জীবহত্যা কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি, অদ্যাবধি এই কর্ম্মজনিত পাপের পরিসীমা নাই। ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি? তোমার শ্রীচরণে আমি শরণাপন্ন হইলাম; আমাকে এই পাপরাশি হইতে নিস্তার কর।

ব্যাধের এই প্রকার নিষ্কপট আর্ত্তি ও প্রার্থনায় শ্রীনারদ ঋষি কহিলেন,—আমার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তবে আমার বাক্যানুসারে আচরণ করিলে তোমার সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

ব্যাধ বলিল,—তুমি যেরূপ বলিবে, আমি তাহাই করিব।

দ্রষ্টব্য বিষয়—সর্ব্বপ্রথমে সুকৃতির প্রয়োজনীয়তা, তদ্ব্যতীত সাধু বা ভগবদ্ভক্তের সমাগম সম্ভব হয় না। এই সুকৃতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে জীবের ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত সুকৃতির ফলেই ব্যাধের নিকট শ্রীনারদ ঋষির আগমন হইয়াছিল। কিন্তু নারদকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। নারদকে সে তিরস্কার করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীনারদের সহিত আলাপন হওয়ার পর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। অতএব আদৌ শ্রদ্ধা বিহিত হইলেও আদৌ সুকৃতিকেই বুঝা যাইতেছে। দ্বিতীয়ে শ্রদ্ধা এবং তৎফলেই সাধুর সঙ্গলাভ, অর্থাৎ সাধুর বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধু শাস্ত্রবাক্য বা নিজ উক্তির দ্বারা মায়িক বিষয়ে আসক্তিকে ছেদন করিয়া দেন। তজ্জন্যই শ্রীনারদ ব্যাধকে ভোগবাদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া অনর্থের মূল ধনোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ ব্যাধের ধনুকটীকে ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অনর্থগ্রস্ত জীবের ধন হইতে যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়, জন্ম, পাণ্ডিত্য এবং সৌন্দর্য্যাদি হইতে সে পরিমাণ ক্ষতি হয় না। শ্রীনারদোক্তি—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ॥ (ভাঃ ১০।১০।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥

ধনই যে পরমার্থের বাধা তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনসক্তঃ তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাজ্জীবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনরূপ পরমার্থপক্ষে ধনমদই প্রবল অন্তরায়। যথা

কুন্তীবাক্য,— জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।

শ্রীনারদগোস্বামী তজ্জন্য ব্যাধকে পাপপথে ধনোপার্জ্জন বন্ধ করিয়া তাহাকে ভিক্ষাজীবী করিবার জন্যই তাহার ধনুককে ভাঙ্গিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এতদ্বারাই ভগবানের অনুগ্রহ ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইতে পারিবে।

রজস্তমগুণাত্মক নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মে আসক্ত থাকিলে কখনই সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীভগবানে সত্যবুদ্ধির উদয় হয় না।—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥

পরমার্থপক্ষে দারিদ্রই অনুকূল বিষয়; ধনাঢ্যতা বা ভোগবাদ কখনই সাধক-জীবনে অনুকূল হইতে পারে না। সিদ্ধপুরুষ সাজিলে চলিবে না, বস্তুতঃ সিদ্ধাবস্থা লাভ করা প্রয়োজন। সিদ্ধপুরুষের নিকট ধনাদি কোনরূপ মোহ বা মদগর্ব্ব সৃষ্টি করিতে পারে না। সিদ্ধ না হইয়া সিদ্ধের অনুকরণ করিতে গেলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।—

"বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।"

শুনা যায়—শ্রীহরিনাম উচ্চারণকারীর প্রাথমিক অবস্থায় সদাই নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে, এবং নামাপরাধের ফলে প্রচুর পরিমাণে অর্থাদি ভোগ্যবস্তু লাভ হইতে থাকে। নামোচ্চারণকারী এই প্রকার অর্থাদি ও প্রতিষ্ঠাকে শ্রীভগবদনুগ্রহ বলিয়া বিচার করিতে থাকেন। তিনি ইহাকে নামাপরাধের ফল ও ভক্তি-বাধক বলিয়া যদি বুঝিয়া লইয়া সাবধান না হইতে পারেন, তবে "তৃণাদপি সুনীচতা"-গুণ লাভ কর সুদূরপরাহত হইয়া শুদ্ধনামোচ্চারণে বাধা জন্মায়। বস্তুতঃ সিদ্ধপুরুষের নিকট ধনাদি কোন প্রকার মোহ বা মদগর্ব্ব সৃষ্টি করিতে পারে না; অনর্থযুক্ত অবস্থাতেই ইহা ভীতিপ্রদ বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে। অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে দরিদ্রতা ও নিষ্কিঞ্চনতাই পরমমঙ্গল। এই কারণে ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত দারিদ্রই অনর্থযুক্ত সাধকের একান্ত মঙ্গলজনক।

পরম দয়াল বিশ্বগুরু শ্রীনারদ ঋষির চরিত্রে এই প্রকার ধনজনিত গর্ব্ব নাশ করত ভক্তিলাভের উপযুক্ততা প্রকাশ করিয়া কুবেরের পুত্রদ্বয়কে কৃপাবর্ষণ করিতে দেখা যায়। কোনও ধনী-মানী বা প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিকে ধনাদিলোভে শিষ্য করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার চরিত্রে কুত্রাপিও প্রকাশ পায় নাই। "যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়।" বাক্যের সার্থকতা তাঁহার ন্যায় শ্রীগুরুতত্ত্বে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। শিষ্যকে মঙ্গল প্রদানের ছলনায়—"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।" পরিচয়ে

অসদ্‌গুরুর লক্ষণ তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অন্যের গুরুত্ব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি মাৎসর্য্যরূপ অগুরুত্বও তাঁহাতে কখনই সম্ভব নহে। উচ্চশিক্ষিত, মর্য্যাদাসম্পন্ন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিকে শিষ্য করিবার জন্য হুড়াহুড়ি বা কাড়াকাড়িও শ্রীনারদাদি গুরুপাদপদ্মে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, সমভাবাপন্ন অন্য গুরু-ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদ্যতা ও আন্তরিক মৈত্রীভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই কিছুদিন পরে কপর্দ্দকহীন ভিক্ষোপজীবী মৃগারি ব্যাধকে সঙ্গদান-মানসে তাহার পর্ণকুটীরে গমনকালে পথিমধ্যে পর্ব্বতঋষিকে দর্শন করত আনন্দিত হইয়া শিষ্যের মঙ্গল-কামনা করিয়া তাঁহাকেও ব্যাধের কুটীরে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পর্ব্বতঋষিও তাঁহার অনুরোধ আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করিয়া একত্রে ব্যাধের কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মৃগারি ব্যাধ স্বচক্ষে গুরুদেবের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া শ্রীনারদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জন্মলাভ করিয়াছে। মৃগারি-কর্ত্তৃক মৃতপ্রায় ও বাণবিদ্ধ মৃগাদি ৩টী প্রাণীকে নারদগোস্বামী যন্ত্রণামুক্ত ও সুস্থ করিয়া দেওয়ায় তাহারা লম্ফপ্রদান করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এবং প্রতি দিবসে অযাচিতভাবে তাহার নিকট প্রচুর অন্ন সমুপস্থিত হইতেছে—এই ২টী অলৌকিক ব্যাপারে মৃগারি তাহার গুরুদেব শ্রীনারদের প্রতি নিষ্কপট সেব্যবুদ্ধি দৃঢ়ভাবে লাভ করিয়াছে এবং অন্যের বিনা প্রেরণায় সে সর্ব্বতোভাবে নিজকে গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তদ্গত অবস্থা লাভ করিয়াছে। কোনরূপ চাতুর্য্যে পরাস্ত হইয়া বা কপটস্নেহে মুগ্ধ হইয়া নারদের বশ্যতা করিবার ছলনা তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই। সেকারণ সে প্রতিক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অধীরভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। তজ্জন্য সে আজ গুরুপাদপদ্মের শুভাগমন দূর হইতে দর্শন করিবামাত্রই প্রেমভরে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু পথিমধ্যে বিচরণশীল পিপীলিকারাশি তাহার বাধাস্বরূপ হইয়া পড়িল। তাহারা যাহাতে পদভরে নিহত বা দুঃখপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য সে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে লাগিল এবং বস্ত্রদ্বারা পিপীলিকা অপসারিত করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিল। নিষ্ঠুর ব্যাধের কঠিন অন্তঃকরণে এবম্বিধ অহিংসাধর্ম্মের আবির্ভাব দর্শনে শ্রীনারদ বলিলেন,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

মর্ম্মার্থ এই যে—শ্রীহরিতে ভক্তিলাভ হইলে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত অন্য প্রাণীকেও হিংসা বা ক্লেশ প্রদান করিবার ইচ্ছা জীবের হৃদয়ে থাকিতে পারে না। তজ্জন্য ভক্তিলাভেচ্ছু জনগণ ভোজনাদি ব্যাপারেও জীবহিংসাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

অতঃপর মৃগারি শ্রীনারদ গোস্বামী ও পর্ব্বত মুনিকে কুশনির্ম্মিত আসনে অঙ্গনে উপবেশন করাইলেন এবং উভয়ের শ্রীপাদপদ্ম জলদ্বারা ধৌত করিয়া নিজেরা পান ও মস্তকে ধারণ করিলেন এবং প্রেমভরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কম্প-পুলকাশ্রু ভাবযুক্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ ব্যাধের পরিবর্ত্তন ও প্রেম দর্শন করত পর্ব্বতমুনি শ্রীনারদের অলৌকিক প্রেমদাতৃত্ব-মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন,—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥

সুতরাং সৎসঙ্গের ফলস্বরূপে প্রেমভক্তি লভ্য হয়। পরন্তু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সৎসঙ্গকারীর হৃদয়ে কোনরূপেই স্থান পায় না—ইহা সুনিশ্চিত। শিষ্যকে গুরুভক্তি শিক্ষাদানকালে নিজের গুরুত্ব কতদূর সত্য তাহা অসদ্গুরু কখনই চিন্তা করিতে সক্ষম হন না—ইহাই পরিতাপের বিষয়। অতএব "দুর্ল্লভ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।"—বাক্যটী জয়যুক্ত হউন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

শুভ আবির্ভাব-বাসরে দীনের

প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীকেশব স্বামী।
তব চরণকমলে সতত প্রণমী॥
আজি তব শুভ আবির্ভাব-লগ্নে।
স্মরিব আমরা সবে বরিব যতনে॥
পূর্ব্ববঙ্গ বরিশাল বানরী পাড়ায়।
আবির্ভূত হইয়াছিলে পুণ্য ধরায়॥
পিতৃদেব শরচ্চন্দ্র গুহঠাকুরতা।
মাতা ভুবনমোহিনী সর্ব্বগুণযুতা॥

তাঁদের স্নেহ-বাৎসল্যে শৈশবকাল।
গোঁয়াইলে বিদ্যারসে অতিশয় ভাল॥
এককালে পিসিমা সরোজিনী দেবী।
দরশনে আইলা শ্রীগৌর-জন্মভূমি॥
তুমিও তাঁর সনে আইলা মায়াপুর।
তোমা' দেখি, প্রভুপাদ স্নেহ কৈলা প্রচুর॥
সেবা-সেবকের মিলন হইল মধুর।
ভবিতব্যে গৌরবাণী প্রচারের সুর॥
শ্রীগুরুচরণকমল আশ্রয় করি'।
নাম ধরিলে প্রভু শ্রীবিনোদবিহারী॥
গুরু সরস্বতী তব সেবা নিষ্ঠা স্মরি'।
উপাধি দানিলা তোমা 'কৃতিরত্ন' করি'॥
শাস্ত্রযুক্তি সিদ্ধান্তে তুমি হে মহান্।
মায়াবাদ মত দূষি' কৈলে খান খান॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ নয় বেদের প্রতিপাদ্য।
ভক্তিই বেদান্তের একমাত্র তাৎপর্য্য॥
বিশ্রম্ভ শ্রীগুরুসেবায় তুমি মূর্ত্তিমান্।
শ্রীমায়াপুরের বহু সেবা কৈলে বিধান॥
কতদিন এইভাবে সেবা সম্পাদিলা।
হেনকালে প্রভুপাদ অন্তর্হিত হৈলা॥
শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তর্দ্ধান অন্তে।
তবে তুমি আইলা শ্রীকোলদ্বীপ প্রান্তে॥
কোলদ্বীপাধিপতি দেব শ্রীবরাহ।
তব সেবা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ॥
তদভীষ্ট স্মরি' তুমি কৈলে যত্নবান্।
স্বতস্ফূর্ত্তভাবে হইলে আগুয়ান॥
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করি'।
শ্রীগুরু-গৌরবাণী প্রচারিলে বিশ্বভরি॥

মধুলোভে অলিগণ যেন মতে ধায়।
তেনমতে ভক্তগণ আইলা ত্বরায়॥
স্থানে স্থানে কত মঠ করিলে স্থাপন।
শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার কারণ॥
প্রচারকগণে দ্বারে দ্বারে করিলে প্রেরণ।
কলিহত জীবগণে করিতে তারণ॥
তোমার মহিমা প্রভু অসীম অনন্ত।
মুঞি ছার অধম তাঁর না পাই অন্ত॥
তবে মোর আশা এক আছয়ে হিয়ায়।
তব নিজজনগণে জানাবে আমায়॥
তাঁদের চরণে করি এই নিবেদন।
জন্মে জন্মে করি যেন শ্রীগুরুসেবন॥

শ্রীগুরুচরণকমলাকাঙ্ক্ষী—
—**শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী**

অনুকরণ ও অনুসরণ

বানরগণ খুব অনুকরণপ্রিয় বলিয়া জগতে প্রচলিত। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষই বোধহয় অনুকরণপ্রিয়তার দিক্ দিয়া বানরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। অনুকরণের অপর নাম বাঁদরামি বা ঢং। অনুকরণ কার্য্যটি হরি, গুরু, বৈষ্ণব, সেবা, সাধন, সিদ্ধি, সিদ্ধ, কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুকে উপহাস করা। এক বানর যেরূপ ছুতোরের কার্য্য নকল করিতে গিয়া দামী দামী আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলে ছুতোরের প্রহারে তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অনুকরণ করিতে গেলে অতি অবশ্যই পরপারে যাইবার রাস্তাটি চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহজগতে মানুষের কৃত্রিম জিনিসই বেশী পছন্দ। তাই তাহারা সারমেয়ের ডাকের অনুকরণে হরবোলার বা ভাঁড়ের কৃত্রিম ডাককে বিবর্ত্তবশতঃ সত্যিকারের ডাক মনে করে, অথচ প্রকৃত সারমেয়ের ডাক তাহাদের নিকট নকল বলিয়া বোধ হয়। ইহাই মায়ার খেলা। যে যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া

অবিবেচনারই কার্য্য। অজ্ঞ অবিবেচকগণই জগতে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন বা লক্ষীছাড়ার নাম লক্ষী রাখিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করে।

জগতে যতপ্রকার সর্ব্বনাশ-সাধক মায়িক চেষ্টা রহিয়াছে, তন্মধ্যে অনুকরণ কার্য্যটি সর্ব্বপ্রধান। মায়ার সকলপ্রকার ছলনা ও পিশাচীবৃত্তি অনুকরণকারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে চলিতে বাধ্য করায়। উহা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের দণ্ডনীয় ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম ঘৃণিত আত্মপর-বঞ্চনাময়ী জগন্নাশকর মহা অনর্থময় ব্যাপার। ভণ্ড, ধূর্ত্ত, শঠ, বঞ্চক, কপট প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই আনুকরণিক। যাহারা মুক্ত-সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া জনগণমনোমোহনকর কৃত্রিম অস্থায়ী ভাবমুদ্রাদি প্রদর্শন করে, তাহারা 'ভক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না; তাহারা 'প্রাকৃত সহজিয়া' উপাধি লাভের যোগ্য। তাহাদের হৃদয়ে কামাদি রিপু ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহারা ভগবৎসেবার অধিকার লাভ করিতে পারে না।

ভক্তের অনুকরণকারী লৌকিক যশঃ-সম্মান-লোলুপ কপট সহজিয়াগণের লোক-রঞ্জনের জন্য যে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় ভাবুকতার অভিনয়, তাহা কেবল ভণ্ডামি মাত্র। কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা প্রদর্শনের চেষ্টা—লোকবঞ্চনা মূলেই জাত। কৃত্রিম ভাবকেলি দেখাইয়া সহজিয়াগণের ক্ষুদ্র জড়-প্রতিষ্ঠাকে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা মিথ্যা। সহজিয়াগণকে দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন চার আনার ভাব দিয়া কৃষ্ণকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ চার আনার ভাবের দ্বারা কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা অসম্ভব। কারণ এই স্থলে ভাবের স্থায়িত্ব ত' মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এবং তাহাতে আবার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কোথায় অনুকরণকারী ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া, আর কোথায় নিষ্কপট অপ্রাকৃত সহজ প্রেমিক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত! নিষ্কপট শুদ্ধভক্তের সহিত মিথ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে তাহার অনুকরণচেষ্টাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্ত কপটীর কুটিল-কুনাট্য। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি লোক দেখাইবার জিনিষ নহে। কাহাকে কখনও কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হইয়া লোকরঞ্জনে ব্রতী হইতে দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাহার অনর্থ নিবৃত্তির পরে ভগবানে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি এবং স্থায়ী ভাবভক্তির উদয় হয় নাই। প্রকৃত ভাব-ভক্তগণের হৃদয় কৃষ্ণের নাম-গুণ-শ্রবণে, কীর্ত্তনে বা স্মরণে বিগলিত হইলে যদি তাঁহাদের বাহ্য দেহে সাত্ত্বিক বিকারাদিও প্রকাশিত হয়, তথাপি তাঁহারা নিজ-ভাব গোপন করেন। সকাম ভক্তের ভক্তিও কেবলমাত্র স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে ভক্তির অনুকরণরূপ বলিয়া নটনরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ভগবান্ পৃথিবীতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া থাকেন। ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য। কোন অবস্থাতেই ভগবানকে অনুকরন করা উচিত নহে, তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য। ভগবান্ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এক আঙ্গুলের উপরে ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার অনুকরণে অপর কেহ কি তাহা ধারন করিতে সক্ষম হইবে? ভগবানের সমস্ত লীলাই অলৌকিক ও অসাধারণ, তাঁহার লীলা অনুকরণ করিয়া ভগবান্ হইবার চিন্তা করা মুর্খতারই পরিচায়ক। সমুদ্র-মন্থনের বিষ মহাদেব পান করিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ মানুষ যদি এককণা বিষ পান করে, তাহার মৃত্যু অবধারিত। মহাদেবের বিষ খাওয়ার অনুকরণে কিছু মূর্খ ব্যক্তি নিজদের মহাদেবের চেলা প্রচারপূর্ব্বক গাঁজা, ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য পান করিয়া জীবনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিবার জন্য ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ লীলা—রাসলীলা, বস্ত্রহরণ লীলার অনুকরণ করে। ফলস্বরূপে তাহারা জীবনে চরম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে।

অনুকরন ও অনুসরণ দুইটী বিষয় এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"যেমন আনুগত্য ও তোষামোদ এক নহে, তদ্রূপ অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। অনেকে অনুকরণ-কার্য্যকে অনুসরণ বলে ভ্রম করেন। দুটী কথা—অনুকরণ ও অনুসরন। যাত্রাদলের নারদ সাজা—অনুকরন, আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ও আচরিত ভক্তিপথে গমন—অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ।

আমরা মনে করি—আমরা অনুসরন করছি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি অনুকরনই করে বসছি। অনুসরণ—নিজের আচরণ, কেবল অনুকরণ কার্য্যের দ্বারা অনুসরন কার্য্যটা হবে না। অনুকরণ (Imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটী ব্যাপার। অনুকরণ ও অনুসরণ কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখতে একই প্রকার। মেকি সোনা (Chemical gold) ও খাঁটি সোনা (Pure gold) বাহিরের দিকে দেখতে অনেকটা একই প্রকার। অনুকরণকে অপর ভাষায় ঢং বলে। আমাদের হৃদয়ে বিপ্রলিপ্সা নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা করে নিজের প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা অনুকরণ করে থাকি। শ্রৌতপথের অনুকরন মাত্র হলে অনুসরণ হয় না। অনুকরণ কার্য্যদ্বারা অনুসরণ হয় না বলিয়া সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই।"

গুরু-বৈষ্ণবের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ—জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর

কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান করা শুদ্ধভক্তের শুদ্ধ-বৃত্তি। অনুসরণকার্য্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধের লেশমাত্র না থাকায় তাহা পরমোপাদেয়। গুরু-বৈষ্ণবের প্রদর্শিত পথের অনুসরণকারী কোনপ্রকারেই ঘৃণিত কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাদি শূকরীবিষ্ঠার দ্বারা আকর্ষিত হন না। অনুসরণ বৃত্তিটি হইতেছে সুনির্ম্মল, নির্দ্দোষ, শুদ্ধ ও হেয়তাদি-শূন্য। যেই স্থলে অনুসরণ বৃত্তি বর্ত্তমান, সেই স্থলে ধর্ম্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধার্ম্মিত্ব কোন কিছুই থাকিতে পারে না, সেই স্থলে কেবলমাত্র অকৈতব-কৃষ্ণভক্তি বিরাজ করে। শাস্ত্রসম্মত শ্রেষ্ঠ আচরণই কল্যাণকামী কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয়। এই প্রসঙ্গে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

অত প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ।
অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈ কৃতম্॥ (ভাঃ ২।৮।২৫)

"হে মুনে, আত্মযোনি ব্রহ্মার ন্যায় আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয়-সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই লোকে অন্যান্য সকলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনগণের আচরিত বিষয়েরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।" শাস্ত্রের অন্যত্র পাওয়া যায়,—"অনুসৃত্য সতাং বর্ত্ম যৎস্বল্পমপি তদ্বহু" অর্থাৎ সাধুদিগের পথ অবলম্বন করিয়া স্বল্প লাভ করিলেও তাহা বহু ফলপ্রদ হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, অতিশয় তেজস্বী পুরুষ কদাচিৎ শাস্ত্র-বহির্ভূত স্বৈরাচার করিয়া থাকেন, যদিও শ্রীভাগবত বলেন,—"তেজীয়সাং ন দোষায়", তাহা হইলেও উহার অনুকরণ কনিষ্ঠ ব্যক্তির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ শ্রেষ্ঠের কার্য্যগুলি শাস্ত্রসম্মত না হইলেও উহা নিকৃষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অতএব শাস্ত্রসঙ্গত মহদ্ আচরণগুলি সর্ব্বদা কনিষ্ঠের পক্ষে অনুসরণীয় ও আত্মকল্যাণজনক।

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৪ পৃষ্ঠার পর]

এখানে শুধু বাসুদেব আবির্ভূত হয়েছেন কংসের কারাগারে, আর ওখানে যমজ সন্তান হয়েছেন। অষ্টমী-তিথি থাকতে থাকতে মা যশোদার ওখানে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন, আর নবমী-তিথি যখন পড়ে গেছে তখন যোগমায়া দেবী প্রসূতা হলেন। তাহলে আমরা কোন্ অষ্টমী-তিথি পালন করব ?—শুদ্ধ অষ্টমী-তিথি পালন করতে হবে, অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালন করলে হবে না। কিন্তু নবমী সংযুক্ত অষ্টমী যদি হয়, তাহলে খুব ভাল কথা। তার ভিতরে রোহিণী নক্ষত্র যোগ, অভিজিৎ মুহূর্ত্ত এবং সোমবার বা বুধবার হলে আরও ভাল। আজকের কি বার ?—সোমবার, একটা বিশেষ যোগ পাওয়া গেছে। শাস্ত্রে রয়েছে এগুলো। সব থেকে শ্রেষ্ঠ সময়টা বেছে নিতে হবে আমাদের। আজ হল তাই। এই তিথি পালনে ফল অধিক।

শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভগবান্ সবসময় আবির্ভূত হন। ভক্তহৃদয়ে তিনি প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে আবির্ভূত। তা সেই ভগবান্ আসছেন, যাচ্ছেন এটা আবার নূতন কথা কি ? যেখানে ভক্ত তাঁর গুণগান করছেন, ভগবান্ সেখানে আবির্ভূত হচ্ছেন। প্রমাণ আছে,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥

ভগবানের গুণগান যেখানে হয়, ভগবান্ সেখানে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন। এক ভক্ত খুব কান্নাকাটি করছিলেন। স্থানটা কাছাকাছি কালনা। নাম গৌরীদাস পণ্ডিত। সেখানে মহাপ্রভু বলে গেলেন, তোমরা যখন নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করবে, আমি তখন আবির্ভূত হব। তিনি আসতেন নৃত্য করতে। চৈতন্যভাগবতে বর্ণনা আছে। শচীমাতা যখন কান্নাকাটি করছেন, তখন মহাপ্রভু বলছেন,—মা ! কাঁদছ কেন ? "আর দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ মোর অর্চ্চামূর্ত্তি, মাতা ! তুমি সে ধরণী। জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥" কথাটা কি ? আমি যে তোমার মরে যাওয়া ছেলে নয়। আমি দুই শরীরে, দুই স্বরূপে—বিগ্রহস্বরূপ ও নামস্বরূপে আছি। তোমার কান্নাকাটির কি আছে ? তুমি সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাচ্ছ। মহাপ্রভু বললেন,—আমি কোথায় চলে যাচ্ছি ! আমি তোমা ছাড়া নই, আর তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি কি করে ? এটা হতে পারে কখনও ? আমি তোমার

নির্দ্দেশে পুরীতে যাচ্ছি। আবার বললেন,—তুমি কান্নাকাটি কর কেন? সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ পুত্ররূপে আসে, মাকে খাওয়ায়, পরায়। আমি তোমার ঐরকম ছেলে নই, অতটুকু কাজ করার ছেলে নই। "আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন। আমি আনি' দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥" বাহাদুরি আছে ভগবান্‌রূপী যে পুত্র তাঁর। সেইটা বুঝাচ্ছেন। জগতের লোক ত' এটা বুঝতে পারছেন না—কোন্‌টা আমাদের সব থেকে বেশী দরকার, সব থেকে বেশী প্রয়োজনীয় বিষয় এ সংসারে। সাধন-ভজনের প্রয়োজন আছে, এটা বুঝাবার জন্য ভগবান্ আসেন।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ তিনি গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে আসেন। যাঁকে প্রণাম করলেন,— "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" কে তিনি? জগৎকে জানাবার জন্য আসছেন, সাধন-ভজন করা দরকার তোমাদের, হরিভজন করা দরকার। তা না হলে কখনও জীবন সফলতা লাভ করে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে একটা শ্লোক আমরা দেখতে পাই,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

এটাই দেহধারী মনুষ্যের সফলতা। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা তারা ভগবানের সেবা করতে পারেন। অনেকে বলছেন,—আমার পয়সা-কড়ি কিছু নাই, আমি বড় গরীব, কি করে ঠাকুর সেবা করব? ভগবান্ কি বলে দিয়েছেন? তোমার পয়সা না থাকলেও আরও তিনটে—প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য ত' আছে। তুমি বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবা কর। বুদ্ধি নাই ত' বাক্য দিয়ে সেবা কর। বাক্য নাই ত' প্রাণ দিয়ে সেবা কর। ব্যবস্থাগুলো ত' শাস্ত্রে দেওয়া আছে।

ভগবানকে ভালবাসতে হবে—একথা শাস্ত্রের সব জায়গায় লেখা আছে। 'যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।' যে কোন উপায়ে আমাদের চিত্ত স্থির করতে হবে ভগবানে। কোন্ ভগবানে? ঠুঁটোরাম ভগবানে, যে কথা আজকাল দুনিয়ার বাজারে চলছে? কি চলছে?—সবাই বলছেন, ভগবানের কোন আকার নাই, কোন শক্তি নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এটা বললে সুবিধা কি জানেন? এটা বললে দুষ্ট, শয়তান, বদমায়েস ছেলেগুলো যেমন তারা মনে করে, আমার Guardian যদি একটু দূরে থাকেন, তাহলে খুব ভাল, শয়তানি দুষ্টুমি করতে খুব সুবিধা। এই সংসারেও কতকগুলো দুষ্টু, বদমায়েস

ছেলেমেয়ে আছে, তারা সবসময় মনে করেন—আমার **Supreme Guardian** যদি দূরে থাকেন, তাহলে ভাল। তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করলাম না।

চোখের সামনে দেখছি, অথচ আমি বললাম, কে তুই?—আমি তোর মা। না, আমার মায়ের কোন একটা অন্য মূর্ত্তি বসে আছে সামনে। এই কথা বললে নিশ্চয়ই মাকে সম্মান করা হল না। পিতা যদি বলেন, আমি তোর পিতা সামনে বসে আছি, কিন্তু আমি বললাম, না, আমি তোমাকে মানতে পারলাম না। আমার পিতারই প্রেতাত্মা বোধ হয় সামনে বসে আছে। তাঁকে কি সম্মান করা হল? না, অবজ্ঞা করা হল।

সেই প্রেমময় ভগবানের হাত, পা, চোখ, কাণ, নাক, মুখ সব আছে। কিন্তু অস্বীকার কেন? তিনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিগুর্ণ, নিঃশক্তিক—এসব কথা বলা মানে তাঁকে অস্বীকার করা, তাঁর অবমাননা করা। যাঁর সব কিছু আছে, তাঁকে যদি অস্বীকার করি আমি, তাহলে তাঁকে অবমাননা, অপমান করা হয়। শাস্ত্র ওটা বুঝিয়েছেন। নাস্তিকের ভগবান্ ঐরকম। সে সব মানল, অথচ কিছুই মানল না, সব অস্বীকার করে দিল—ওটা করলে ত' হবে না। যাঁরা গুরুজন, তাঁরা নিশ্চয়ই সম্মানের পাত্র, সম্মানার্হ। তাঁদের মানা হচ্ছে না, এটা দুঃখের কথা! সমাজের আজ দুরবস্থা, তাই এসব কথাগুলো এসেছে।

যে ভগবান্ থেকে অনন্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, যে ভগবান্ সেই সৃষ্টি সংরক্ষণ করছেন, পালন-পোষণ করছেন, তাদের সব ব্যবস্থাগুলো দিয়ে রেখেছেন, সেই ভগবানকে আমরা অস্বীকার করতে যাচ্ছি কেন? সেই ভগবানের সেবার কথা লেখা আছে। কিরকম সেবা করব? তাঁকে কিছু জিনিস দিলে তিনি খুশী হবেন নাকি? তাঁকে কিছু ঘুষ দিলে তিনি খুশী হবেন না? তাহলে আরাধ্যদেব কি ঘুষখোর? তিনি তাহলে কি নিচ্ছেন?—স্নেহ-মমতা। মাখন চুরির একটা ব্যাপার রয়েছে। কি চুরি করছেন তিনি? অনন্ত বিশ্বের সবটাই ত' তাঁর নিজস্ব। তাহলে তিনি আবার চুরি করতে যাচ্ছেন কেন? ঝি-চাকরাণী মাখন তৈরী করছে, সেটা খাচ্ছেন না কৃষ্ণ। এজন্য মা যশোদা কি করছেন?—নিজহাতে দুধ থেকে দই, ক্ষীর, সর, নবনী তৈরী করতে লাগলেন। তা তিনি (কৃষ্ণ) যদি তাঁর উদ্দেশ্যে তৈরী যে জিনিস, সেটা যদি গ্রহণ করেন, তাহলে কি তিনি চুরির দায়ে পড়বেন? তাঁর জন্য ত' করা হয়েছে। অনন্ত এ বিশ্বে যা কিছু আছে, সবই ভগবানেরই—সেই কথাই বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে বলছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

এ জগতে সবকিছু ভগবানেরই দেওয়া। সেই ভগবান্ কি বলছেন?—

তোমার জন্য যতটুকু, ততটুকু তুমি নাও, তার বেশী নিও না, তার বেশী তুমি আশা করো না। ক্ষতি হবে তোমার। সবটা ত' বিবেচনার কথা। সেই স্নেহময়, প্রেমময় ভগবান্ আমাদের অসুবিধা রেখেছেন কোথায় ?—তিনি আমাদের কোনও অসুবিধা রাখেন নাই। তাঁকে বলছেন,—সর্ব্বশক্তিমান, অনন্তশক্তিমান্ ভগবান্। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি—তিনি নাকি নিঃশক্তিক। শাস্ত্রে ভগবানের শ্রীনাম এবং স্বয়ং ভগবান্ দুইই এক—**Identical** বলছেন। কিরকম ব্যাপার ?—ভগবান্ আমার সামনে হাজির হচ্ছেন না, কিন্তু আমি যদি ভগবানের নাম কেঁদে কেঁদে জপ করি, তাহলে ভগবান্ আমাকে দর্শন দেন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে। নামী পরব্রহ্ম ভগবানকে পেতে গেলে নামের মাধ্যমে যেতে হবে—এটা তাঁরই শিক্ষা।

বাচ্য ও বাচক দুটী শব্দ আছে। নামব্রহ্মের আরাধনার দ্বারা নামী পরব্রহ্ম ভগবানের সাক্ষাৎকার, দর্শনলাভ—একথা বলা আছে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবই তাঁর সঙ্গে সমান। এটা আমাদের বুঝতে হবে। সেই ভগবান্ ঠুঁটোরাম নন, তাঁর হৃদয় আছে, স্নেহ-মমতা আছে, অন্তঃকরণ আছে।

দুর্ব্বাসা ঋষি যখন কিছু দোষ-ত্রুটী করে ফেললেন অম্বরীষ মহারাজের কাছে, তখন ভগবান্ শিক্ষা দেবেন জগৎকে কাকে দিয়ে ?—তাঁর নিজজনকে দিয়ে। এখানে দুজনেই—দুর্ব্বাসা ঋষি এবং অম্বরীষ মহারাজও বৈষ্ণব। কিছু যেন দোষ-ত্রুটী হয়ে গেল। দুর্ব্বাসা ঋষির পিছনে সুদর্শন চক্র ছুটছে। শিবলোক, ব্রহ্মলোক, কোন জায়গায় ঠাঁই পেলেন না তিনি। সবাই চক্রকে নমস্কার করছেন। তখন দুর্ব্বাসা বললেন,— আপনারা আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না ?—বললেন, না। শেষকালে হাজির হয়েছেন ভগবানের কাছে বৈকুণ্ঠে। তিনিও রক্ষা করছেন না। কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন তিনি। তুমিও আমাকে রক্ষা করতে পার না ? বললেন, না। এ অস্ত্র ত' তোমারই। বললেন,— হ্যাঁ, আমি আমার ভক্তদের রক্ষার জন্য রেখেছি। তুমি সেই ভক্তের চরণে অপরাধ করেছ, সুতরাং এখন আমার হাতের বাইরে। এখন আইন মোতাবেক কাজ হবে। তোমার চক্র তুমি বন্ধ করতে পারবে না ?—কি উত্তর দিয়েছেন ভগবান্ সেখানে ?—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ আমাকে ছাড়া কাউকে জানেন না, আমার ভক্ত আমাকে ছাড়া কাউকে জানেন না, আমিও আমার ভক্ত ব্যতীত কাউকে চিনি না। বর্ত্তমানে দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ সম্ভব নয়। কেন ?—

ভক্ত আমার হৃদয়টা কেড়ে নিয়েছেন। কোন্ হৃদয় দিয়ে আমি তোমাকে দয়া করব ? বর্ত্তমানে আমি হৃদয়হীন—Heartless। হৃদয় থাকলে তবে ত' দয়া করব, স্নেহ-মমতা দেখাব। সুতরাং আমার পক্ষে অসম্ভব তোমার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তখন দুর্ব্বাসা বললেন,—প্রভু! তাহলে আমার কোন উপায় নাই ?—হ্যাঁ, উপায় একটা আছে। কি উপায় বলে দিন।

কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ??

যেখানে তুমি অন্যায় করেছ, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি ক্ষমা চাও, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুর্ব্বাসা তখন আবার অম্বরীষ মহারাজের নিকট ফিরে গেছেন। সব ব্যবস্থা ত' হয়ে গেছে। তা যিনি সকলের উপরওয়ালা, তিনি ব্যবস্থা সব দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমাদের একটু আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেটুকু ক্লেশ স্বীকার করতে হবে আমাদের সাধন-ভজনে। অন্য কোন উপায় নাই।

এইটা কর, আর ঐটা করো না—এ দুটো আমাকে সমানভাবে মানতে হচ্ছে। করবে না কোন্টা ?—'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য'—দুঃসঙ্গ ছাড়, সাধুসঙ্গ গ্রহণ কর—'সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—ভাগবতের কথা। এ দুটো আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে, তা না হলে তত্ত্বদর্শন লাভ হয় না। শাস্ত্রে যত কথা আছে, সব কথাগুলো তিনটে বিষয়কে কেন্দ্র করে—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত—সকলের মধ্যে এই তিনটে বিষয় নিয়ে deal করা হয়েছে। সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয় - সেই ভগবানকে পাওয়ার উপায়, আর প্রয়োজন - ভগবৎ প্রেম-প্রীতি। সব জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করে আমাদের একটা তত্ত্বদর্শন লাভ করতে হবে। সবথেকে শ্রেষ্ঠ কি ব্যাপার ?—ভগবানকে লাভ করা। যে বিধি-ব্যবস্থাগুলো আছে, তার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে। চেষ্টা করলে অসম্ভব কিছু নয়, সবটাই সম্ভব। কিন্তু তার ভিতরে আছে ভগবৎকৃপা। ভগবানকে জানবার, বুঝবার যে চেষ্টা, তাকে বলে সাধন। আর ভগবৎকৃপা হল প্রয়োজন। এ দুটো যখন যোগযুক্ত হয়, তখন সাধনে সিদ্ধিলাভ। শাস্ত্র বুঝিয়েছেন এটা। বিনা কৃপা ছাড়া সাধনে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কিন্তু চাই ত' পাশাপাশি দুটোই। দুটো না হলে হচ্ছে না। আমি নিজচেষ্টাদ্বারা জেনে নেব, হবে না কোনদিন।

আপনারা জানেন, রাবণ স্বর্গে সিড়ি বাঁধছিলেন। বহুদূর বাঁধার পর সব হুড়্মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়ল। এটা আরোহবাদ। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অবরোহবাদ অর্থাৎ ভগবৎকৃপা। তার দ্বারা যেটা সম্ভব হবে, সেটা চিরস্থায়ী। সেইকথা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রাকৃত জগতের অহঙ্কার, মান-অভিমানের দ্বারা আমাদের

প্রাপ্তি নাই তত্ত্ববস্তু। কিন্তু ভগবৎকৃপাপ্রভাবে, গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হচ্ছে। ভক্তের জন্য সরাসরি ভগবান্ কোথাও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, কিন্তু যেখানে ভক্ত Certificate দিচ্ছেন, সেখানে ভগবান্ ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছেন।

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

সেখানে **Recomendation** এর কথা আছে। তাহলে আমাকে দুই স্থানে প্রার্থনা রাখতে হচ্ছে। ভক্তকে কি বলা হচ্ছে?—বৈষ্ণব ঠাকুর! তুমি তোমার ভগবানকে বলে দিও, তিনি যেন আমাকে একটু দয়া করেন, কৃপা করেন। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে॥" আবার ভগবানকে যখন বলছেন, তখন – "তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া। তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি, পাব তব পদছায়া॥" কাকেও বাদ দিয়ে ত' কেউ নয়। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্" —এখানেও সেই কথা বলা হচ্ছে। সব জিনিসটা সাধন-ভজনের অন্তর্গত।

আজ জন্মাষ্টমী। প্রার্থনা রাখতে হবে গুরু-বৈষ্ণব-চরণে। তাঁদের আশীর্ব্বাদে, তাঁদের শুভেচ্ছায় আমাদের ভগবদ্ভক্তি লাভ হবে এবং অন্তিমে আমরা ভগবৎসেবা লাভ করে ধন্য হব। সাধক-সাধিকার অধিকার অনুসারে তাঁরা সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ অবস্থা কি?—এই জীবন বেরিয়ে গেলে পরে ভগবানের রাজ্যে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎসেবা লাভ। এটা মানুষের চরম সাধনার ফল। এর থেকে ভাল কিছু নাই।

ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব—এটা একটা অবাস্তব জিনিস। ব্যাপারটা তা নয়। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে তাঁর কাছে থাকতে হবে। সারূপ্য—তাঁর সমান রূপ লাভ হবে; সামীপ্য—তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে হয়; সার্ষ্টি—ভগবৎকৃপায় ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ; সালোক্য—সমান লোকে বাস। তা না হলে সেবা হয় না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব—এই যে ভাবটা, এটা নাস্তিকতা। ঠিক নয় এটা। সেবা করে ধন্য হব। আমরা চিনি খাব, না চিনি হব? উত্তর—চিনি খাব, অর্থাৎ সেবাসুখাস্বাদন করার কথা বলছেন। চিনি হয়ে গেলে কে কার আবার! আমি কৃমি হই, আর বিষ্ঠা হই, তাতে কোন তফাৎ নাই, সেবাসুখাস্বাদন ও সাধন-ভজনের কথা বলছেন। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব না আমরা, ভগবান্ হয়ে যাব না আমরা। আজকাল আপনারা দেখছেন

ভগবানের ছড়াছড়ি। ওটা হওয়া উচিত নয়। ভগবানের সেবা করতে চাই, সেবায় ধন্য হতে চাই। ভগবান্ হয়ে গেলে ত' ত্রিপুটীবিনাশ হয়ে গেল। সেবা করে আমরা ধন্য হতে চাই—এই শিক্ষাই রয়েছে শাস্ত্রে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুর কৃপা

সত্য যেখানে দীনভাবাপন্ন হয়, সেখানে ততই মিথ্যা হয় রাজকীয়। আমাদের মানবজীবনে তাই যে মিথ্যা প্রতিফলিত হচ্ছে অহরহ। মানুষ জন্ম নিয়েছে শুধু কি আহার-নিদ্রা-মৈথুনের জন্য ?—না, তার পরেও কিছু আছে—যা আমাদের সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রথমেই আমাকে জানা দরকার—আমি কে ? কেন আমি এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছি ? আমি কোথায় ছিলাম এবং কোথায় থাকব ? কোথায় আমার বাসস্থান, সেটা অবশ্যই জেনে নিতে হবে। সেটা কিভাবে ?—শ্রীগুরু-প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে এবং তাঁর নির্দ্দেশিত জ্ঞানের আলোকপথে চলতে হবে। শ্রীগুরুই আমাদের আপন জন। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি সর্ব্বদা মঙ্গল হাতে আমাদের রক্ষা করছেন। তাঁকে দেবতাজ্ঞানে দেখতে হবে। তিনি বৃহৎ বটবৃক্ষ, আর আমরা তৃণাদপি ক্ষুদ্র গুল্ম। তাঁর করুণা আমাদের রক্ষাকবচ। তাঁর প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র আমাদিগকে করছে সঞ্জীবিত। মূলাধার উঠছে কেঁপে, কূটস্থিতে আলোর রেখা দেখা দিয়ে আমাদের (আমার) সকল যন্ত্রণার হচ্ছে অবসান। শ্রীগুরু আমার সব ধ্যান-জ্ঞান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-মান। তিনি আমার সম্পত্তি জ্ঞান করতে হবে।

সকলের আরাধ্য যে দেবতা, পরমব্রহ্ম সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজবক্ষে গুরু-পদচিহ্ন বহন করে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন—দেখ, আমা হতে শ্রীগুরু বড়, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম কেমন বক্ষে ধারণ করেছি। কত সুন্দর তুলনা দিয়ে করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এর কোন তুলনা হয় না। কোন কিছুতেই মাপা যায় না শ্রীগুরুর করুণা।

এই দেহ একটী নৌকা-স্বরূপ। আমার আমি তার যাত্রী। আমার এই আমিটি শ্রীভগবানের অংশ হতে সূক্ষ্মশক্তি। এই শক্তিকে জাগরিত করতে হলে শ্রীগুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা জাগাতে হবে। আমার কাম্য ধন, জন, সম্পত্তি নয়। নয় আমার পুণ্যফল। পুণ্য নিয়ে আমার কোন দরকার নাই। পুণ্য নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কোন বাসনাও নাই। কি হবে ওতে ? সেখানে পুণ্যের

সময়সীমা অতিক্রম হলে আবার আমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে। তাই দরকার আমার পরমেশ্বরকে। তাঁকে জানতে পারলে, তাঁর সেবাধিকার লাভ করলে তাঁর কৃপায় তাঁরই পদতলে বরাবরের স্থান করে নিতে পারা যায়। এটাই হল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা।

আমাদের চাই নিষ্ঠা ও ভক্তি। আমরা স্ত্রীকে, সন্তানকে যতখানি ভালবাসি, পিতামাতাকে করি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বন্ধুকে-করি আপনজন, তেমনই ভগবানকে সব থেকে বেশী দিতে হবে শ্রদ্ধা, সখ্য, বাৎসল্য। আপনজন হতেও তিনি আপনজন জ্ঞান করতে না পারলে তাঁর করুণা হতে বঞ্চিত হতে হবেই। সরল বিশ্বাস ও ভক্তিদ্বারা তাঁর আরাধনা জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য।

জীবের একমাত্র সম্বল ঈশ্বর। চোখের সামনে যা কিছু ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সবই সেই ঈশ্বরের দান। তাঁর কাছ থেকে নিয়েই আমরা আমার আমার করে এত হানাহানি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে সময়কে অযথা নষ্ট করছি। তাই যাতে সেই মহামূল্য সময়ের অপচয় না হয় সেদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, অন্তরের দেবতা শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় ও করুণায়। যা কিছু সময়-অসময়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জ্ঞান, জপ-তপ সবই সেই পরমপিতা শ্রীগুরুর কৃপা। তাই যদি হয়, তবে কেন বৃথা বাক্যব্যয়, সময়ের অপচয়। তাঁর করুণা যদি দরকার, তাহলে তাঁকেই সর্ব্বদা মনের মধ্যে রেখে তাঁর কাছে দীন হয়ে কৃপা ভিক্ষা ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। জ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা ও পাওয়া ; বিজ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন অনুভূতি এসেছে। শাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কোন বিরূপ মন্তব্য করা কখনই উচিত নয়। যেমন দুধ না খেয়ে দুধের স্বাদ বুঝানো যায় না, সমুদ্রের জল মুখে না দিলে বিস্বাদকে স্বাদে আনা যায় না, আগুনে হাত না দিলে তার তাপ বুঝানো যায় না, তেমনই ঈশ্বরকে না জেনে তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলতে চাই, সবই হয় ভুল, ভয়ানক দোষ-ত্রুটী এবং মহা অপরাধ। ঈশ্বরকে জানতে হলে চাই নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, কঠোর সাধন। তাঁকে জানা কি এতই সহজ ?

এই বিশ্ব মায়াতে ভরা। সবই আছে অথচ কিছু নাই। মায়াবদ্ধ জীব আমরা, তাই অহং-এ সর্ব্বদা মত্ত হয়ে আছি। দেবী দুর্গা তাঁর দশভুজা রূপ নিয়ে মায়ার জালে আবদ্ধ জীবকে একাধারে শাসন ও স্নেহ করছেন। তাঁর করুণা কত অপার একবার আমরা ভেবেও দেখি না। তাঁর দশভুজ ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া সাধকের সিদ্ধিলাভে সহায়তা করে। উদ্যোগ, অবধান, সংযম আর ইন্দ্রিয়-দমনদ্বারা সাধক যে দ্বীপ রচনা করেন, প্লাবন তাকে ধ্বংস করতে পারে না। তাই চাই নিষ্ঠা এবং চেষ্টা। জয় অবশ্যম্ভাবী। এ সবেরই মূলে হচ্ছে শ্রীশ্রীগুরুর কৃপা।

—ডাঃ **শ্রীগৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী,** ফরাক্কা ব্যারেজ (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে বৈশাখ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৯৯ (ইং ৩০।৬।৯২) মঙ্গলবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১৩৯৯ (ইং ১০।৭।৯২) শুক্রবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৫ই আষাঢ়** (ইং ৩০।৬।৯২), মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **১৬ই আষাঢ়** (ইং ১।৭।৯২), বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৭ই আষাঢ়** (ইং ২।৭।৯২), বৃহস্পতিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৮ই আষাঢ়,** ৩রা জুলাই শুক্রবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **২১শে আষাঢ়** (ইং ৬।৭।৯২), সোমবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই মঙ্গলবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **২৫শে আষাঢ়,** (ইং ১০।৭।৯২), শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে "সাধারন-সম্পাদক" **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ৩০ ত্রিবিক্রম, সঙ্কর্ষণ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৯৯, ইং ১৫/৬/৯২ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-স্তোত্রম্

[উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে]

[ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ।
প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃ পরীত্য পিতামহঃ॥ ১৩॥
আনন্দসিন্ধুসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্।
স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগদ্গদম্॥ ১৪॥]

[কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আত্ম-স্বরূপ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবানকে গদ্গদ-স্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ১৩-১৪॥]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্রম্

১। বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥ ১৯ ॥

(হে ভগবন্ !) সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল বিষয়ানন্দ-কণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

১। গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্মন্নমোঽস্তু তে।
ত্বন্মায়য়া মোহিতোঽহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥ ২১ ॥

হে ত্রিগুণাত্মন্ ! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত ; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

৩। নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ।
দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥ ২৬ ॥

প্রভো ! আপনি অখিল দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্য-স্বরূপ ; অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥ ২৬ ॥

৪। জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ।
জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥ ২৭ ॥

আপনি জরা-মৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী ; আপনাকে নমস্কার। মনীষিগণ আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময়, মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ২৭ ॥

৫। প্রপন্ন-মৃত্যু-নাশায় সহজানন্দরূপিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥

হে দেব ! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥ ২৮ ॥

৬। নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম।
নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ সান্দ্রসুধৌঘসান্দ্র ॥ ৩৬ ॥

দেব ! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নাথ ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশুস্বরূপ ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

৭। নমো নমঃ কম্পনদূরভূত, দুষ্প্রাপ-কামপ্রদ-কল্পবৃক্ষ।
দীনাশরণ্য প্রণতৈকদুঃখ-সংঘোদ্ধৃতৌ নিত্যসুবদ্ধপক্ষ ॥ ৩৭ ॥

হে দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত; অতএব আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥ ৩৭ ॥

৮। প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে।
কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥ ৩৮ ॥

নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণা-কটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩৮ ॥

[স্তুত্বেত্থং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ সঃ পিতামহঃ।
জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা ॥ ৪০ ॥]

[পিতামহ ব্রহ্মা সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥]

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্রম্

৯। পাদাম্ভোজ-প্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে।
অনন্ত-বক্ত্র-নয়ন-শ্রোত্র-পাদাক্ষি-বাহবে ॥ ৪৩ ॥

দেব! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন। আপনার চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত-পদাদি অনন্ত; আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥

১০। নমোঽনাদি-মহামূল-তমস্তোমৈকভানবে।
ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে ॥ ৪৪ ॥

প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম; আপনিই ঋক্, যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

১১। ফণা-মণিকণাকার ক্ষিতি-মণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রভো! আপনি নিজ মস্তকে স্বীয় ফণাস্থিত মণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন। আপনি কালাগ্নি রুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

১২। ভোগতল্পফণাচ্ছত্র-মধ্যসুপ্তায় তে নমঃ।
মহার্ণব-জলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে ॥ ৪৬ ॥

দেব! প্রলয়কালে মহার্ণব-জল বর্দ্ধিত হইলে, যে-সময় তদ্দ্বারা জগত্রয় প্লাবিত হইয়া একীভূত হয়, সে-সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন; অতএব অনন্ত-মহিম আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

১৩। ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত।
ফণামণিগণব্যাজ-সম্ভৃতাখিলভৌতিক ॥ ৪৭ ॥

হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিস্থলে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পদ্ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

১৪। ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো।
অত্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাদ্যাস্ত্বন্নিমিত্তকাঃ ॥ ৪৮ ॥

নাথ! আপনি সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা। একমাত্র আপনিই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন; প্রভো! আপনি অস্মদাদি সকলেরই মূল কারণ ॥ ৪৮ ॥

১৫। এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে।
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি ॥ ৪৯ ॥

ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্রে যাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন; কেবল অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃই তিনি পৃথক্-রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

১৬। শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ চ্ছাদকো ভবান্।
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥ ৫০ ॥

আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব, হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫০ ॥

প্রশ্নোত্তর

অসৎসম্প্রদায় ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। ভারতীয় বেদানুগব্রুব বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিদেশীয় তৎসমকক্ষ আধ্যক্ষিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি?

"অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক-মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (**Materialism**), স্থিরত্ববাদ (**Positivism**), নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ (**Secularism**), নির্ব্বাণসুখবাদ (**Pessimism**), সন্দেহবাদ (**Scepticism**), অদ্বৈত (সর্ব্বব্রহ্ম) বাদ (**Pantheism**), নাস্তিক্যবাদ (**Atheism**) রূপ নানাপ্রকার বাদ (**Ism**) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থানপূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (বা **Theism**) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম (**Christianity**), মুসলমান-ধর্ম্ম (**Mohamedanism**) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৩

২। কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলা যায়?

"যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিবেন না; সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৩। জড়বাদিগণের ধর্ম্ম কিরূপ ?

"জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯।১২

৪। ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি ?

"জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন,—'যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব।' * * * ভারতবর্ষে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচু (**Yangchoo**), গ্রীসদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (**Leucippus**), মধ্য এশিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্ (**Sardanapalus**), রোমদেশে লুক্রিসিয়স্ (**Lucretius**), এইরূপ অন্যান্য অনেকদেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাক (**Von Holbach**) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে 'ধর্ম্ম' বলা যায়। * * * গ্রীসদেশীয় প্লেটো (**Plato**) ও আরিষ্টটল্ (**Aristotle**) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (**Gassendi**) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স দেশে ডিডেরো (**Diderot**) ও লামেট্রি (**La Mattrie**) ইঁহারা নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোঁৎ (**Comte**) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি স্থিরত্ববাদ (**Positivism**) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞানদ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (**Supreme Fetich**) ; দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (**Supreme Medium**) ; মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (**Supreme Being**)। হস্তে শিশু, এরূপ একটী স্ত্রী—মূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও

সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। ** ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদরূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কোঁৎএর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (**Secularism**) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল্, লুইস্ (**Lewis**), পেন্ (**Paine**), কারলাইল্ (**Carlyle**), বেন্থাম্ (**Bentham**), কোম্ (**Combe**) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (**Holyoake**) এক বিভাগের কর্ত্তা-বিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (**Bradlaugh**) সম্পূর্ণ নাস্তিক।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

৫। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি?

"স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নামদ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।" —তঃ বিঃ, ১ম অনু, ৯-১২

৬। নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত?

"ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটী শুনিবামাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটী আদর করে।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৭। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে?

"পাশ্চাত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেইসব দেশে সুতরাং টিণ্ডল্, হাক্সলি, ডারউইন্ প্রভৃতি পণ্ডিত-মধ্যে পরিগণিত। **পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী** করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্". "অপরস্পরসম্ভূতম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ—এই সকল যে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত?

"কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল,—'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাকড় বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা

হইতেছে ?' ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ্; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—'ওহে, আমার ভুল হইয়াছে; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।' নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৯। সন্দেহবাদের গতি কি ?

"সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে; যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

১০। নবীন নাস্তিকগণের মৌলিকতা কতটুকু ?

"নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন-মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র; নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৭

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

কৃষ্ণ কি বস্তু, কে কৃষ্ণের উপাসনার যোগ্য, কিরূপে কৃষ্ণের উপাসনা হয়—এ বিষয় যাহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ে আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মুখ্যার্থ না বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় —

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥

—ইহাই বুঝায়। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ?"

"কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের ঘর"—এইরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব। যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব

লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানাকার্য্য পড়িয়া যায়,—দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে; তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-সেবাসৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই। গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই—এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানব-কল্পিত নামে চিদচিৎ এর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্‌দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দর-রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্যলাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটী পাঁচটী তত্ত্ব নহেন। ভগবৎপ্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবানকে নিত্য-চিদ্‌বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না, প্রীতির আংশিকত্ব-হেতু ভগবদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্য লাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস; তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাশ্রম লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবাবিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য থাকিব—কৃষ্ণকে পূর্ণসেবা লাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না",—ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয়মাত্র।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বসুখ-প্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সমৎসর-বিধায় বৃষাকপিতনয়া বা তাঁহার গণ কখনও তাহা বহুমানন করেন না। শ্রীবার্ষভানবীর গণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পরিপূর্ণসেবালাভে সমর্থ হওয়া যায়, সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য্য-ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবী

তদনুগজনকে নির্ব্যলীকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাহাকে কৃষ্ণ-সেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায় 'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণ'কে। তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটবে না, —আশা পূরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধান করাইতে; যে দিন আমরা আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়সকলের চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৎপর করিতে পারিব, যে দিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের' ইহাছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা-শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে, সেইদিনই আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে। তখন শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতাক্রমে শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে. সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক, সব ঠিক; আমি বেঠিক, সব বেঠিক।

শিক্ষাষ্টক

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চারি প্রকার। নাম-সঙ্কীর্ত্তন, রূপ-সঙ্কীর্ত্তন, গুণ-সঙ্কীর্ত্তন ও লীলা-সঙ্কীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদিত হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলারূপে পরিণত হয়। অতএব নাম ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্মা প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নামসমূহে বহুবিধ পাপনাশক ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয়

নামগ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এ সমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার মধুমাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না!" নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে, জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগ-শাস্ত্রনিন্দা, হরি-নামে অর্থবাদ, নাম-বলে অসৎ প্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব—এই কয়েকটী অপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরাপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নামগ্রহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্য-সঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয়কালেই তদিতর-বিষয়িণী অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যমতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সে সমুদায়ই বিধি-নির্দ্দিষ্ট পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর-অভাবে তদপরাধ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—'হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুগুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়জগতে তৃণ অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অসুন্দর হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণুরূপ জীবের এই জড়জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চিদভিমানই ন্যায়পরা, জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংছেত্তৃ-কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা ও অপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়াযুক্ত

থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবে স্বধর্ম্মরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। নামগ্রহীতা স্বয়ং জড়াভিমানজনিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। ভগবৎকৃপায় যে-সকল আধিকারিক সত্বগণ ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটী লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়-যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণ-যুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃততাই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমপ্রদত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ধনই—ধন, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিপোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্ম্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা। 'সংসারদুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপলাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াসলভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ 'জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি'— এইমাত্র বাসনা করিবেন। অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য? না। ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম

দাস্যরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! তোমাকে আমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।'—এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত

মুখবন্ধ ও সূচনা

মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধি এবং পরীক্ষিৎ-সভায় শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তথাপি জৈব-জগতের মঙ্গলের জন্য মহাভারতের পঠন-পাঠন বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এমনকি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকট-কালেও অবস্থার আনুকূল্য-বিচারে মহাভারতাদির পঠন-পাঠন হইত। শ্রীশুকদেব-শৌনকাদি ঋষিসকল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোত্তম অধিকারী মহাপুরুষগণের নিমিত্তই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকেই উন্নততম গ্রন্থরাজ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বর্ণনা ও প্রমাণ করিয়াছেন।

ভক্তরাজ জনমেজয় তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞাত থাকিয়াও তিনি সর্প-নিধন-যজ্ঞের সময় মহাভারতের অধ্যয়ন প্রচারই মঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া ইহার পঠন-পাঠন প্রচলন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হিংসা-দ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর পারমহংস্য-সংহিতা বলিয়াই অনাদিকাল হইতে উপাসক-সম্প্রদায়ে আদৃত হইয়া আসিতেছে। পরমবৈষ্ণব-রাজা জনমেজয়ও জানিতেন যে, সকলেই ইহার অধিকারী নহে এবং উক্ত যজ্ঞেও ইহার আলোচনা সমীচীন নহে। আমরাও এস্থলে সর্ব্বোত্তম ইতিহাস ও পঞ্চমবেদ-স্বরূপ মহাভারতের প্রচার-কামনায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি।—

শ্রীসূত গোস্বামীর নৈমিষারণ্যে উপস্থিতি

অতি প্রাচীনকালে নৈমিষারণ্য-তীর্থে শৌনকাদি ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানপূর্ব্বক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া

কথাপ্রসঙ্গে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে লোমহর্ষণসুত পৌরাণিক সৌতি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবা সৌতি তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক তপস্যা-কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা মাননীয় অতিথির যথাবিধি পূজার পর বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদানান্তে নিজেরাও স্ব-স্ব-স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট-স্থানে সুখে উপবিষ্ট হইলে ঋষিগণ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কোথা হইতে আগমন এবং কোন্ কোন্ তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীসূত শান্ত-প্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্প-নিধন-যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করি। তথা হইতে বহির্গত হইয়া বহুতীর্থ দর্শন ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করত পরিশেষে কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রামস্থল স্যমন্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনের নিমিত্ত এই পবিত্রক্ষেত্রে আসিয়াছি। সম্প্রতি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কথা, অথবা ঋষিগণের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কোন্ বিষয় বর্ণনা করিব, অনুমতি করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবান্ বেদব্যাস-মুনি যে মহাভারতীয় ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, সুর ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহার শ্রবণে অশেষ প্রশংসা করেন, আমাদের সেই বিষয় শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে; কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও বেদাদি নানাশাস্ত্রের সারসঙ্কলন করিয়া রচিত এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতে অবশ্যই মৃত্যুভয় নিবারিত হইবে।

মহাভারতের আলোচ্য বিষয়

শ্রীসূত গোস্বামী কহিতে লাগিলেন,—যিনি অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি-পুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জীবের স্রষ্টা ও পালয়িতা শাস্ত্র যাহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত যাজ্ঞিকগণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভাশায় যোগি-তপস্বি-মুনিগণ শতসহস্রবর্ষ একান্তমনে ধ্যান, মনন, তপস্যা, কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তৎপর, বিরক্তগণ মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ব্বক যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগান্তর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন—এইরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা,

পরমধন সেই পরতত্ত্ব লাভের জন্য লোকে অতি দুষ্কর কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই অনাদি অনন্ত চরাচরগুরু শ্রীহরির চরণে প্রণতি জানাইয়া বেদব্যাস-প্রণীত পরম-পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। এই বিশাল বিশ্বে মহাত্মগণ ঐ ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন, বলিতেছেন ও ভবিষ্যতেও বলিবেন। জ্ঞানের পরিসীমা বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে লৌকিক আচার-ব্যবহারের রীতি নীতি ও নিখিল শাস্ত্রের অভিমত স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা ভগবদ্-গুণগাথা-সূচক সুচারু শব্দ ও রমণীয় বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত। এজন্য তত্ত্বদর্শিগণ মহাভারতের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীবেদব্যাসের ত্রিকালজ্ঞত্ব

সৃষ্টির আদিতে এই বিশ্ব সংসার ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল; অনাদি-অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তৎপর সায়ম্ভুব মনু, প্রচেতা, দক্ষ, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন; পরে পৃথিবী, বসু, আকাশ, দশদিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি, ও অপরাপর সকল বস্তু সৃষ্ট হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্ব সেই পরব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়, আবার যুগ-প্রারম্ভে জীবজন্তু সকল পদার্থই স্ব-স্ব আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রলয়, উৎপত্তি ও স্থিতিদ্বারা সংসারচক্র নির্দ্দিষ্টপথে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই যে জীবাদি সৃষ্ট হইল ইহাদিগের অবস্থিতি রহস্য, চারিবেদ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্রাদি—এ সকলই মহাত্মা বেদব্যাস ত্রিকালজ্ঞবিধায় যোগবলে বিশেষ অবগত ছিলেন। এই মহভারতে অশেষ ইতিহাস, বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহাভারতের একটী শব্দ, আবার কেহ বা ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্ব-সমক্ষে ইহার প্রচারে ব্রতী হন; কেহ ইহার ব্যাখ্যায় সুনিপুণ, আবার কেহ বা ইহার ধারণায় বিশেষ পারঙ্গত। শ্রীবেদব্যাস তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন।

শ্রীব্যাসের মহাভারতের লেখক অনুসন্ধান

রচনা করিবার পর কি-প্রকারে শিষ্যদিগকে ইহা অধ্যয়ন করাইবেন—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীব্যাসের প্রীতিবর্দ্ধন ও

লোকহিত-সাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতীব বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর প্রজাপতির আদেশে বেদব্যাস তৎ-সন্নিধানে প্রীতমনে উপবেশনপূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি ; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদের সার-সঙ্কলন, ইতিহাস-পুরাণের অনুসরণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণ, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছি ; ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন তাহার তত্ত্বানুন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানাদির বিবরণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি ; নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদির সংস্থান, যুদ্ধকৌশল লোকযাত্রাদির বিবরণও প্রসঙ্গক্রমে নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশ্বে ইহার একজন উপযুক্ত লেখক অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য ছাড়া কখনও মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা বৈদিক বাণী উচ্চারণ করিয়া থাক ; এক্ষণে যখন তোমার স্ব-প্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তখন ইহা কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও বিখ্যাত হইবে ; তোমায় এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন।

গণেশকে ভারতের লেখকরূপে প্রাপ্তি

ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীনন্দন গণেশকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতি-মাত্রেই গণপতি তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে গণাধিদেব! বিশুদ্ধ সমাধিলব্ধ মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি ; আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্নবিনাশন গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মুনে! যদি লিখিবার সময় লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রামলাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে বিনায়ক! কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও তাহা লিখিতে পারিবেন না। গণপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে বেদব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ গ্রন্থিস্বরূপ কূট শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এইরূপ

প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, এই ভারত-গ্রন্থে অষ্ট-সহস্র অষ্টশত এইরূপ শ্লোক আছে, কেবল শুকদেব ও আমি যাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে পারি; অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর নূতন শ্লোক রচনা করিতেন।

মহাভারতের মহিমা

প্রথমতঃ সকল লোক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মহাভারতরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপ ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে; তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোহ-তিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাস-স্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে আলোকিত ও সুপ্রকাশ করিয়াছে।

মহাভারত-বৃক্ষের বিষময় ও অমৃতফল

এই মহাভারত পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট একটী বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজ, পৌলোম ও আস্তিক ইহার মূল, শল্যপর্ব্ব অগ্রভাগ, সম্ভব পর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার কোটর, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান। যেরূপ মেঘ সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই ভারত-বৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য। মহাভারতের দুর্য্যোধন—ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল। কৃষ্ণ পরব্রহ্ম ও তদ্ভক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মহাভারত রচনার সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত প্রচার করেন। পরে সর্পযজ্ঞকালে রাজা জনমেজয় ও অপরাপর ঋষিগণ-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে মহাভারত বর্ণনার জন্য অনুমতি করায় তিনি সেই মহতী সভায় উহা কীর্ত্তন করেন। কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর

ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সরলতা, ধৃতরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সকল বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যান-ভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত-শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় মহাভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার-সঙ্কলন করেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রিয় শিষ্য-মণ্ডলীকে উহা অধ্যয়ন করান। তিনি ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারত সংহিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ গন্ধর্ব্বলোকে এবং নরলোকে শতসহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে মনুষ্য, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির ধর্ম্মাদি বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে। যিনি পরমপবিত্র পরব্রহ্ম, যাঁহার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপাদি সতত অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত এই গ্রন্থে সম্যক্-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ পরমশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক এই ভারত অধ্যয়ন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে লাভ হয়। যেরূপ দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যদেবোপাসক ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। সাত্বতগণ মহাপ্রসাদদ্বারা পিতৃ-পুরুষগণের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ভারত-সংহিতা অন্ততঃ এক চরণ পাঠ করিলেও পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে পূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তাহার সমগ্র গ্রন্থপাঠের ফললাভ হয়। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া ভগবদ্ভক্তি আচরণপূর্ব্বক অন্তিমে তল্লোকে আশ্রয় লাভ করেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

"স্বভাব যায় না মলে"

—ইহা একটী প্রবাদবাক্য হইলেও ইহার সত্যতা অনস্বীকার্য্য। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহাতে অর্পিত গুণাবলীও তাহার স্বাভাবিক গুণব্যঞ্জক হইবে, অন্যথা হইতে পারে না। যেরূপ—'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।' সর্পকে উত্তম খাদ্য দুগ্ধ সেবন করাইলেও তাহাতে তাহার বিষেরই বর্দ্ধন করা হয়।

বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে বিষময় ফল সমাজকে আক্রমণ করিতেছে তাহা অনেক মনীষীই চিন্তা করিবার অবকাশ পান কি? 'মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা'—হিতোপদেশবাক্যটীও স্মরণীয়।

বিদ্যাদান—শ্রেষ্ঠদান; কিন্তু অযোগ্যপাত্রে ইহা প্রদত্ত হইলে একলব্যের সংখ্যাধিক্য অনিবার্য্য। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্', কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহার বৈপরীত্য কেন? বিদ্যাদাতার প্রতি ছাত্রের বর্ত্তমান আচরণ বিচার করিলে ইহা ভালভাবেই বুঝা যাইতে পারে। শুধু বিদ্যালয়ে নহে, সমাজে সর্ব্বত্রই এই বৈষম্য তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। যোগ্যাযোগ্য বা পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সার্ব্বজনীনতা প্রবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ নহে কি? সংবাদপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যহ যে প্রকার **Crime** বা অপরাধের সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং অত্যুর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবন। টাইম্ বোমা, রিমোট কণ্ট্রোল, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, প্রতারণা, লাম্পট্য, শিশু ও নরনারী হরণ, ধর্ষণ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রভৃতি ব্যবহারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক ও পারমার্থিক ক্ষেত্রেও ইহার বিষময় ফল প্রকাশ পাইতেছে। দ্রোণাচার্য্য ও পরশুরাম তজ্জন্যই আপাতঃ বিচারে নিষ্ঠুরতা বা অন্যায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়া অনভিজ্ঞ জনগণ বিচার করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা যদি তখন তদ্রূপ আচরণ না করিয়া বর্ত্তমান কালের মনীষিগণের (?) ন্যায় উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাইতেন তবে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পরিস্থিতি প্রকাশ পাইত। পারমার্থিক জগতেও এবম্বিধ উদারপন্থীর আবির্ভাব উৎপাতজনক হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাই বর্ণিত রহিয়াছে—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পাঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতৈব কল্পতে॥

পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে অবস্থান করত শ্রীগুরুদেবের সংসর্গে ও শিক্ষায় শিষ্যগণের বিদ্যাভ্যাস ও চরিত্রগঠন হইত। সে প্রথা নানা পরিস্থিতিতে ও কালের বিক্রমে

বর্ত্তমানে রহিত হইয়াছে। তৎস্থলে নানাপ্রকার বিদ্যালয়, কলেজ, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তদুপরি বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার আবিষ্কারের ফলে সিনেমা, রেডিও, টি. ভি. প্রভৃতিও আধুনিককালের শিক্ষার কেন্দ্র। নানাবিধ সংবাদপত্র ও পুস্তকাদিও অপরিহার্য্য শিক্ষার মাধ্যম। পূর্ব্বাপেক্ষা অতীব ব্যাপকভাবে বর্ত্তমানে শিক্ষার বিস্তার অতি অল্প সময়েই সংসাধিত হইতেছে।

আরও লক্ষ্যিতব্য যে,—এই মাধ্যমগুলিতে যাঁহারা শিক্ষাদানে ব্রতী থাকেন, তাঁহারা যেরূপ স্বভাব বা গুণান্বিত তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগুলিও সেইরূপ গুণময় অবশ্যই হইতে বাধ্য।

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী তাহার গুণ। প্রকৃতিজাত প্রত্যেক বস্তুতেও এই তিন প্রকার গুণের বর্ত্তমানতা দৃষ্ট হয়। দেবমনুষ্যাদি সমস্ত জীবই ত্রিগুণান্বিত। এই গুণত্রয় সকল জীবে সমভাবে থাকে না। ন্যূনাধিকতা সর্ব্বত্রই প্রকাশিত। কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক গুণের অধিকতর অধিকারী। এইজন্য মনুষ্যগণের স্বাভাবিক ভিন্নতা প্রকাশ পায়। শিক্ষকমণ্ডলী বা সংস্কারকগণ যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়ও সেই প্রকার গুণময় ফল অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

সত্ত্বগুণকেই শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া সনাতনধর্ম্মগ্রন্থ বা বেদাদি সত্যজ্ঞানস্বরূপ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন তাহারই সাক্ষ্য নিত্যকাল প্রদান করিতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে এতদ্বারাই সত্ত্বগুণেশ্বর বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করিয়াছে। রজোগুণবশতঃ ব্রহ্মা ও তমোগুণান্বিত শিবকে তজ্জন্য সমপর্য্যায়ে ঋষিবৃন্দ স্থাপন করেন নাই। গীতাশাস্ত্রেও স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ (গীঃ ১৪।৬-৮, ১৮)

হে নিষ্পাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলতাহেতু প্রকাশক, নিরুপদ্রব বা শান্ত সত্ত্বগুণ, দেহী জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গদ্বারা আবদ্ধ করে। রজোগুণকে অনুরাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। সেই রজোগুণ

দেহী জীবকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। তমোগুণকে অজ্ঞানজাত সর্ব্বজীবের মোহনকারী জানিবে। সেই তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকসমূহে গমন করিয়া থাকে, রজো-গুণান্বিত লোকেরা নরলোকে স্থানলাভ করে এবং নিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে।

অতএব যাঁহারা সমাজের শিক্ষাদাতা ও সংস্কারকের পদে আসীন আছেন, তাঁহাদের স্বভাব ও গুণানুসারে সমাজ অবশ্যই গঠিত হইবে। রাজোগুণাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রবল ভোগে আসক্ত হইয়া কর্ম্মব্যতীত কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাই তাঁহারা "চাই রজোগুণ" রজোগুণ ব্যতীত দেশের কল্যাণ অসম্ভব বলিয়া প্রলাপবাক্য উদ্গীরণ করেন। বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হইতেছে ততই তাঁহারা বিপুল ভোগী হইয়া ভোগপর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা সত্ত্বগুণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া তাহার প্রতি অনাদর ও উপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের আদর্শে ও শিক্ষায় সমাজ কিরূপ ভয়াবহ ও কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে তাহার একটী বর্ণনা ও চিত্র বর্ত্তমান বর্ষের ৭ মার্চ্চ '৯২ রবিবাসরীয় ৩য় পৃষ্ঠার ৫ম কলমে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিত শ্রীযুক্তা রায় ভদ্রমহিলার খেদোক্তি হইতে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিতাপের বিষয় কি আছে?

"ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ"—এই মহাজনবাক্যের সত্যতা ইহাদ্বারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হায়! শুভাকাঙ্ক্ষী নায়কগণ, আপনারা ইহা দেখিয়াও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইতেছেন না! এবং ধর্ম্মের উৎসাদনে আগ্রহী হইয়া জনকল্যাণের নামে কি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতেছেন—তাহা একবারও বুঝিতেছেন না!

প্রকৃত ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়াছে বলিয়াই কি ভারতবর্ষে প্রতি খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল ও স্বাস্থ্যহানিকর সংমিশ্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে না? ধর্ম্মের প্রতি মর্য্যাদা না থাকায় পাপকর্ম্মের প্রবৃত্তি কি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে না? দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে গিয়া, ইহা কি একবারও চিন্তনীয় হওয়া কর্ত্তব্য নহে? কেবল দণ্ডবিধানের দ্বারা ইহার প্রতিকার সম্ভবপর হইবে কি? 'সদা সত্য কথা কহিবে', 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়', 'চুরি করা বড় দোষ', 'মাতৃবৎ পরদারেষু', 'পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'—প্রভৃতি পাঠগুলিকে বর্জ্জন না করিয়া পুনরায় শিশুপাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশ না করিলে সমাজের এইরূপ নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন হইতে কি সমাজকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে। পাশ্চাত্ত্যানুকরণে সমাজকে গঠিত করিলেই

কি শুভ লাভ হইবে ? কেবল পাশ্চাত্ত্য ভাষার প্রতি বাহিক অনীহা প্রদর্শন করিয়াই কি ভারতীয়তা রক্ষিত হইবে। বেশভূষা, আহার-বিহার, পারিবারিক-ব্যবস্থা ও ধর্ম্মচিন্তায় বর্ত্তমান ভারত কি তাহার দেশাত্মবোধকে বিসর্জ্জন দেয় নাই ? বর্ত্তমান ভারত কি প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টান্ নহে ? বর্ত্তমানে তাহার ভারতীয়তা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। ভারতবাসী বলিলে প্রকৃত ভণ্ডামী ছাড়া কিছু হয় না।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—গীতার বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উন্নতিকামী বর্ত্তমান ভারতবাসী নিজদের সন্তানগণকে খৃষ্টীয়ান্ মিশনারী স্কুলে ভালভাবে ইংরাজী ভাষা ও ভাবধারা শিক্ষা এবং বাইবেলাদি পরধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে এবং তাহাদের মুখে 'ও গড্ ! গিভ মি মাই ডেলি ব্রেড'—ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া কত না গর্ব্বানুভব করিতেছেন। জননী-গণও সন্তানগণকে "বাবা একবার টাটা করে দাও ত"—শিক্ষা দিয়া গর্ব্বিতা হইতেছেন। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—ইহা বলিতে ও বলাইতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিতেছেন। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারে তুলসীতে জল ও প্রদীপ-দান এবং তাঁহার সেবা বহুদিন হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে। শিক্ষিতা বধূর ইহাতে লজ্জা ত' হইবারই কথা ! বিদ্যালয়গুলিতে—জনগণমন অধিনায়ক হে - গীত না শিখাইয়া এই ঘোর কলির মহান্ সুযোগ বলিয়া শাস্ত্রগণ যাহা শিক্ষা দিতেছেন—সেই "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রটি একবারও সকলে গ্রহণ করিলে—সার্ব্বজনীন মঙ্গল লাভ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নৈতিক ও সামাজিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মীয় ও পারমার্থিক বিচারে আমরা কতদূর অধঃপতিত হইয়াছি তাহারও কিছু আলোচনা আশা করি সকলেই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। বর্ত্তমানকালের মনীষীবৃন্দ-পরিচালিত ভারতে খাওয়া, পরা ও থাকার, কাহারও ভাষায় বাঁচা বাড়ার প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাধিক প্রাধান্য পাইয়াছে। শারীরিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখই একমাত্র কাম্য হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা হইতেছে। প্রায় সকল পন্থীর লোক ঋষিবর্গব্যবস্থিত প্রথা বা নিয়মের উৎসাদন ও পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট। তাঁহাদের যুক্তি—কালের পরিবর্ত্তনে যুগোপযোগী ব্যবস্থার অবশ্যই আবশ্যকতা আছে। কিন্তু আমরা ভাবি না—ঋষিগণ খণ্ডদর্শী ছিলেন না। তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা ও সার্ব্বকালিক অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত থাকিয়াই সার্ব্বকালিক বা সনাতন বিধিব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই কলিকালের সর্ব্ব-

প্রকার অবস্থার জ্ঞান যে তাঁহাদের পূর্ণভাবে বিদ্যমান্ ছিল, তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। অনেক সুশিক্ষিত বলিয়া অভিমানী ব্যক্তিকে বলিতে দেখা যায়—'ভগবান্' একটী কল্পিত রেখামাত্র। তাঁহাদের এই উক্তি বর্ত্তমানে অনেকেরই রুচিকর হইলেও ইহার সত্যতা কতদূর তাহা কেহই কালপ্রভাবে বিচার করিতে অনিচ্ছুক। 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই'—এই বাক্যের সত্যতা কি সম্ভবপর তাহাও বিবেচিত হইতেছে না। জীবই শিব, মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা—প্রভৃতি বাক্যগুলির বহুপ্রকার ছলনাময় ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া বাস্তব সত্যের অপলাপ ও উৎসাদন চেষ্টাই বর্ত্তমান শিক্ষিতাভিমানী ও তথাকথিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের প্রবল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত মতবাদ শাস্ত্রীয় সৎসিদ্ধান্ত ও সত্যযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াও তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকিতে পারিতেছেন না। বদ্ধজীবের 'বিপ্রলিপ্সা' নামক ইহাই একটী দোষ। সত্যদ্রষ্টা ত্রিকালদর্শী ঋষিবর্গের উক্তি আলোচনা করিলে তাহা অনুভব করা যাইবে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকার হইবার যোগ্যতা কাহাদের তাহাও বর্ত্তমান সমাজ বিচার করিতে অক্ষম। ইন্দ্রিয়তর্পণকর উক্তি কিছু আপাতঃ দৃঢ় যুক্তিদ্বারা গ্রন্থাদিতে মুদ্রিত হইলেই তাহাকে শাস্ত্রের সমমর্য্যাদা দিতে বর্ত্তমান সমাজের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে।—ইহাই স্বভাবগত ধর্ম্ম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে

সকাতর প্রার্থনা

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

নমো নমো মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া গো তুমি।
তব পদে আমি, মাগো, বার বার নমি॥
যে তিথিতে শুভালগ্ন শুভক্ষণ গণি।
আবির্ভূত হইলেন গুরু গুণমণি॥

জীবের দুর্দ্দশা দেখি' শ্রীগৌর-নিতাই।
ব্যাকুলিত চিত্ত উভে চিন্তিত সদাই॥
কেমনে এ কলিযুগে ধর্ম্ম রক্ষা পাবে?
কলিহত জীব এবে কেমনে তরিবে??
এত ভাবি' দুই ভাই যুকতি করিল।
নিজপ্রেষ্ঠ জনে এবে পাঠাইয়া দিল॥
তাঁহাদের প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরু আমার।
কলিহত জীবে এবে করিতে উদ্ধার॥
সিংহরূপে অবতীর্ণ হইলেন এসে।
জীবগণে ছাড়ি' কলি পলায় ত্বরাসে॥
হেথা আসি' করিলেন সিদ্ধান্ত আশ্রয়।
তাঁহার কৃপায় কলি করিবারে জয়॥
হরিনাম মহামন্ত্র তরীখানি লৈয়া।
বিশাল বিক্রমে চলে সুনাবিক হৈয়া॥
ডাক দিয়া বলে সবে আয় পাপী আয়।
এই নৌকা 'পরে সবে উঠহ ত্বরায়॥
তাহলে কলি হইতে নিস্তার পাইবি।
আর না দিবেন কষ্ট সেই মায়াদেবী॥
নামের প্রভাবে কলি দূরেতে পালাবে।
মায়াদেবী সবে মুক্ত করিয়া যে দিবে॥
সেই ডাক শুনি' তবে আসে জীবগণ।
অভয় চরণে সবে লইতে শরণ॥
অন্ধ, খঞ্জ, দীন, দুঃখী যত জীবগণ।
কত যে আসিল ধেয়ে না যায় গণন॥
কত যে পাষণ্ডী তুমি করিলে দলন।
তারাও তোমার পদে লইল শরণ॥
হরিনাম মহামন্ত্র সবাকারে দিলে।
কলির কবল হ'তে উদ্ধার করিলে॥

সকলে ত' উদ্ধারিল নামের পরশে।
একা আমি পড়ে রৈনু করমের দোষে ॥
কত জন্মের পাপ মোর আছে সঞ্চিত।
সেই কথা ভেবে মোর প্রাণ ব্যাকুলিত ॥
মায়ার যতনে আর পাপের পীড়নে।
অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি মনে ॥
এ সব যন্ত্রণা মোর কবে দূর হবে।
তুমি ছাড়া এ বিপদে কেবা উদ্ধারিবে ??
কোথা আছ দয়াময় এস ত্বরা করি'।
এ সঙ্কটে দেখা দাও মোরে কৃপা করি' ॥
আমার হৃদয়ে বসে থাক সর্ব্বক্ষণ।
আমি যেন পথহারা না হই কখন ॥
তোমার দেওত' নামে রুচি যেন হয়।
নাম করিবার শক্তি দাও গো আমায় ॥
শ্রীনামেতে হয় যেন সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নামের প্রভাবে যেন হয় দুঃখ নাশ ॥
মতি যেন থাকে মোর বৈষ্ণব চরণে।
তাঁরা যেন দাসী ভাবি' রাখেন চরণে ॥
তাঁদের কৃপায় যেন শুদ্ধ হয় মন।
তবে ত' পাইব তব শ্রীচরণে স্থান ॥
তোমার করুণা বিনা গতি নাহি মোর।
জন্মে জন্মে পাই যেন চরণ তোমার ॥
তুমি মোর পিতা, মাতা, হও পরিত্রাতা।
তুমি ছাড়া আর মোর কেবা আছে কোথা ??
তোমার চরণ চেয়ে বসে আছি আমি।
এইবার এ অধমে ত্রাণ কর তুমি ॥
কে আর করিবে দয়া পতিতা দেখিয়া ?
পতিতা দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া ??

আমার দুর্গতি দেখি' দয়া না করিলে।
কেবা উদ্ধারিবে মোরে এ বিপদ কালে ??
অধমতারণ নাম তোমার হইল।
তাহা শুনি' এ অধমা শরণ লইল॥
অবশ্য রক্ষিবে তুমি এই আশা করি'।
বসে আছি আমি প্রভু তব পদ ধরি'।
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিতা তুমি না পাইবে আর॥
মোরে যদি তুমি প্রভু কৃপা না করিবে।
পতিতপাবন নামে কলঙ্ক রটিবে॥
তব শ্রীচরণ আমি হৃদয়ে ধরিব।
নিত্যদাসী হয়ে সদা চরণ সেবিব॥
তাহলে ত' মায়াদেবী অবশ্য ছাড়িবে।
পরিত্রাণ পাব আমি সব দুঃখ যাবে॥
আমার এ আশা তুমি অবশ্য পূরাবে।
দাসী ভেবে শ্রীচরণে স্থান তুমি দিবে॥
আর এক নিবেদন তোমার চরণে।
রতি-মতি থাকে যেন বৈষ্ণব চরণে॥
অপরাধ না হয় যেন তাঁদের চরণে।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দাস হই সর্ব্বক্ষণে॥ (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীযুক্তা ঊষা দেবী,** মেদিনীপুর

আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীগুরুদেব

প্রপঞ্চে মায়ামুগ্ধ জীবসকলের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই পাপমলিন হৃদয়ের কুহক-মুক্ত হইয়া গুরুবস্তু ভগবান্, শ্রীগুরু এবং সৎশাস্ত্রে বিশ্বাসী হইতে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। যে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয় মলিন থাকে তাবৎকাল সৎশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে না; এবং আত্মকল্যাণ কামনায় সদ্গুরুর শরণাগত হইতে পারি না। পূর্ব্ব

পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মের পুঞ্জিত-সুকৃতি না থাকিলে শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তসঙ্গ অসম্ভব। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার মুখপদ্মনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমপন্থায় জীব প্রেমভক্তি লাভ করিবার উপযুক্ততা অর্জ্জন করেন—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

আমরা যদি একান্তভাবে ভক্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে চাই এবং তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি, তবে ইহজন্মে তাঁহাকেই শ্রীগুরু এবং মন্ত্ররাজরূপে লাভ করিতে পারি। অতঃপর সৎসঙ্গে গুরুনিষ্ঠা এবং নামে রুচি জন্মিলে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। ক্রমে শ্রীগুরুর অধিকতর প্রসন্নতাই শ্রীনাম, সপার্ষদ শচীপুত্র, শ্রীরূপাদি গুরুবর্গ, ব্রজকাননে শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিবর এবং শ্রীরাধামাধব আশা প্রদান করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। যাঁহার প্রথিত কৃপায় শুদ্ধ হৃদয়ে এ সকল লাভের আশা অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করি।

পরিতাপের বিষয় হইল, বিবদমান কলিযুগে আমরা শাস্ত্রদৃষ্টিতে বস্তু-দর্শন করিতে অনিচ্ছুক। ফলে শ্রেয়ঃলাভের পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ। অশাস্ত্রীয় বাগযুদ্ধ-মলিন ভয়ঙ্কর যে ছবি আমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে। এমতাবস্থায় ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-প্রণীত ও শাস্ত্রীয় নীতিসিদ্ধান্তই সংশয়মুক্ত ও দ্বন্দ্ব-মোহশূন্য ভক্তের পরম আশ্রয়স্থল।

সদ্‌গুরু বা জগদ্‌গুরু

'গুরু'-শব্দটী সকলের পরিচিত হইলেও 'সদ্‌গুরু' তাদৃশই বিরল। কারণ সদ্‌গুরু লৌকিক গুরু বা কৌলিক গুরুর ন্যায় প্রাকৃত জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য নহেন। তিনি শ্রীভগবান্‌-কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার, বৈষ্ণবস্মৃতি ও সমাজ-স্থাপনাদি বিষয়ে প্রযত্নশীল। কৃষ্ণের প্রাণাধিক সদ্‌গুরু পৃথিবীতে থাকাকালে কৃষ্ণপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত অর্থাৎ বেদান্তের বৈষ্ণবপক্ষ সমর্থনদ্বারা শুদ্ধ-ভক্তিকণ্টক অপসারণই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য।

গু-শব্দস্তন্ধকারস্যা রু-শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ (স্কন্দপুরাণ)

গু-শব্দে অন্ধকার, রু-শব্দে অন্ধকার-নিরোধক। অজ্ঞানতম নাশ করেন বলিয়া 'গুরু' এই পদবাচ্য হইয়াছেন। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'—যিনি জড়ভোগপর-ভাবনাময় জ্ঞানকে নাশপূর্ব্বক বেদোজ্জ্বলা জ্ঞানরূপ শলাকাদ্বারা দিব্যচক্ষু উন্মীলন করেন, তাঁহাকেই নমস্কার করা হয়। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তাই সদ্‌গুরু।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ভাঃ ১১।৩।২১)

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু। তিনি অপার কৃপাময়, সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয়-ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।

মানবজন্ম ও সদ্গুরু দুর্ল্লভ

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বিদেহরাজ নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে জানাইতেছেন যে, বহুজন্ম পরে দুর্ল্লভ এই মনুষ্যজন্ম এবং তদপেক্ষাও দুর্ল্লভ সদগুরু। যথা—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ (ভাঃ ১১।২।২৯)

অর্থাৎ, দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ দুর্ল্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠপ্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা দুর্ল্লভ। অপরাপর সকল জন্মাপেক্ষাই মনুষ্যদেহ যে পরম দুর্ল্লভ তাহা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর মনুষ্যদেহ যে ক্ষণভঙ্গুর তাহাও বলা হইল। অতএব এই অতি অল্প সময়কে ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি অর্থাৎ পরমার্থপ্রদ জ্ঞান-সমন্বিত বুদ্ধিদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারণ করা প্রয়োজন। কারণ ইহার অকরণে জীবের চরম দুর্গতি লাভ হয়। যে মানবদেহ ধারণ করিয়া আমরা এমন পরমার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারি তাহা অতীব দুর্ল্লভ। কিন্তু ইহাপেক্ষাও বৈকুণ্ঠপ্রিয় ব্যক্তির দর্শন সুদুর্ল্লভ। কারণ সদ্গুরু হরিপ্রিয় সুহৃদ্ ও তাঁহাতে সাক্ষাদ্ধরিত্ব বর্ত্তমান। যে-সকল মহাত্মাগণ এই দুই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত তাঁহারা প্রেমাধিক্য-হেতু ভগবান্ হইতেও বড়। তাই দুর্ল্লভ।

গুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ নবম অধ্যায়ে প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিয়াছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন,—হে প্রভো! আপনি 'সুরতরোঃ ইব' অর্থাৎ কল্পতরুবৎ। জগতের আত্মা ও বন্ধু তোমার মহৎ-ক্ষুদ্র জ্ঞান নাই। তবে সেবা করিলে কল্পতরুবৎ তোমার অনুগ্রহ হয় এবং সেবানুরূপ অভ্যুদয়ও জন্মে। অতঃপর বলিতেছেন,—হে অনন্ত! আপনি নিজের ভৃত্য নারদের বাক্য

সত্য করিবার জন্য আমার প্রাণ রক্ষা এবং পিতার বধ করিয়াছেন। যদি তোমার প্রশ্ন জাগে, তবে হে প্রহ্লাদ! আমার কৃপা না হইলে বা আমি সমদর্শী না হইলে তুমি আমাকে লাভ করিলে কি-প্রকারে? তাহা হইলে উত্তরে আমি বলিব,—

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে।
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্‌প্রসঙ্গাৎ ॥
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান্ গৃহীতঃ।
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।২৮)

হে ভগবান্! কাম্যবস্তুর আশায় সর্পযুক্ত সংসার-কূপে নিপতিত আমাকে দেখিয়া সুরর্ষি নারদ নিজহস্ত প্রসারিত করিয়া সবলে আমাকে ভবাহিকূপ হইতে উঠাইয়া নিভৃতে আপন সকাশে লইয়া আত্মসাৎ করেন। অতঃপর আমার উপর তাঁহার আপনসত্ত্ব আরোপ করিয়া ঘোষণা করেন,—"এই 'জীবটী' আমার"। এরূপ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক একান্তে লইয়া গিয়া সস্নেহে মন্ত্ররাজ উপদেশ করিয়া আপন সেবা প্রদান করেন। আমি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া তোমার সেবা লাভ করিয়াছি। তাঁহার সেবা কখনও পরিত্যাগ করিব না।

উপরিউক্ত আলোচনায় শ্রীহরি—The Predominating Absolute এবং শ্রীহরি-কৃপাঘনমূর্ত্তি—The Predominated Absolute বা হরিত্বপ্রাপ্ত বৈষ্ণব-গুরুর মধ্যে শ্রীগুরু যে অধিক কৃপালু ও প্রেমময় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখানে শ্রীনারদের বিশেষ বৈষ্ণবীয় প্রেমময় বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌রূপে প্রকট করিয়াছেন। শ্রীনারদকে পরমাশ্রয়জাতীয় বিগ্রহরূপে স্মরণ করায় কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী হইতে ভক্তের পার্থক্য নির্ণীত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ফললাভ করিয়া সাধন-ভজন ত্যাগ করেন। ধ্রুবাদি যেমন সাধুসঙ্গ আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রেয়সাধন তৎপর হইবার আদর্শ শিক্ষা দান করিয়াছেন, ভক্তকুলতিলক প্রহ্লাদ মহারাজ সেই সদ্‌গুরু চরণ আশ্রয়রূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "আশ্রয় হইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"

ব্রহ্মযামলে—"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি গুরুং তস্মাৎ সমাশ্রয়েৎ।

গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই, গুরুর অধিক তপস্যা নাই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নাই, সেইজন্য গুরুদেবকে আশ্রয় করিবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং), তাং-২২।১১।৯১]

চার মাস ধরে যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত হচ্ছিল, আজ তার শেষ দিবস বা নিয়ম-ভঙ্গ দিবস। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের উক্তি রয়েছে।—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

মর্ত্ত্যমানব, আত্মকল্যাণকামী মানব যদি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন, তাহলে তাকে নিয়ম করে পালন করতে হবে। বিনা নিয়মে খেয়ালখুশীমত কিছু করলে পরে তার ফল হয় না, বরং উল্টো ফল হয়। সেইজন্য নিয়ম করে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করতে হবে।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥"

শাস্ত্রে এই ব্রতের কথা উল্লেখ আছে। আমাদের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, এমনকি, নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী সম্প্রদায়েও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনে বিধি-বিধান দেখা যায়। এই ব্রত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি কামনা ও ভক্তিলাভ। স্মার্ত্তাচারের মধ্যেও এই ব্রতের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তারা কর্ম্মফলভোগী, স্বর্গই তাদের একমাত্র প্রাপ্তিস্থান। তাদের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের শেষ অবস্থা হচ্ছে স্বর্গলাভ। আর ভক্তগণের, ভক্তিকামী ব্যক্তিগণের এই ব্রত পালন ভক্তিলাভের জন্য, শ্রীভগবানের —রাধাশ্যামসুন্দর, রাধাবিনোদবিহারীর সাক্ষাৎ সেবা লাভই তাঁদের কামনা।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের উদাহরণ দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভু। তিনি যখন দক্ষিণদেশ বিজয়ে গিয়েছিলেন, যখন তিনি শ্রীরঙ্গম দর্শনে যান, সেই সময় তিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সেই বিষয়ে বর্ণনা আছে। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরহরি—গৌরসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু জগৎকে এই ব্রত পালনের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন।

বর্ত্তমানে অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের ব্যবস্থা থাকলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এর প্রচলনটা কিছু কমে এসেছে। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব

গুরুবর্গ, গোস্বামীবর্গের ক্ষেত্রেও দেখেছি, তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁরা এই ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন এবং তাঁদের সেবকগণকে এই ব্রতপালনেও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশেষতঃ সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করছেন। কারণ, অনেকেই সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

বর্ত্তমান জগতে ভোগবাদেরই প্রভাব বেশী, যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত ভোগবাদ ও ত্যাগবাদে আসক্ত নন। তাঁরা জানেন প্রাকৃত ভোগবাদ ও ত্যাগ-বাদ—দুইই খারাপ কথা। যদি কেউ প্রশ্ন করেন - গৌড়ীয় মঠ ভোগী না ত্যাগী ? সে প্রশ্নের উত্তর গৌড়ীয় আচার্য্যগণ, গৌড়ীয় গুরুবর্গগণ দিয়ে রেখেছেন। গৌড়ীয়-গণ প্রাকৃত ভোগীও নন, প্রাকৃত ত্যাগীও নন,—তাঁরা জড় ভোগত্যাগী বা ত্যাগ-ত্যাগীও নন। এ কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে ভক্তিবাদ। জাগতিক ভোগ ও ত্যাগ দুটোই জাগতিক স্থূল-সূক্ষ্ম ব্যাপার। প্রাকৃত ব্যাপারের মধ্যে সাধন-ভজন নিহিত নাই। ভজন রাজ্য অপ্রাকৃত। সেইটাই গৌড়ীয় গুরুবর্গের শিক্ষা। সুতরাং তাঁরা যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন, এর সবটাই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের জন্যই। সাধু-সঙ্গ, ভক্তিলাভ, ভগবৎ প্রেম-প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের এই ব্রত পালন।

এই চার মাসের ভিতরে কিছু নিয়ম বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে শাস্ত্রে—

> শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
> দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥

এই ব্রত আরম্ভ করা আবার তিনভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কেউ শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকেই আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন কার্ত্তিক মাসের শেষে। কেউ আরম্ভ করেন একাদশী-দ্বাদশী তিথিতে, শেষ করেন একাদশী-দ্বাদশী তিথিতে। আবার কেউ আরম্ভ করেন পূর্ণিমা থেকে এবং শেষ করেন কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে আমরা দেখে আসছি, দেখবার সুযোগ-সৌভাগ্য হয়েছিল, পূর্ণিমা থেকেই ব্রত আরম্ভ এবং পূর্ণিমাতে ব্রত শেষ হত। এ সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য এবং শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অনুভাষ্য যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখব পূর্ণিমা থেকে ব্রত আরম্ভ হয়েছে এবং পূর্ণিমাতেই ব্রত শেষ হয়েছে। তিনভাবে শাস্ত্রে

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে আরম্ভ করে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে বিধান, এটা অতি সাধারণ বিধান। আর তুটো ক্ষেত্র ভক্তদের ক্ষেত্র। তার ভিতরে কোন গুরুবর্গের আবির্ভাব যদি উত্থান-একাদশীতে হয়েছে, তাঁরা হয়ত' একাদশী থেকে ব্রত আরম্ভ করেছেন এবং একাদশীতে শেষ করে দ্বাদশীতে উৎসবাদি করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় গুরুবর্গের বিচারে পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা - এই বিচারটা দেখতে পাচ্ছি। তাই অস্মদীয় সম্প্রদায় বা মঠ-মিশনেও— শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতেও পূর্ণিমা থেকেই ব্রত আরম্ভ হচ্ছে এবং পূর্ণিমাতে ব্রত শেষ হচ্ছে।

কিছু সুবিধাবাদী লোক তাঁরা চাতুর্ম্মাস্যের উপকারিতা, উপযোগিতা এক-রকমের অস্বীকার করছেন বা শুধু শেষ মাসটা—যার নাম কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত, এইটী শুধু পালন করছেন। তাঁরা একটা যুক্তি দেখান, তাঁরা বলেন,— চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ঊর্জ্জাদর' কথাটা আছে, সুতরাং আমরা ঊর্জ্জব্রত পালন করব, কাৰ্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করব। কিন্তু চাতুর্ম্মাস্যের যে বিধি-বিধান আছে, সেই জিনিসটার প্রাধান্য তাঁরা স্বীকার করছেন না। কিন্তু মহাজনগণের যে পথ সেই পথ অনুসরণ সাধন-ভজনাকাঙ্ক্ষী জীবের কর্ত্তব্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বললেন,—

"মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

আমি খানিকটা মানব, খানিকটা মানব না, এটা তত্ত্বদর্শন নয়। এ বিচারকে চৈতন্যচরিতামৃতকার খণ্ডন করেছেন,—"অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় এই তোমার বিচার।" অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় বলেছেন এটা। তত্ত্বদর্শন সবটাই মানতে হবে, মুখ্য এবং গৌণ-ভাবে মেনে নিতে হবে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মধ্যে শ্রাবণ মাসে যে কোন রকমের শাক বর্জ্জন করতে হবে। ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা দধি বন্ধ আছে। আশ্বিন মাসে দুগ্ধ বন্ধ আছে। কার্ত্তিক মাসে 'চামিষং' অর্থাৎ এই আমিষ শব্দে অন্যান্য জাত কিছু যেগুলো বর্ণনা করা হয় নাই, সেগুলো এতে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে মাসকলাইয়ের ডাল ইত্যাদি জিনিসগুলো। যে জিনিসগুলোর ভিতরে রাজসিক, তামসিক ভাব অধিক। ঋষিনীতির ভিতরে আমরা দেখতে পাই, ঋষিগণ যে Research করেছেন, সেই Research আজ হয় নাই। ঋষিগণ প্রত্যেকটী জিনিসের বিশ্লেষণ করেছেন। কোন্ খাদ্যের ভিতরে কি পরিমাণে রাজসিক, তামসিক ভাব রয়েছে, সেটাও তাঁদের বিশ্লেষণের মধ্যে রয়েছে। তাঁরা সব সময় চিন্তা করেছেন,

আমদের ভাবী বংশধর যারা, ভাবী মানবগোষ্ঠী এরা যাতে সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে আত্মকল্যাণ চিন্তার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাই ত' তাঁরা রেখেছেন। সেই অনুসারে আহার-বিহারেও তাঁরা একটা বিশেষ বিধি-বিধান দিয়েছেন। রাজসিক-তামসিক বস্তুগুলোকে তাঁরা আহারের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। সাত্ত্বিক বস্তু ঠাকুরকে নিবেদন করে তার অবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে বলেছেন। ঋষিগণের বিশেষ নির্দ্দেশ—যে কোন জিনিস রাজসিক, তামসিক হলেও সেইগুলো নির্গুণ বস্তু গুণাতীত যে ভগবান্ তাঁর গ্রহণযোগ্য হয় না। সাত্ত্বিক বস্তুই ভগবানকে নিবেদন করতে হবে—এটাই শাস্ত্রে লেখা আছে। গীতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—তুমি যা করছ—যা খাচ্ছ, যা যজ্ঞাদিতে নিবেদন করছ, যা কিছু দান করছ এর সবটাই আমাকে অগ্রে সমর্পণ করবে। তার মানে এমন হবে না আমি একজন রাজসিক, তামসিক ব্যক্তি, আমার রাজসিক, তামসিক আহার, সুতরাং আমি রাজসিক, তামসিক বস্তু ভগবানকে নিবেদন করব—একথা লেখা হয় নাই। ভগবান্ যে জাতীয় বস্তু গ্রহণে অভ্যস্ত, আনন্দিত, সেই সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানকে নিবেদন করতে হবে—এইটাই হল শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ। অনেকে এটা বুঝতে পারেন না, বা বুঝলেও তারা জেনেশুনে কিছু অন্যায় করেন। কেউ চা খান, চা ভোগ দিয়ে দিলেন, কেউ মাছ-মাংস খান, মাছ-মাংস ঠাকুরকে ভোগ দিলেন, এটা ত' বিধি-বিধানের মধ্যে নাই। কিন্তু জিনিসগুলো ঘটছে সমাজে। শাস্ত্র আলোচনা করে শাস্ত্রের যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত, সেইটাই আমরা সকলে মেনে নিলে আমাদের আত্মকল্যাণ সম্ভব। শাস্ত্রের বিচার, সুতরাং আমরা যা খাব সেটা ঠাকুরকে দেওয়া আইন নয়। ঠাকুর যে-সকল জিনিস গ্রহণ করতে অভ্যস্ত—দুধ, দই, ছানা, মাখন, ননী, এগুলো ঠাকুরকে দেওয়া যায়। আমার ইচ্ছানুসারে নয়। আজকাল এরকম কতকগুলো অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে, যারা খামখেয়ালী খুশী ও যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। শাস্ত্র এই জিনিসগুলো অনুমোদন করেন নাই।

এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করার বিশেষ উদ্দেশ্য ভগবানে শ্রদ্ধা, ভক্তিলাভ, ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ—এই কথা বলেছেন। এই দামোদর মাসের অধিদেবতা ভগবান্ দামোদর কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ গোপাল নাম ধারণ করলেও তিনি হামাগুড়ি দেওয়া গোপাল নন। এখানেও কিছু বিচার আলোচনা করা প্রয়োজন।

'গোপাল'-শব্দটা শুনলে ভুল বুঝবার কোন কারণ নাই আমাদের। অনেকে গোপাল নাম শুনলে বালগোপাল বা নাড়ুগোপালের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু গোপাল শব্দ ত' সমস্ত জায়গাতে প্রয়োগ করা আছে। সমস্ত রসের আলম্বন বা আধার গোপাল। এ নিয়ে ভুল বুঝবার কোন কারণ নাই। প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বাচ্চা গোপাল মা যশোমতীর ক্রোড়ে বসে আছেন যিনি, তাঁর প্রণাম মন্ত্র আছে—

"করারবিন্দেন পদারবিন্দং, মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
ব্রজেশ্বরী ক্রোড়গতং হসন্তং, বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি॥"

"দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥"

দধিমন্থন আরম্ভ হয়েছে ভোরবেলায়। সেই শব্দ শুনতে পেয়ে গোপাল উঠে গেছেন। 'তক্ত্যনিদ্রঃ প্রভাতে'। চুপি চুপি গোপীগণের ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে অনেক অলঙ্কার – নূপুর, কিঙ্কিণী প্রভৃতি রয়েছে। ওগুলো আওয়াজ করবে, সেই ভয়ে সেগুলোকে চেপে ধরেছেন। 'মুখকমলসমীরৈরাশু নিব্বাপ্য দীপান্ কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥' ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। ফু দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছেন। আর দধি মন্থনের পাত্রের ভিতরে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটা মাখন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। সেই কৃষ্ণ আমাদের পালন-পোষণ করছেন।

চুরি করতে যাচ্ছেন তিনি, তিনি বুঝতে পারছেন, তাই মুচকে মুচকে হাসছেন।

"সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥"

কোন গোপী দেখতে পেয়েছেন, তিনি বলছেন—বলে দেব, বলে দেব, মা যশোদার কাছে। কৃষ্ণ সেখানে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন চুপ; কিছু বলবে না। "মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥" এই মাখন চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছেন, আবার কিছুক্ষণ পরে দেখ মা যশোদার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই যে এক গোপাল। আবার গোপাল একটু বড় হয়েছেন—

সজল-জলদ-নীল-ন্যক্কৃত-শ্যামলাঙ্গং, করতলধৃত-শৈলং বেণুবাদ্যানুশীলম্।
মধুর-মধুর লীলং শ্রীল-গোপাল-মল্লং. ব্রজজন-কুল পালং ধীমহি ব্রহ্মমূলম্॥

এও ত' এক গোপাল। ইনি সমস্ত ব্রহ্মের মূলতত্ত্ব। সেই গোপালের ধ্যান এটা। আবার 'করারবিন্দেন পদারবিন্দম্' যেমন, তেমন এখানে বলছেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

বহু গোপালের ছড়াছড়ি। ব্যাপার কি? এক এক গোপালের এক এক রকমের বর্ণনা। বেণু-বাদ্যানুশীল গোপাল। নন্দ মহারাজ গোচারণে বেরিয়েছেন, গোপাল তাঁর কোলে আছেন। এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হল। তিনি গাভী, গোবৎস সামলাবেন, না গোপালকে সামলাবেন? কি করবেন! এমন সময় কোথা থেকে চট্ করে এসে হাজির হলেন রাধারাণী। গোপালকে রাধারাণীর কোলে দিয়ে উনি তাড়াতাড়ি গাভী, গোবৎস সব নিয়ে যেতে লাগলেন। ভাণ্ডীরবনে এই লীলা হচ্ছে। রাধাগোবিন্দের মিলন হয়েছে সেইখানে, বিবাহ হয়েছে, ব্রহ্মা এসেছেন এবং আরও অন্যান্য অনেকে এসেছেন। রত্নবেদী, সিংহাসন ইত্যাদি সবকিছুর বর্ণনা আছে গর্গসংহিতাতে। গোপাল ত' সেই ক্রোড়ের গোপাল। পূর্ণ লীলাটা, পূর্ণ রসের আধার তিনি, সেটা ত' দেখাচ্ছেন এখানে। তাহলে গোপাল এতটুকু শিশু হলেও তাঁর ভিতরে সমস্ত তত্ত্বদর্শনটা আছে। নিখিল রসের আধার তিনি। 'রসো বৈ সঃ' সেই মূর্ত্তি ভগবান্। তাহলে গোপাল সেবা করলেই যে কমা সেবা হয়ে যাবে, আর রাধাগোবিন্দের সেবা করলেই যে ঠিক মধুর রসের, উন্নতোজ্জ্বল রসের, আদি রসের উপাসনা হবে, এমন কোন **Guarantee** আছে কি?

এর উত্তরে—একদিন আলোচনা করতে করতে কথাটা এসেছিল, কথাটা হল—একজন বৈষ্ণব তিনি ঐশ্বর্য্যপর মূর্ত্তিতে আসক্ত। তাঁর সামনে আছেন রাধা-গোবিন্দের মূর্ত্তি। কিন্তু তাঁর দর্শনটা হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন। আবার উল্টিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন, একজন মধুর রসের সেবক বা সেবিকা তাঁদের উভয়কে রাধাগোবিন্দ দর্শন করে প্রণাম করছেন। অধিকার বিচার।

শিবঠাকুর আছেন। শিবঠাকুরের যিনি ভক্ত, তিনি এক বৈষ্ণবের প্রতি অবিচার করলেন। বৈষ্ণব ঠাকুর নাম করতে করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বললেন, —আমার শিবঠাকুর পূজা হয় নাই আজ, আমার পুরোহিত আসেন নাই, আপনি

দয়া করে আমার শিবপূজাটা করে দিন। নামপরায়ণ বৈষ্ণব তিনি বললেন,—আমি শিবপূজা করি না। আমাদের শাস্ত্রে শিবপূজা করা নিষেধ আছে। আমি আপনার শিবপুজা করতে পারব না। দক্ষিণ দেশের উপাখ্যান। তখন রাজা (শৈবরাজা ক্রিমিকণ্ঠ) বললেন,—আপনি আমার প্রজা, তা জানেন? হ্যাঁ তা জানি। আপনি যদি আমার শিবপূজা না করেন, তাহলে আপনার গর্দ্দান যাবে। বৈষ্ণব ঠাকুর তখন দেখলেন কি হবে আর! পাঁচসিকে দামের প্রাণটা কেন আর নষ্ট করি। আচ্ছা চলুন। তিনি ছিলেন নৃসিংহমন্ত্রের উপাসক। পূজার সকল উপকরণ সেখানে প্রস্তুত। হাত, মুখ ধুয়ে পূজা করতে বসে গেছেন বৈষ্ণবঠাকুর। নৃসিংহমন্ত্রে পূজা করছেন। তখন নৃসিংহদেব সেই লিঙ্গ ভেদ করে সেখানে উঠেছেন। রাজাকে বধ করেছেন এবং রাজার আরও যারা পৃষ্টপোষক ছিলেন, তাদেরও বধ করেছেন। তারপর সেই বৈষ্ণবকে বললেন,—আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন যান। কি ব্যাপার? সে মূর্ত্তি ত' আজও আছে দক্ষিণ দেশে। তাঁর নাম লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহ। এইরূপ জিয়ড় নৃসিংহ, পানা নৃসিংহ ইত্যাদি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে নৃসিংহদেব প্রকাশিত। এ সমস্ত মূর্ত্তি ত' রয়েছেন, ভগবানের অলৌকিক লীলা ত' রয়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা

কৃষ্ণসেবা এবং গুরুসেবা একই জিনিস। গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভজন। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়"—প্রথমে গুরুপদাশ্রয়, তৎপরে গুরুসেবা আরম্ভ হয়। কিন্তু নিজ স্বরূপদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুসেবা সুষ্ঠু হয় না। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দর্শনই গুরুদর্শন। সাধক জীব প্রথমাবস্থায় শ্রীগুরুকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে দর্শন করিতে না পারিলেও সেই দর্শনলাভাশায় আর্ত্তির সহিত গুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার স্বরূপ ও নিজস্বরূপ দর্শন হইবে।

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

শ্রীগুরুদেবের সেবালাভ হয় তাঁহারই একান্ত অনুগত জন বা বৈষ্ণবের কৃপায়। বৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন ব্যতীত বৈষ্ণবের কৃপালাভ বা সেবালাভ সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণবকে গুরুপ্রেষ্ঠরূপে দর্শনই তাঁহার স্বরূপ-দর্শন। শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎপ্রেষ্ঠ-রূপে দর্শন না হইলে যদ্রূপ গুরুসেবা লাভ হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবকে গুরুপ্রেষ্ঠরূপে দর্শন না হইলে বৈষ্ণবসেবা লাভ হয় না। গুরুসেবাতে যেরূপ কৃষ্ণসেবা হইয়া থাকে,

বৈষ্ণবের সেবায় সেইরূপ গুরুসেবা হইয়া থাকে। কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটী একতাৎপর্য্যপর ও অভিন্ন। এই ত্রয়ীর মধ্যে যে কোনও একজনের সেবায় সকলের সেবা হয়। এই তিনজনের মধ্যে যদি কোনও একজনের কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়, তাহলে আর কোন চিন্তা নাই। অতএব গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা এবং বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা করা প্রয়োজন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই সেবা।

গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন হওয়ার পূর্ব্বে যে সেবার চেষ্টা, তাহা অন্যাভিলাষ-শূন্যা হইলে সেবালাভের উপায়, আর অন্যাভিলাষময়ী হইলে সেবার ছলনামাত্র—বঞ্চিত হইবার পথ।

বৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাতেই সম্ভব। সেবালাভেচ্ছু জীব তিন প্রকারে বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবশতঃ জীবের গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি স্বাভাবিক টান, প্রীতি, মমত্ববোধ ও আপনজ্ঞান হইয়া থাকে এবং সাধুসঙ্গপ্রভাবে সেই প্রীতি বা মমত্ববোধ বর্দ্ধিত হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় প্রেমরূপে পরিণত হয়। আবার কাহারও কাহারও ইহজন্মের সুকৃতিবশতঃ গুরু-বৈষ্ণবে কোমলশ্রদ্ধা জাত হয় এবং সাধুসঙ্গক্রমে তাহা ক্রমশঃ দৃঢ় ও সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া গুরু-বৈষ্ণবগণ অকস্মাৎ কোন জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার মঙ্গল করিতেও পারেন।

গুরু-বৈষ্ণবে যাঁহার সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস উদিত হইয়াছে, তিনিই হরি-ভজনের রহস্য, হরিভজনের প্রণালী অবগত হইয়াছেন, তিনিই কায়মনোবাক্যের সহিত হরিভজন করিতেছেন, তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। সুতরাং আমাদের যদি একমাত্র প্রীতির পাত্র গুরু-বৈষ্ণবে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধালাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের অসতের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা ত্যাগ-পূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গলাভের জন্য নিরন্তর ক্রন্দন করিতে হইবে। কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের এই ভৌমজগতে আগমন, তাঁহারা কৃপা করিবেন না, এরূপ ত' কথাই নয়। হয়ত' আমার কৃপাপ্রার্থনা অন্তর হইতে হয় নাই; কৃপা বিনা গতি নাই, কৃপা লাভ করিতেই হইবে—এরূপ নিশ্চয়তা লাভ হয় নাই, তাই তাঁহাদের কৃপারজ্জু আমার সম্মুখে লম্ববান্ থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ জড়মোহে অন্ধ আমি তাহা ধরিতেছি না। কৃপারজ্জু না ধরার জন্য আমি সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারও পাইতেছি না এবং কৃপা পাইয়াও তাহা বারে বারে হারাইতেছি আমার স্বীয় কর্ম্মফলে।

গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন না হওয়ায় তাঁহাদের সেবার অভিনয় করিলেও

তাঁহাদের প্রীতিবিধান হইতেছে না। তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের স্বরূপদর্শন না হইলে কি তাঁহাদের প্রীতিবিধান সম্ভব? অতএব তাঁহাদের স্বরূপদর্শন লাভের জন্য এবং তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা হওয়া দরকার। নিজকে সেবক বলিয়া জানিতে পারিলেই নিত্যসেবা গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন হয়। সেইজন্য অনুক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্কপট বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে—কি করিয়া নিজকে তাঁহাদের পাদপদ্মের নগণ্যতম সেবক বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিজের আর্ত্তি-ক্রন্দন অকপট ও হার্দ্দিক হইলে তাঁহারা কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না; নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তাঁহারা সতত পরদুঃখদুঃখী, পতিত জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের অবতার। আমাদের দিক্ হইতে কৃপা প্রার্থনা ষোলআনা আন্তরিকতাময় হইলেই কৃপা বা সেবা পাওয়া যাইবে।

—**শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠের

শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রীসমিতির পরিচালকগণ বর্ত্তমান বর্ষের ২২শে বৈশাখ ১৩৯৯, ইং ৫ই মে ১৯৯২, মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে উত্তরপ্রদেশান্তর্গত হরিদ্বারস্থ শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বিগত বর্ষে স্থানীয় পৌরসভা হইতে শ্রীমন্দিরের ও সেবকখণ্ডের 'প্লান' পাস করানো হইয়াছিল।

পূর্ব্বপরিকল্পনানুযায়ী শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও যুগ্ম-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সদলবলে গত ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার যাত্রা করিয়া ২রা মে শনিবার প্রাতে শ্রীমঠে উপস্থিত হন। উক্ত দিবসেই শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজও সদলবলে হরিদ্বার মঠে আসিয়া পৌছান।

পরবর্ত্তিদিবসে শ্রীমন্দিরের ও সেবকখণ্ডের প্লান অনুযায়ী জমি মাপিয়া ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনের স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়। ৫ই মে, মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়ার শুভলগ্নে বেলা ৮-৩০ ঘটিকায় সঙ্কীর্ত্তনযোগে অধিবাস, বাস্তুপূজা ও শ্রীশ্রীবাসুদেবার্চ্চনাদির

পর ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। তদনন্তর পরিক্রমান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহদেব, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, শ্রীগিরিরাজজীউ,

শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর জয়ধ্বনিপূর্ব্বক ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনের কার্য্য সমাপন করা হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ ভোগরাগ ও আরতি সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে আমন্ত্রিত শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

বিকাল ৪ ঘটিকায় জয়ধ্বনিপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিগণ সুললিত কণ্ঠে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ 'অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথির' মহিমা-মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণন করেন। এই তিথিতে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পরিশেষে সকল সুধী সজ্জনবৃন্দ ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট উক্ত শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ড-নির্ম্মাণকার্য্যে উদারহস্তে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

—নিজস্ব সংবাদ

প্রচার-সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বালেশ্বর জেলান্তর্গত (উড়িষ্যা) অন্যতম প্রচার-কেন্দ্র শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, ইং ২৬।১১।৯১, মঙ্গলবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৮, ইং ১৩।৩।৯২, শুক্রবার পর্য্যন্ত ১০৮ দিন ব্যাপী বিরাট্ শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শ্রীনামযজ্ঞানুষ্ঠানে বিষ্ণু-সহস্রনাম, গোপালসহস্রনাম, বৈষ্ণব-হোম ও নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নামযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রায় দশ সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে যে-সকল ধর্ম্মপ্রাণ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ কায়-মন-বাক্য ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মকল্যাণোদ্দেশ্যে কলিযুগপাবনবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাই। শ্রীনামপ্রভু জীবের সকলপ্রকার ক্লেশ দূর করত মঙ্গল ও শান্তিবিধান করুন, কলিকলুষকল্মষ দূর করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করুন এবং জগজ্জীবকে হরিনামামৃত পান করাইয়া দুস্তর এ ভবসংসার হইতে উদ্ধার করুন—ইহাই তচ্চরণে ও তদীয় ঐকান্তিক ভক্তগণের চরণে সকাতর নিবেদন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ } ২ শ্রীধর, কারণোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৯, ইং ১৬/৭/৯২ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-সুদর্শন-স্তোত্রম্

[উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ে]

[ইতি স্তবান্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রা-স্যন্দনং যযৌ ॥ ৫১ ॥]

[কমলযোনি ব্রহ্মা পরমেশ্বর বলরামকে এই স্তুতিবাদান্তে প্রণামপূর্ব্বক অখিল জগতের ঈশ্বরী বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রাকে দর্শনার্থ তদীয় রথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥]

শ্রীশ্রীসুভদ্রা-স্তোত্রম্—

১। জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্য-কারণ-কর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তু তে ॥ ৫২ ॥

হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বরি! আপনিই কার্য্য-কারণ-কর্ত্রী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥

২। সর্ব্বস্য হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞান-মোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্য-সুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্ ॥ ৫৩ ॥

হে কৈবল্য-সুখদে! আপনি অখিল জীবের হৃৎপদ্ম-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন; হে জ্ঞান-মোহাত্মিকে! আপনি সুরগণের অরণি-স্বরূপ; অতএব হে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৫৩ ॥

৩। দেবি ত্বং বিষ্ণু-মায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসন-সংস্থাসি বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি ॥ ৫৪ ॥

হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া। হে বিষ্ণু-ভাবানুসারিণি! আপনি কমলারূপে বিষ্ণুর হৃদয়-কমলে সতত বিরাজমানা ॥ ৫৪ ॥

৪। ত্বমেব **লক্ষ্মীর্গৌরী** চ শচী **কাত্যায়নী** তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ॥
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

মাতঃ! একমাত্র আপনিই **লক্ষ্মী**, আপনিই **গৌরী**, আপনিই শচী ও আপনিই **কাত্যায়নী**; অধিক কি বলিব, জগতে সদসৎ যে কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎসমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাত্মিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ৫৫-৫৬ ॥

৫। জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্র-দায়িনি।
ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা ত্বং **ভদ্রকালি** নমোঽস্তু তে ॥ ৫৭ ॥

জননি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা; অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক। হে **ভদ্রকালি**! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

৬। ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ।
স্ত্রী-রূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুং-রূপো জগদীশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥

দেবি! আপনি—অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ—পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়-স্বরূপ ॥ ৫৮ ॥

৭। **যুবয়োর্নহি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্যৎ পরমেব হি।**
যথা বয়ং নিযুক্তাহি ত্বয়া বৈষ্ণব-মায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি॥
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ।
আশা ত্বমাশাপূর্ণা চ সর্ব্বাশা-পরিপূরিকা॥ ৫৯-৬০॥

হে পরমেশ্বরি! আপনাদের **উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই,** জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়া আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন, ক্ষুধা বলুন, নিদ্রা বলুন, আশা বলুন, আর আশার পূর্ণতাই বলুন, সকলই আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৫৯-৬০॥

৮। মুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি বন্ধহেতুস্তমেব চ।
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী॥
ত্রাহি পাদজলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গ-বিলোকনৈঃ॥ ৬১-৬২॥

মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং আপনিই তাহাদিগের ভব-বন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদা কল্পলতিকা-স্বরূপ; অতএব হে ভক্ত-বৎসলে! আমি আপনার চরণ-প্রান্তে পতিত হইতেছি, আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন॥ ৬১-৬২॥

[স্তুত্বেত্থং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে।
চক্রং **সুদর্শনং** বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ॥ ৬৩॥]

[ভগবান্ কমলাসন, সুভদ্রাদেবীকে স্তব করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী রথস্থিত **বিষ্ণুর চতুর্থ শরীর সুদর্শন চক্রকে** পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন॥ ৬৩॥]

শ্রীশ্রীসুদর্শন-স্তোত্রম্—

৯। **সুদর্শনমহাজ্বাল** কোটি-সূর্য্যসম-প্রভ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্ব-প্রদর্শক॥ ৬৪॥

হে মহাদীপ্তিশালিন্ 'সুদর্শন'! হে কোটি-সূর্য্যসম-প্রভ! তুমি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠ-মার্গ-প্রদর্শক॥ ৬৪॥

১০। **নমস্তে নিত্য-বিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্র-নিকেতন।**

অবার্য্য-বীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তৎ-প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬৫ ॥

(হে সুদর্শন !) তুমি প্রতিনিয়ত বিলসনশীল নানা প্রকার বৈষ্ণবাস্ত্র-নিচয়ের আধার-স্বরূপ ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্য-বীর্য্য মূর্ত্তি-স্বরূপ ; তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৫ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

১১। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচার কি ?

"অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধি-বলে ও বিদ্যা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থও শুনেন, তবে বলেন যে, সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন। চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি ? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই হয় যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন-প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' ; সঃ তোঃ ১১।৬

১২। ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতির মূল্য আছে কি ?

"কোন কোন ব্যক্তি নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতি সর্ব্বদা ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ। * * * ঈশ্বর না মানিলে নৈতিক-বিধান-সকল অকর্ম্মণ্য হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

১৩। অক্ষজ মনোবৈজ্ঞানিক বা প্রীতি-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ জগতের কোন উপকার করিয়াছেন কি ?

"প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া

বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ; জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন।"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

১৪। শঙ্করাচার্য্য কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডী ও বৌদ্ধগণকে নিজ-মতান্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন ?

"শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ-দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীর বাহু-বলে ও বিচার-বলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধ-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিলেন না, সে-স্থলে নাগা সন্ন্যাসি-দল নিয়োগপূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্ত-ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপরে বৌদ্ধদিগের যে-সকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে-সকল নামান্তর করিয়া বৈদিকধর্ম্মের অন্তুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে-সকল বৌদ্ধ এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্ন-সমুদয় লইয়া হয় সিংহল-দ্বীপে, নয় ব্রহ্মরাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধাবতারের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহল-দেশে গমন করেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৫। সন্ন্যাসী বা জীবকে কি 'নারায়ণ' মনে করা উচিত ?

"মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত-প্রথা এই যে, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-পূর্ণ প্রথার নিবারণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন—সন্ন্যাসী জীবমাত্র, কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণমাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণ-কণ-সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ১৮।১১২-১১৬

১৬। দেবতা কি মায়াবাদীর পূজা গ্রহণ করেন ?

"মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও যে দেবতাকেই অন্নাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদীর মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে সেই দেবতাটী তাঁহার সেই সেই পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্তব-স্তুতি কি কৃষ্ণের সন্তোষ-জনক ?

"ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়-আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥" —শঃ

১৮। পশুতে ঈশ্বরারোপ করিবার মতবাদটী কি শুদ্ধধর্ম্ম ?

"যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈত-বাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

১৯। একমাত্র কাহার উপাসনা করা উচিত ?

"শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথমে জড়শক্তিমাত্র, তদন্তে জড়শক্তির আধারে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ-দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্ব্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান ব্যক্তি হইতে পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম-ভজনে অধিকারী। রাগের নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ। অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না।" —তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

২০। প্রকৃতির কর্তৃত্বটী কিরূপ ?

"অদূরদর্শিগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দ্দন, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার সদর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করিয়া থাকেন—যে জড়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্তৃত্বারোপ করা যায়। গঙ্গা-জলকে—পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে—উল্লাসিনী, কলিকে-ধর্ম্মোচ্ছেদক এবং বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলাতে তাহাদের কর্তৃত্বটী যেরূপ রূপক-বোধক মাত্র হয়, প্রকৃতির কর্তৃত্বও তদ্রূপ জানিতে হইবে।" —তঃ সূঃ ২২ সূঃ

২১। পঞ্চোপাসনার বিষ্ণুপাসনা কি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে ?

"পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২২। কেবল কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণই কি মায়াবাদী ?

"বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। ** তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ-সকলও মায়াবাদী। ** বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল দরবেশের মতও মায়াবাদ।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলে ?' সঃ তোঃ ৫।১২

২৩। শঙ্করাচার্য্য মুক্তির পরে জীবের গতি-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

"কেবল-মুক্তি লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। ** যাঁহারা কেবল তাঁহারা শিক্ষার বাহ্য-অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হন।" —জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

২৪। রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ কি ?

"রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মটী খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্ম্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্ম্মে যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তার্কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তদুচ্চোচ্চ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। ** এক্সিয়ম্ ও পষ্টুলেটের জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেও সেইরূপ দুর্গতি হয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৮।৪

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সত্য, বাস্তব-সত্য, পরম সত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যে আবদ্ধ। রসময় রসিক-শেখরের পাদপদ্ম-সেবায় প্রমত্ত জনগণের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই সেবার অধিকার পাইব। সেইদিন আমাদের কবে হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা মানবজীবনের কর্ত্তব্য জানিতে পারি। তিনি জাগতিক অভ্যুদয়ের কোন ব্যবস্থা-পত্র দেন নাই; তিনি জগতের মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন,—যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহাকে মহত্ত্ব প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অপরে আক্রমণ করিলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আক্রান্ত হইতে বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন কর।'

'চেতোদর্পণ-মার্জ্জন'-শব্দের দ্বারা চিত্তদর্পণে কু-দার্শনিকের মতবাদ ও কৈতব-রাশি এবং প্রাক্তন অনর্থ ও অভদ্ররাশির অপসারণ সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে যাবতীয় অন্যাভিলাষ ও কু-দার্শনিকের মতবাদ বিদূরিত হয়—কর্ম্ম-প্রমত্ততারূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অখিল কল্যাণের কোমল কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন বিদ্যাপতি, প্রতি পদে পদে আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকারী অপ্রাকৃত অমৃতাস্বাদ-দাতা, প্রেমবিধাতা ও সুপর্ণ-বিশিষ্ট আত্ম-বিহঙ্গমের চিদাকাশে চিদ্বিলাস-সেবাস্বাধীনতা-প্রদাতা।

কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই। অনাত্ম-প্রতীতিতে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না, অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই বহুমানন হইয়া থাকে। জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না,—মায়ার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণ-নাম ব্যতীত জগতে আর কোন ঔষধ নাই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। বর্ত্তমান সময়ে হরিনামের মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণদ্বারা উদর-ভরণ, প্রতিষ্ঠা-কামিনাসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলে ব্যস্ত।

হরিনাম ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। অষ্টপ্রহরের পর আবার খাওয়া-দাওয়া-থাকার কথা, আবার বাদ-বিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা হইলে তাহাকে অষ্টপ্রহর বলা যায় না। নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধ-গ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল ভুক্তি। বর্ত্তমানের বিকৃত অষ্টপ্রহরে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তিত হয় না, মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে মায়ার সঙ্কীর্ত্তনকে 'কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন' বলিয়া জগতে জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমল-শ্রদ্ধ লোকদিগের উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

ভগবান্ ত্রিশক্তিধৃক্; বেদ বলেন,—"ত্রেধা নিদধে পদম্"—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থ-শক্তিত্রয় তিনটী পদ। আমরা ভগবানের এই তিনটী শক্তি ভুলিয়া ভগবানের বিক্রম বুঝিতে পারিতেছি না, 'কৃষ্ণ'কে আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগম্য মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি; তাহাতে আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের তোষণ হয়,—অমুক বড়লোক, অমুক অর্থদাতা, অমুক দেবতা সন্তুষ্ট হইবে—এরূপ নহে। কৃষ্ণবস্তুকে জড়-ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা মায়াবদ্ধ-জীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ অগ্রসর করিয়া দেওয়া মাত্র।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত—'ভগবানের হাত, পা, চক্ষু, নাক, মুখ, শরীর—সব কাটিয়া-দেও (!), ভগবানের সমস্ত ভোগ কাড়িয়া লও (!), যত ভোগের যন্ত্র ও ভোগের উপাদান মানুষ পশু, পিশাচাদির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।' কিন্তু 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' বিষ্ঠার তাজা ও শুক্না অবস্থাদ্বয়, উভয়ই পরিত্যাগের বস্তু।

'কৃষ্ণ' একজন ইতিহাসের মানুষ, 'কৃষ্ণ' একজন আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু—এইরূপ বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজন হয় না, মায়ার ভজন হইয়া থাকে। 'অহং মম'-বুদ্ধি লইয়া কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পিত্ত-বৃদ্ধি করিলেও শ্রীনামের কৃপা লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না,—

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥"

অশ্রদ্দধানকে হরিনাম উপদেশ করতে হবে না। অশ্রদ্দধান কে?—যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখ্‌ছি,—প্রতিমা একটা জিনিস আর ঠাকুর একটা জিনিস। এরূপ ভেদ দর্শন অশ্রদ্ধা হ'তেই উপস্থিত হয়। 'আমি প্রতিমা দেখ্‌ছি'—এরূপ বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি; আর "শ্রীবিগ্রহ আমাকে দে'খছেন, আমার অনাবৃত স্বরূপকে দে'খছেন," ইহাই হ'ল শ্রীবিগ্রহ-দর্শন।

শিক্ষাষ্টক

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩ পৃষ্ঠার পর]

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য ? না, ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখমোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পঞ্চ শ্লোকে সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুগুরু-চরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধিজনিত অবিদ্যারূপ অনর্থ-নাশ, তদনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসার বৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অখণ্ড একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চিৎকার, শরীর-মোটন, হুঙ্কার, হাই, প্রভূতশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎপরিমাণে ক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে

লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা-প্রার্থনাস্থলে সাধক এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,—"হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতদিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদগদভাবে স্বরভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাম! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দ-বিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।"

রতিরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণতা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয়-দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ-বুদ্ধি। রতি মমাতিশয়যুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতুসকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রমযোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশয্যপ্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবান্‌ও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে স্নেহ বলি। তদবস্থায় মহাবাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ। সংযোগপর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিষয়-সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে জন্মগ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অসমোর্দ্ধ চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগসময়ে নিমেষের অসহতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে

কল্পপ্রায় হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শনদ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ন'ন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মার্জ্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্য-বশতঃ ঐ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধনকার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন, যথা :—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
>
> (ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

॥ শ্রীচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আমার প্রভুর মহিমা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে॥
অতিমর্ত্ত্য চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে।
জীব-দুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম দায়িনে॥

মদভীষ্টদেব পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া তাঁহার অনন্ত মহিমার মধ্যে এক কণ স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বর্ত্তমানে যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সেই সময় অস্মদীয় পরম গুরুদেব আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ ও অন্যান্য গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রকট ছিলেন। মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আদেশে তখন কলিকাতাস্থ ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডস্থ শ্রীভক্তি-বিনোদ আসনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় উক্ত স্থানে মঠ ছিল। পরবর্ত্তিকালে উক্ত মঠ বাগবাজারে স্থানান্তরিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ নামে খ্যাত হয়। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রকটকালীন শ্রীচৈতন্য মঠে প্রচুর সব্জী চাষ হইত। ঐ শাকসব্জী শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতা ও অন্যান্য মঠে প্রেরিত হইত। একদিন শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতায় কয়েকটী সব্জীর বস্তা ট্রেনে প্রেরিত হইয়াছিল। মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম এবং প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (পূর্ব্বনাম শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী) এবং আরও কয়েকজন ব্রহ্মচারী ঐ সব্জীর বস্তাগুলি লইবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন আসিবার পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন হইতে সব্জীর বস্তাগুলি প্ল্যাট্ফরমে ফেলিবামাত্র মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু সবচেয়ে বড় বস্তাটি লইবার জন্য ছুটিয়া গেলেন এবং উভয়ে উক্ত বস্তাটি ধরিলেন। সেই সময় শিয়ালদহ হইতে উল্টাডাঙ্গা পর্য্যন্ত মঠে সব্জীর বস্তাগুলি মাথায় করিয়া আনা হইত। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—"এই বড়

বস্তাটি আমি মাথায় করিয়া লইয়া যাইব।" শ্রীসিদ্ধস্বরূপ প্রভু বলিলেন,—"আমি লইয়া যাইব।" তখন শ্রীল গুরু-মহারাজ বলিলেন,—"তুমি বয়সে ছোট, তোমার কচি হাড়, তুমি বড় বস্তাটি লইতে পারিবে না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি বড় বস্তাটি লইয়া যাইব। তুমি বয়সে ছোট, ছোট বস্তাটি লইবে।" শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শিয়ালদহ হইতে উল্টাডাঙ্গা পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করত সবচেয়ে ভারী বস্তাটি মাথায় করিয়া মঠে লইয়া আসিলেন।

যদ্যপি মদীয় আরাধ্যদেব জমিদারের সন্তান ছিলেন, তথাপি এইভাবে নিরভিমান হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবার এক জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করিলেন। জগৎকে তিনি জানাইলেন,—ধনের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। নিরভিমান বৈষ্ণবের অন্যতম প্রধান গুণ। সেইজন্য পরমপূজ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৮)

বর্ত্তমানে আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য কিছু আনিতে আদিষ্ট হইলে অগ্রে রিক্সা ভাড়া চাহিয়া থাকি। ইহা কিন্তু বৈষ্ণবসেবার আদর্শ নহে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রত্যেকেরই সাধ্যমত কায়ক্লেশ করা উচিত।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও বৈষ্ণবোচিত তৃণাদপি সুনীচ গুণে ভূষিত ছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। এতৎপ্রসঙ্গে আমি আর একটী ঘটনা বর্ণন করিতেছি।—

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম এক সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যখন বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তত্রস্থ শ্রীমন্দিরটি প্রকাশিত হইয়াছেন। একদা সেই সময় শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উক্ত মঠে শুভ বিজয় করত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর হইতে "কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র, কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র" বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের সকাশে উপনীত হইয়া প্রণত হইলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে দর্শন করিয়া "কেশবের মাথায় গিরি, কেশবের মাথায় গিরি" বলিয়া তদীয় সতীর্থকে প্রতি নমস্কার করিলেন। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।"—এই শাস্ত্রবাণীর আদর্শ জগতে পুনঃস্থাপন করিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপের আর একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। জনৈক ভদ্রলোক মঠে আসিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কি এই মঠের অধ্যক্ষ?' তদুত্তরে তিনি দৈন্যসহকারে বলিলেন,—"আমি মঠের একজন

নগণ্য সেবক।" তারপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে হরিকথা শ্রবণ করাইলেন। তাহাতে ঐ ভদ্রলোক দুর্ব্বোধ্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি দর্শন করত অভিভূত হইলেন। পরে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করায় আমরা বলিলাম—আপনি এতক্ষণ ধরিয়া যাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলেন তিনিই মঠাধ্যক্ষ। তখন তিনি বলিলেন,—"যিনি মঠের সর্ব্বোচ্চ পদ অলংকৃত করিয়া আছেন, তাঁহার এইরূপ দৈন্য, বিনয়, নম্রতা! সত্যই তিনি মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' ধর্ম্মের সুযোগ্য প্রচারক। তাঁহার বাগ্মীতা ও বৈষ্ণবোচিত গুণ-মহিমা দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলাম।" তৎপরে ঐ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেওয়া হইল। তিনি পুনরায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউকে প্রণাম নিবেদন করত শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

প্রকৃত স্বার্থদর্শী কে ?

স্বার্থপর দুনিয়ায় কৃষ্ণবিমুখ জীবসকল জড়ীয় স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ আত্মকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত একে অপরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। স্বার্থপর লোকজন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের সহিত ভালবাসার অভিনয় করে।

অর্থতত্ত্বানভিজ্ঞ, অপূর্ণমনোরথ ও স্বধর্ম্ম বিমুখ ভোগ-পরায়ণ স্বার্থপরগণ নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেব্য ভগবান্ বলিয়া কল্পনা বা প্রচার করে এবং স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণাগ্নির ইন্ধনরূপে অপরকেও চালিত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুক্ত ভোগিগণ কখনও পরের মঙ্গল দেখিতে পারে না।

ইহ জগতে জীবের যত প্রকার মঙ্গল হইতে পারে, সকল মঙ্গল অপেক্ষা হৃদয়ে ভগবৎসেবা প্রবল থাকিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল লাভ হয়। পার্থিব জগতের শ্রেষ্ঠতা ভগবৎসেবার তারতম্য বিচারে অতি নগণ্য। ভগবৎ-সেবা বৈমুখ্যক্রমে জীবের বদ্ধভাব উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াই জড়বস্তুর নাম,

রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। ফলস্বরূপে তাহারা নাম রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করে না। কোন বিবেকী পুরুষই জগদীশ্বরের আরাধনা বাদ দিয়া বিষয়সুখ বাঞ্ছা করে না, যে বিষয়ভোগ নরকেও বর্ত্তমান। সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন।

হরিবিমুখ মানবগণ স্ব-স্ব ভোগপর বিষয়কথা হৃদয়ে স্থান দেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ যাহাদের উপলব্ধি হইয়াছে তাঁহাদের হৃদ্‌গত বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। 'স্ব' শব্দের অর্থ শুদ্ধ আত্মা, আর অর্থ' শব্দের অর্থ প্রয়োজন। অতএব 'স্বার্থ' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ আত্মার প্রয়োজন'। কৃষ্ণপ্রেমই শুদ্ধ আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তু। কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিত্যাবৃত্তি উপাধিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিবর্ত্তই জীবের অভক্তিমূলক ধারণা। ভগবৎসেবোন্মুখতা-রূপা আত্মবৃত্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধ জীবের পুত্র-কলত্রাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি এবং জড় রূপ-রসাদির প্রতি ভোক্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান্ থাকে। নিজ-স্বরূপ উদ্‌বুদ্ধ হইলে মুক্তপুরুষগণ ইন্দ্রিয়সুখদ জড়বস্তুসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি বা অভ্যুদয় প্রভৃতিতে উদাসীন হন।

জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবা উন্মেষিত হইলে জড় জগতের ভোগের ব্যাপারগুলি নশ্বর ও অনুপাদেয় হইয়া যায়। জীব ভগবৎসেবারূপা সৌভাগ্য লাভ করিলে তবেই বুঝিতে হইবে তাহার প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে। ভগবৎ-সেবকই প্রকৃত স্বার্থদর্শী। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ দ্বিজপত্নীগণকে বলিয়াছেন,—

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ (ভাঃ ১০।২৩।২৬

"স্বার্থদর্শী বিবেকী ব্যক্তিগণ আত্মা এবং প্রিয়রূপী আমার প্রতি সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধানরহিত নিরন্তরা ভক্তির যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতের অন্যত্রও ইন্দ্র বলিয়াছেন,—

আরাধনাং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥ (ভাঃ ৬।১৮।২৪)

"যাঁহারা ভগবানের আরাধনাভিলাষী হইয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, এমনকি, মোক্ষকে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থনিপুণ বলিয়া কথিত হন।"

সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে জীবের আর কোন দুষ্প্রাপ্য থাকে না, অন্যান্য সর্ব্ববিধ কল্যাণ তাঁহার নিকট তুচ্ছ ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। যিনি

একান্ত ভক্তির সহিত ভগবানের ভজনা করেন, সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষ ভগবান্ ভক্তের অন্তরের শুদ্ধভাব অবগত হইয়া তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তিবিষয়ে স্বয়ংই বিধান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৩।১৩।৫১) এই শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"ভগবান্ সকল মঙ্গল-নিলয়। তাঁহার প্রসন্নতা হইলে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। ভগবৎ-প্রসন্নতা ব্যতীত আর সকল লাভই নিতান্ত হেয় ও অপ্রয়োজনীয়। ভগবদ্ভক্তগণের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য—ভগবানের সেবা এবং সেই সেবাফলে ভগবান্ সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান্ যে ক্ষেত্রে জীবকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপা তুচ্ছ ফল প্রদান করেন না, সেই স্থলে মুক্তজীব তাঁহার প্রেমা লাভ করেন। বদ্ধদশায় ইন্দ্রিয়ের সুখসমৃদ্ধির অভাব দেখিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ভক্তের ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ ঘটিল না।"

যে ব্যক্তি এই দেহকে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মদ্বারা বিরচিত বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি আর এই দেহে কিছুতেই আসক্ত হন না। যাহার এই দেহের প্রতি কোন আসক্তি নাই, তাহার কিরূপে এই দেহ হইতে সমুৎপন্ন গৃহ, অপত্য ও ধনাদিতে মমত্ববুদ্ধি জন্মাইবে? প্রত্যেক সৌভাগ্যবান্ ও স্বার্থদর্শী জীবই ইতর বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনপূর্ব্বক নিত্যশান্তি লাভ করেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে

সকাতর প্রার্থনা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠার পর]

তব আবির্ভাব হয় এই শুভদিনে।
আসিয়াছে কত ভক্ত না যায় গণনে॥
কত উপহার তারা আনিয়াছে সবে।
কত উপচারে তারা চরণ পূজিবে॥

তাহা দেখি' মোর চোখে অশ্রু বহে যায়।
কি আছে আমার প্রভু কি দিব তোমায় ??
তবু সাধ হয় তব চরণ পূজিতে।
ব্যথা ভরা প্রাণ-অর্ঘ্য শ্রীচরণে দিতে॥
অশ্রুজল ছাড়া আর কি আছে আমার।
সেই জলে ধোয়াইব চরণ তোমার॥
তুমি যদি কৃপা করি' ভক্তি দান কর।
সেই ভক্তিপুষ্পে পূজা ক'রব তোমার॥
অজ্ঞান-তিমির নাশি' যদি দাও জ্ঞান।
সেই জ্ঞানদীপ জ্বালি' করিব অর্চ্চন॥
তব গুণগাথা সব সুধূপের মত।
সৌরভেতে ভরে গেছে সমগ্র জগৎ॥
সেই ধূপ দিয়ে তব আরতি করিব।
মন-প্রাণ তব পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব॥
অজ্ঞান অবোধ আমি মূঢ়মতি নারী।
তোমার সন্তান ব'লে দম্ভ মাত্র করি॥
অধমের পূজা যদি করহ গ্রহণ।
তবেই জানিব তুমি অধমতারণ॥
অচিন্ত্য মহিমা তব অসীম গরিমা।
কেমনে বর্ণিব আমি তোমার মহিমা॥
যাহা জানাইবে তুমি হৃদয়ে বসিয়া।
তাহাই বর্ণিব কিছু মুক্ত করি' হিয়া॥
আমার ভরসা মাত্র তোমার চরণ।
বঞ্চিত না হই যেন জীবনে কখন॥
সকলের কাছে আমি ঘৃণ্য যে এখন।
তুমি যেন মোরে ঘৃণা না কর' কখন॥
সর্ব্বহারা আজ আমি, দিশেহারা হয়ে।
তোমার চরণ চেয়ে আছি গো বসিয়ে॥

কৃপা করি' মোরে তুমি না ঠেলিও পায়।
দৃঢ় করে বেঁধে রেখো তব রাঙ্গা পায়॥
কোন্ অপরাধে মোর হেন দশা হল।
বুঝিতে না পারি কিছু, কৃপা করি' বল॥
অপরাধ ক্ষমি' মোরে দেহ পরিত্রাণ।
তব কৃপা বিনা মোর নাহিক এড়ান॥
সতত তোমার পদে মতি যেন রয়।
বিস্মৃত না হই যেন মরণ সময়॥
আর এক নিবেদন চরণে তোমার।
গৌর-নিত্যানন্দপদে রতি হোক আমার॥
তাঁদের চরণে যেন মতি থাকে মোর।
রাধাকৃষ্ণপদে ভক্তি জন্মায় প্রচুর॥
তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥
তাঁদের চরণসেবা করিবারে পারি।
সেবা অধিকার দাও তুমি কৃপা করি'॥
সেবা অপরাধ যেন না হয় আমার।
এই নিবেদন মোর চরণে তোমার॥
এই আশীর্ব্বাদ প্রভু কর মোরে তুমি।
তোমার কৃপায় যেন তরে যাই আমি॥
মারিবে, রাখিবে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
নিত্যদাসী প্রতি হয় তব অধিকার॥
যখন যেভাবে তুমি যেখানে রাখিবে।
সেখানে ত' অবশ্যই থাকিতে হইবে॥
শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর মোরে তুমি।
তোমার চরণ কভু নাহি ভুলি আমি॥
তোমার চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জীবনে মরণে মোর এই অভিলাষ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি হও গো আমার।
আমার সকল আশা পূরাও এবার ॥
জন্মে জন্মে করি আশা চরণ সেবিব।
তোমার সেবক হয়ে চরণে থাকিব ॥
জন্মে জন্মে পাই যেন চরণেতে স্থান।
সেবক করিয়া রেখো এই নিবেদন ॥
অপরাধ না হয় যেন বৈষ্ণব চরণে।
বৈষ্ণবের কৃপা যেন পাই সর্ব্বক্ষণে ॥
তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিব।
তোমার চরণ সেবা সতত করিব ॥
এই মোর অভিলাষ হয় সদা মনে।
আমার এ আশা তুমি পূরাও এক্ষণে ॥

—**শ্রীযুক্তা উষা দেবী**, মেদিনীপুর

আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীগুরুদেব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠার পর]

গুরু কৃষ্ণরূপ

কোন ভাগ্যবলে সংসারে ভ্রাম্যমান্ জীব শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাবলে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সদ্‌গুরু মাধ্যমে কৃপা করিয়া থাকেন। তখন শ্রীকৃষ্ণকৃপা হইতে গুরুকৃপা স্বতন্ত্র কিছু হয় না। বরং গুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপার বহিঃপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" অর্থাৎ শ্রীগুরুর কৃপা হইলে ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপা হয়। গুরুকৃপা না হইলে অন্য কোন গতি নাই।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ —এই দুই রূপ ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫,৪৭)

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

অন্যত্র— "কৃষ্ণ এব পরং মন্ত্রং কৃষ্ণ এব স্বয়ং গুরুঃ।

গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই মন্ত্র এবং গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক ও কুমতি-প্রচালিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে অগ্রসর হওয়া অনুচিত।

এইপ্রকারে সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচার আছে। সেখানে কৃষ্ণের সমতা হইতে ভক্তপদকে বড় বলা হইয়াছে। ইহাকে গৌড়ীয় আচার্য্যগণ প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'সনাতন শিক্ষায়' ভগবান্ চৈতন্যদেব গুণাবতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মা এবং শিব জীবকোটীর অন্তর্গত (কিন্তু বিষ্ণু ঈশ-তত্ত্ব)। তাঁহাদিগকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ামকত্ব দান করা হইয়াছে। এই প্রকারে তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয়ত্ব নিবন্ধন জগদ্গুরু পদে বৃত হইয়াছেন। সদ্গুরুকে জগৎ ধ্বংস বা সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব না দিয়া শ্রীগোবিন্দ স্বতন্ত্র ইচ্ছায় পতিত জীব উদ্ধারের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক। এই ভাবই স্কন্দপুরাণে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥"

অর্থাৎ গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ স্বরূপ এবং গুরুদেব এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ **দাস-তত্ত্ব।**

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যের দাস হইলেও **ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরুদেব।** গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। **শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ**

হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ ॥
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥
নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান ॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পঃ)

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা-সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"—অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। যথা,—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাস্ম ॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

প্রাচীনবর্হি-তনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্র-গীতদ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দেখা যায়। প্রচেতাগণ বলিলেন,—"হে ভগবান্! আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুঃশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্-শ্রেষ্ঠ আত্মগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবান্ কৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগজনের রাগানুগমার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ (মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর-পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে, গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৫৫)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
(গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক জানিতে হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ। তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

স্ববর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডের জল পুরি',
তুঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥

গুরুসেবা কর্ত্তব্য

উপসংহারে বক্তব্য এই যে,—

গুরুরেব জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাদারাধয়েদ্ গুরুম্॥ (শক্তিযামল)

অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপী গুরুই জগতে একমাত্র সর্ব্বস্ব। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, অতএব গুরুদেবের সেবা করিবে। যাবৎ গুরুদেব প্রসন্ন না হন, তাবৎ শিষ্য তাঁহার সেবা করিবে।

শিবতন্ত্রে ও কুলার্ণবে বলিতেছেন,—হে কুলনায়িকে! ইহলোকে গুরুই সর্ব্ব-ক্রিয়ার মূল। অতএব সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য গুরুসেবা করিবে।

মাহেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে মাহেশ্বরি! গুরুভক্তিদ্বারা যেরূপ সমুদয় সিদ্ধিলাভ হয়, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রতাদিদ্বারা সেইরূপ লাভ হয় না।

পদ্মপুরাণে,—কেবলং গুরুশুশ্রূষা তৎ কৃপাকারিণি হরে।
সদ্ভক্তিসহিতা সা চেৎ সর্ব্বকামফলপ্রদা॥

হে হরি! কেবল গুরুর শুশ্রূষাই তোমার কৃপাকারণ, যদি সদ্ভক্তির সহিত সেবা করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করেন।

কুলার্ণবে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ।
সিদ্ধ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি গুরুশুশ্রূষয়া প্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! গুরুশুশ্রূষা করিলে সমস্ত পাপক্ষয় হয়, পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হয় এবং সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু—

সর্ব্বস্বমপি যো দত্যাদ্ গুরৌ ভক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
শিষ্যো ন ফলমাপ্নোতি ভক্তিরেবহি কারণম্॥

ভক্তিশূন্য হইয়া গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করিলে শিষ্যের কোন ফল হয় না, যেহেতু ভক্তিই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ। গুরুতন্ত্রে বলিয়াছেন,—হে মহেশ্বরি! গুরুদেবে যাহার ভক্তি নাই, তাহার ধনে, বলে ও চেষ্টায় ধিক্।

পরিশেষে শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্র-গুরুগণকে প্রণাম জানাই। অনেকস্থলে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরু একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পাদপদ্মে কোটি প্রণাম। শিক্ষাগুরু বহু হইলেও মন্ত্রগুরু কভু বহু নয়; তিনি সাধকের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণতলে স্থান প্রার্থনা করি।

—**শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী**

"সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটী প্রধান কার্য্য। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময়, পরীক্ষার স্থল; সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনে সহায়। সকলে মিলিয়া মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিভজন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপ-রঘুনাথের পাদপদ্ম-ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"

"ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্য-কৃষ্ণসেবাপর। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।"

—**শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ**

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"

ভক্ত ও ভগবান্ একই বৃন্তে ফুটে ওঠা দুটী ফুলের মতো। ভক্ত ছাড়া ভগবানের কোন অস্তিত্বের কথা যেমন একেবারেই কল্পনার অতীত, ঠিক্ তেমনই ভক্তের কাছে ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কথা অপ্রাসঙ্গিক, অবাঞ্ছনীয়। বহু আকাঙ্ক্ষিত মহামিলনের পর ভগবান্ কেমন করে যেন ভক্তদেহে মিলিয়ে যান। ভক্তের এতটুকু কষ্ট, এতটুকু দৈন্য, এতটুকু সংকীর্ণতা কিছুতেই ভগবান্ মেনে নিতে পারেন না। নিজের প্রাণের শেষ রসবিন্দুও যদি ভক্তরক্ষায় দিতে হয়, তাহলেও তিনি প্রস্তুত, তবুও ভক্তের কষ্ট দেখা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ভগবানের কর্ণকুহরে ভক্তের সেই আকুল আবেদন বার বার প্রতিধ্বনিত হয়—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ-মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুলশীলজাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা,
না জানি ভজন-পূজন॥

ভজন-পূজন আমি কিছুই জানি না যে—কেমন করে ডাকতে হয়, কোন্ মন্ত্র দিয়ে তোমাকে আমি মনের মাঝে ধ্যান করব—তা আমার জানার গণ্ডীর বাইরে।

কি যে করি হায়, কি হয়ে উপায়,
বুঝিতে পারে না এ অবলা।

সত্যিই বুঝে উঠতে পারেন না ভক্ত। ভগবানকে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে দোলায়িত হতে হতে কোন অবসরে খুব বেশি একা হয়ে পড়েন। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের যোগ ও ক্ষেম রক্ষা করা বোধ হয় তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাহলে, তিনি কি করবেন? বাঁচবেন কেমন করে? ভক্ত যোগ ও ক্ষেমের কথা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেন না যে। অসহায় ভক্ত শুধু মনকে শ্রীহরিস্মরণে সরস করে রাখেন। অথচ নিজের বাড়ীর অবুঝ আত্মীয়-স্বজনরা, পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই মিলে তাঁকে শুধু পরিহাসেই করে চলেন। ভক্ত কেঁদে ওঠেন ডুক্‌রে, শুধু নিজের ব্যথার বা নিজের অপমানের জন্য নয়—তাঁর পরম-প্রিয়তমের চরম লাঞ্ছনার জন্য। আজ ভক্ত ও ভগবান্ ত' আলাদা নয়—তাঁরা যে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গেছেন। ভক্তকে চরম দুঃখের হাত থেকে কেমন করে বাঁচাবেন—ভগবান্ সেই

চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ভক্তকে যারা কষ্ট দেন—তাদের উদ্দেশ্যে ভগবান্ বলে ওঠেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" (গীঃ ৯।২২)

ভক্তকে যেন নিজের করে বলে ওঠেন—যে 'একাগ্রচিত্তে আমাকে ডাকে, তার যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি।' ভক্ত হতবাক্ হয়ে পড়েন, একি! এ কিরকম কথা শুনছেন ভক্ত? তাঁর (ভক্ত) জন্য ভগবান্ তাঁরই যোগ ও ক্ষেম বহন করবেন?

এই না মহামিলন? ভক্তের সুখে ভগবান্ সুখী আর ভগবানের দুঃখ যেন বার বার ফেটে পড়ে ভক্তের দুঃখে। কিন্তু তাই বলে ভগবান্ যে এতখানি বহন করবেন, তা যে ভক্তের কল্পনারও বাইরে। তিনি কি এতখানি ভাগ্য করে জন্মগ্রহণ করেছেন? কি অদ্ভুত এই জীবন?

কী আশ্চর্য্য এই সাধনা? একের ইচ্ছাকে অপরের অধীনস্থ করা, নিজের সমস্ত সত্তাকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেওয়া, নিজের হৃদয়ের সমস্ত গুণাবলীকে অন্যের সুখের বিষয়বস্তু করে তোলা, সে কি কম কষ্টের? কতদিনকার সাধনা, ধ্যান, ভজন-পূজন কিংবা কতদিনের গভীর ভালবাসা না থাকলে পরমপিতা ভগবান্ ভক্তের জন্য এতখানি স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন, তা ভাবতে বসলেই হৃদয়বিদীর্ণ করা অশ্রু কোথা থেকে এসে কপোল বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে। 'যোগ' ও 'ক্ষেম' তিনি অন্যের দ্বারা বহন করান নি, নিজের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষিত করে ভক্তের সুখক্রিয়ায় ঢেলে দেন আপন মনে। ভক্ত ভগবানের বড় প্রিয় হন। ভক্ত তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে বলে ওঠেন,—

"তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দু'টী চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥"

—**শ্রীমতী কুহু বেরা,** অমর্ষি (মেদিনীপুর)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার ২০ পঙ্ক্তিতে "অর্দ্ধক্কুকুটীর" স্থলে "অর্দ্ধকুক্কুটীর" এবং ১৫৩ পৃষ্ঠার ১৮ পঙ্ক্তিতে "পারেন বা," স্থলে "পারেন না," হইবে।

অমৃতযোগের সন্ধান

রোগ হইলেই ভোগ আরম্ভ হয়। শেষে যোগ হয়। এই যোগ দুই প্রকার—(১) অমৃতযোগ, (২) মৃতযোগ। কাহারও ভাগ্যে আরোগ্যযোগ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ; ইহাই অমৃতযোগ। আবার কাহারও ভাগ্যে মৃত্যু ও দেহত্যাগ; এইটী মৃতযোগ। রোগের যখন ভোগ হইতে থাকে তখন যদি সদ্বৈদ্যের শরণ লইয়া সিদ্ধ ঔষধ সেবন এবং কুপথ্য ভোজন ত্যাগ করা না হয়, তবে রোগী কখনই আরোগ্য হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

দেখা যায়, অনেক সময় সামান্য ব্যাধি বিনা চিকিৎসায় আপনিই নিরাস হয়। স্বভাবই সেখানে রোগীকে আরোগ্য করে। সেখানে স্বভাবের সুনির্ম্মল জলবায়ুই রোগীর রোগ-বিনাশের সহায় হয়। কিন্তু সবল ও স্বাস্থ্যশীল দেহেই তাহা হয়। দুর্ব্বল দেহে ও অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে তাহা হয় না। তথায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়; শেষে সর্ব্বনাশ ঘটে।

এই রোগ জীবদেহে বহুরূপে আধিপত্য বিস্তার করে; সুতরাং ভোগও নানারূপ হয়। এই যে রোগের কথা আজ আমরা তুলিয়াছি, এই রোগ দৃশ্যমান্ জড়দেহগত বা স্থূলদেহগত নহে; এ রোগ সূক্ষ্মদেহগত বা লিঙ্গদেহগত। এই রোগই জীবের দুরারোগ্য ব্যাধি। একটী জড়দেহ লইয়াই ইহা শেষ হয় না। ইহা একের পর অন্যদেহে অনুগমন করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া জীবকে ভোগ দেয়। এই কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

> "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
> গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ (গীঃ ১৫।৮)

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া গন্ধযুক্ত হইয়া অন্যত্র বহিয়া যায়; তেমনই জীবাত্মাও একটী জড়দেহ হইতে যখন অন্য জড়দেহ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বদেহের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গত সংস্কার পরদেহে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার ইহাই বিকারগ্রস্ত হইয়া ব্যাধির মত জীবকে আশ্রয় করে এবং জন্ম জন্ম ভোগ দেয়। ইহারই নাম মায়াব্যাধি বা ভবব্যাধি।

এই রোগ বা ব্যাধির ত্রিবিধ অবস্থা। সেই তিন অবস্থাকে তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক—এই তিন নাম দেওয়া হয়। তিন অবস্থায় তিনভাবে রোগীর বিবিধ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় মোহ ও প্রমাদ, দ্বিতীয় অবস্থায় ঐরূপ জ্ঞান

লইয়া নানারূপ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় রোগী বেশ থাকে ; আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কি ভীষণ ব্যাধি তাহার বক্ষে বসিয়া ধীরে ধীরে কি আগুন জ্বালিতেছে, তাহার কোন সংবাদই সে রাখে না। হাসিয়া খেলিয়াই কাল কাটায়। দ্বিতীয় অবস্থায়, কাম্য কর্ম্মময় জীবনে সদা ব্যস্ত, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায়, উত্থান-পতনে সদা চঞ্চল হইয়া থাকিলেও রোগ ধরা পড়ে। তাহার জন্য কখনও চিন্তা ও ক্লেশবোধও হয় ; প্রতিকার ইচ্ছাও জাগে। যিনি ভাগ্যবান্ তিনি তখন সদ্বৈদ্য পাইয়া, সিদ্ধ ঔষধ লাভ করেন এবং রোগের ভীষণ পরিণাম বুঝিয়া ঐ ঔষধ যথাবিধি সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। অপরে রোগটা যে কি ভীষণ, তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তাহা না জানিয়া অবহেলা করে। কি অজ্ঞান, সুলভ্য হাতুড়েদের কাছে অথবা পাশকরা মূর্খদের যাহা হউক কিছু 'শেকোড়' 'মাকোড়' কিম্বা একটু লাল জল লইয়া তাহা সেবন করে। তাহাতেই আরোগ্য লাভের আশা করে। আবার কেহ তাহা সেবন করিতেও অবকাশ পায় না। হয়ত' হারাইয়া ফেলে। কিম্বা গৃহিণী বা ছেলেরা কি মনে করিয়া ফেলে দেয়। ফলে উভয়েরই সমান দশা ঘটে। রোগ কাটে না। তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। কাহারও বা ঔষধই আবার বিষক্রিয়া বিকাশ করিয়া রোগজ্বালার উপর নূতনজ্বালা জ্বালিয়া দেয়। সেই জ্বালায় জীব যে কত জন্ম জ্বলিয়া মরে, কোথা হইতে কোথায় যে যায়, তাহার ইয়ত্তা করিবে কে ?

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥"

তৃতীয় অবস্থায় জীব সাধারণ যে ঔষধ পাইয়া পরম যত্নে সেবন করিয়া আপনাকে ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়াই মনে করে, তাহাও সিদ্ধৌষধ নহে বলিয়া তাহাতে রোগের উপসর্গ ক্বচিৎ দূর হইলেও, মূলোৎপাটন হয় না। তাহাতে জীবের মায়াবুদ্ধি স্থাপিত হইয়া থাকে মাত্র এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়। মূঢ়জন ইহাকেই আরোগ্য বা মুক্তি বলে, কালাতীত অবস্থা মনে করে। কিন্তু তাহা ভ্রম।

"উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০)

এরূপ আরোগ্য বা অদুঃখ অবস্থাতেও জীব কালাতীত হইতে পারে না। তাই স্বয়ং ভগবান্ জীবের এই অবস্থাকেও 'কালবিপ্লুত' বলিয়াছেন। সেকথা শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানে বর্ণিত—

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥"

এই শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। যথার্থ আরোগ্য বা বিমুক্তি উক্ত তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থাতেই সম্যগ্ লব্ধ হয়। সেই অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। ইহাকেই নিত্য সত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধ সত্ত্বাবস্থাও বলে। এই অবস্থাতেই জীব স্বরূপপ্রাপ্ত বা একান্ত নিরাময় হয়। অমৃতযোগে অমর হয়।

শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" (গীতা ২।৪৫)

তাহার উপায় কি? জীব রোগও ভোগনাশে এই পরম যোগ লাভ করিতে কাহার শরণ লইয়া কোন্ সিদ্ধৌষধ, অমোঘ ভেষজ সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে? এবার তাহাই বলিতেছি শুন।

এই দুরারোগ্য দারুণ রোগ (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ) এবং জন্মজন্মান্তরের বিষয়ভোগ (আত্মেন্দ্রিয় সুখ-দুঃখ) হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বা যোগ (আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন) লাভের জন্য আমাদিগকে সাধুবৈদ্যের শরণ লইতে হইবে, তাঁহারই পতিতপাবন পাদপদ্মে একান্ত আশ্রয় লইয়া তাঁহারই উপদেশমত বিহিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা কালাতীত হইয়া অনাময় পদে প্রবেশ লাভ করিতে পারিব, ইহাই জীবের যথার্থ অমৃতযোগ; ইহাই জীবের একান্ত প্রয়োজন। ইহার তুলনায় অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। ঐ শুন সর্ব্ববিৎ সাধুবাক্য,—

"নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হইতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২)

একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ (গীঃ ৪।৩৪-৩৫)

আর সন্দেহ কি? এস, এখন আমরা আর কেন রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কুবৈদ্যের হাতে বিষ খাইয়া, পথ্য বলিয়া কুপথ্যের ব্যবস্থা লইয়া জন্ম জন্ম জ্বলিয়া মরি? এস, শ্রীগৌরজন সাধুবৈদ্যের শরণ লই, আর তাঁহার কৃপাদত্ত মায়াব্যাধি-হর অমোঘ মহৌষধ তারকব্রহ্মনাম সেবন করি। তাহা হইলে আমরা আরোগ্য, কৃষ্ণভক্তি ও আত্মস্মৃতি লাভ করিব এবং নষ্টস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব; শুদ্ধস্বভাবে সকল সাধনায়, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের নিত্য সেবার অধিকার অর্জ্জন করিব এবং তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আত্মার পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভ-রূপ অমৃতযোগ প্রাপ্ত হইব।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কাছে পূজিত হচ্ছিলেন শালগ্রাম শিলা। এক রাণী দর্শন করতে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা হল—এঁর যদি হাত, পা, চোখ, কাণ, নাক, মুখ থাকত, তাহলে আমি বহু স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তার মালা ইত্যাদি পরাতাম। কাণে যদি ছিদ্র থাকত, তাহলে আমি সে সব গহণা পরাতাম। ভোর রাত্রে স্বপ্ন হচ্ছে—আমার সবই আছে, তুমি দেখতে পাও নাই। "বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি। মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি॥" তুমি যা গহণা দিতে চেয়েছ দাও। এসে দেখ, আমার হাত, পা, চোখ, কাণ, নাক, মুখ সব আছে। তখন রাণী এসে দেখেন শালগ্রাম শিলা থেকে উঠেছেন রাধারমণ মূর্ত্তি। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তের বাঞ্ছাপূরণকারী ভগবান্। সমস্ত সাধনার ফল হচ্ছে—ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করা। তিনি কাকে কিভাবে সেবায় নিযুক্ত করছেন, করবেন, সেটা সেই প্রেমময় ভক্তবৎসল ভগবানই জানেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর। আমরা জেনে নিয়েছি, বুঝে নিয়েছি বলে যে অহঙ্কার করি, সব বৃথা।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করতে গেলে যে-সব বিধি-বিধানগুলো আছে, এগুলো ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে আছে। বিশেষতঃ 'ঊর্জ্জাদর' এই কথা লেখা আছে। জিনিসটাকে অস্বীকার করা হয় নাই। কাকেও গৌণ করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় নাই। ঊর্জ্জাদর চার মাস নিয়ে চলতে হবে। সব জিনিসের মধ্যে একটা চিন্তা-ভাবনা আছে। যদি নিয়ম ছাড়া আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করি, তাহলে শাস্ত্র

তাকে বলে মূর্খ। 'চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো'। আবার কি বলা হল? 'জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।'—সেই ব্যক্তি—যিনি বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করছেন, তিনি জীবন্মৃত। নিয়ম যা আছে তা পালন করতে হবে।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করার একটা বিশেষ বিধি-বিধান আছে। বাড়ীতে থেকে এই ব্রত করলে যা ফল হবে, তার থেকে শত সহস্রগুণ অধিক ফল হবে কোন তীর্থে বা ধামে গিয়ে করলে। প্রমাণ আছে,—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥

শিবঠাকুর শিবানীকে বলছেন,—'ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ'—গৃহে করবে না ওটা, 'তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ'—তীর্থে করতে হবে। শিবানীকে তিনি এই উপদেশ দিচ্ছেন। শাস্ত্রে এই কথা বলছেন।

ঊর্জ্জেশ্বরী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে দামোদর—যাঁর উদরে দামবন্ধন পড়েছে, তিনি পূর্ণ শক্তিমান্ তত্ত্ব। সেইজন্য তিনি একাকী পূজা গ্রহণ করছেন না। 'দামোদর'-শব্দের অর্থ যদি হয় ঐ বাচ্চা ছেলেটা, ঐ ছেলেটাত' চোরের সর্দ্দার। 'চোরের সর্দ্দার' তার আবার স্তব-স্তুতি—'চৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্'। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

গ্রন্থ আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাচ্ছি, বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে—স্বয়ং ভগবান্ আবার চুরি করতে যাচ্ছেন কেন? শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন,—ওটা ত' তাঁর লীলা। এ উত্তর সবাই মেনে নিতে পারছেন না। যারা মেনে নিতে পারছেন না তারা বলছেন—"কৃষ্ণের বেলায় লীলাখেলা, যত দোষ মানুষের বেলা?" তাদের জন্যই লেখা হয়েছে—'অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।' ঈশোপনিষদের মধ্যে লেখা আছে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

এ জগতে যা কিছু আছে, হে ভক্তগণ! হে মানবগণ! জেনে রাখ এর সবই আমারই দেওয়া। আমি ছাড়া কারও কোন পরিচয় নাই। সবই আমারই সৃষ্টি। সৃষ্টি যখন আমি তোমাদের করেছি, তখন তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও আমি সব রেখেছি। তোমরা কি করবে?—ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে গ্রহণ কর ওটা। ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে গ্রহণ করা কাকে বলে? এর সুন্দর ব্যাখ্যা গীতার মধ্যে আছে। ভাগবতের মধ্যেও খুব ভালভাবেই আছে। ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে ভোগ কাকে বলে?—ভগবানের দেওয়া জিনিস ভগবানকে দিয়ে খাওয়া,

ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করা। অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করবেন না ভক্ত, বারবার নিষেধ করা হয়েছে। নিবেদিত বস্তুই (প্রসাদ) ভক্ত গ্রহণ করছেন, করবেন। সমস্ত বস্তু ভগবানকে দেব, এটাও ত' বিচারের কথা।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

ভগবানের দেওয়া জিনিস ভগবানকে দিয়ে খেতে হবে। যদি না দিই তাহলে চুরির দায়ে পড়ে যাব আমি। চোর চুরি করলে তার যে দায়, যে সাজা, সে সাজা আমাকে গ্রহণ করতে হয়। সব শাস্ত্রে একই কথা আছে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত এদিক্ ওদিক্ নড়চড় হওয়ার নয়। কথাগুলো ত' এইভাবে বুঝানো আছে—ভগবানের জিনিস ভগবানকে দিয়ে খেতে হবে—এটাই হল বিশেষ শিক্ষা। অতএব 'ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে গ্রহণ কর?' মানে ভগবানকে নিবেদন করে অবশেষ গ্রহণ কর। তা না হলে তোমাকে পাপস্পর্শ করবে।

আমাদের দেশের একজন বৈজ্ঞানিক, নাম তাঁর হচ্ছে—জগদীশচন্দ্র বোস। ইনি আবিষ্কার করেছেন—**Radio wireless system**। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক মার্কনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভারতবাসীরা তখন পরাধীন জাতি, ক্রীতদাস-জাতি। বৈজ্ঞানিক জগতে এঁদের নাম হবে? জগদীশ বোস তাঁর আবিষ্কারের একটু বলে দিয়েছেন মার্কনিকে। সঙ্গে সঙ্গে নাম হয়ে গেল—**Marcony Theory**। তলিয়ে গেলেন জগদীশ বোস। এরকম ত' কত ঘটনাই ঘটছে। সেই জগদীশ বোসের নিকট কতকগুলো প্রশ্ন এসেছিল। তাঁর সময়ে অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা চলত। একটা পত্রিকা আমি পড়েছি। তার ভিতরে জগদীশ বোসের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে—আপনি ত' যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গাছও হাসে, কাঁদে। কেউ একখানা দা নিয়ে যদি গাছকে কাটতে যায়, তাহলে গাছ শিউরে ওঠে, কাঁদতে আরম্ভ করে। একটা পাঁঠাকে বলি দিতে গেলেও পাঁঠাটা বুঝতে পারে, শিউরে ওঠে। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে বৈষ্ণবেরাও ত' লাউয়ের ডগা খায়, শাকসব্জী খায়, তাহলে তাঁদেরও ত' হিংসা হয়, পাপ স্পর্শ করে। আপনি এর মীমাংসা করুন।

সেই পত্রিকার মধ্যে জগদীশ বোস প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, লিখেছেন প্রবন্ধে—এ প্রশ্ন আমার কাছে করার দরকার ছিল না। আপনারা যদি ধীর-স্থিরভাবে মুনি-ঋষিগণের শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করেন, তাহলে দেখবেন তার ভিতরে এর ভালরূপ উত্তর দেওয়া আছে। আমাকে যখন এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে বলছেন, আমি বিশ্লেষণ করছি,—

বিনা প্রয়োজনে একটা তৃণকেও যদি উপড়ে ফেলেন, তার একটা অংশ যদি কেটে ফেলেন, আপনার পাপ স্পর্শ করবে। বৃক্ষ, তৃণ গুল্ম, লতা, পাখী, পশু, মানুষ—সাধন-ভজন করা মানুষ, সিদ্ধ-মহাত্মা—যাঁর ভিতরে চেতনতার অধিক প্রকাশ লক্ষ্য কর যাচ্ছে, তাঁকে যদি নাশ করেন, ধ্বংস করেন আপনি, তাহলে সেই পরিমাণে আপনাকে পাপ স্পর্শ করে। পরে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন,—একটা সাধারণ গাছকে কাটলে যে পাপ হবে যদি কেউ চৈত্যবৃক্ষকে নাশ করে, তাহলে তার বেশী পাপ স্পর্শ করবে। তার থেকে বেশী পাপ হবে একটা **Reptile**—সরীসৃপ, উরগ প্রাণীকে মারলে। তার থেকে বেশী পাপ হবে একটা পাখীকে মারলে, একটা পশুকে মারলে। তার থেকেও বেশী পাপ হবে একটা গোবধ করলে—যার ভিতরে দেবতার অধিষ্ঠান। একজন সাধারণ মানুষকে বধ করলে যে পাপ হবে, একজন সাধক বা সিদ্ধ-মহাত্মাকে বধ করলে তদপেক্ষাও বেশী পাপ হবে। এগুলো ত' শাস্ত্রে বুঝানো আছে।

বৈষ্ণবগণও ত' লাউয়ের ডগা খান, একথা বলছেন। কিন্তু বৈষ্ণবরা যাঁরা লাউয়ের ডগা খাচ্ছেন তাঁরা ত'নিজের জন্য রান্না করেন না। তাঁরা ভগবানের সেবার জন্য রান্না করেন। ভগবৎসেবার উপযোগী সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে ভোগ নিবেদিত হলে সেই জিনিস নির্গুণ হয়, তা গ্রহণ করলে পাপ স্পর্শ করে না। এই **Theory** আপনাদের জানা নাই। ঋষিগণ এটা জানিয়েছেন, আপনারা সেটা মেনে নেবেন।

আজও কিছু অধিক বুদ্ধিমান্, সবজান্তা লোক বসে আছেন, তারা কেউ কেউ বলছেন,—আরে, নিরামিষ আহারের মধ্যেও ত' গাভী-দুগ্ধাদি আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলছে—ওটা ত' আমিষ। এরও আবার বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে, আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না। সেখানে উত্তর দিয়েছেন,—তাহলে তুমিও আমিষই ভক্ষণ করেছ, মায়ের বুকের রক্তই পান করেছ। তুমি মাতৃস্তন্য পান কর নাই। আবার কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ সহজিয়া ব্যক্তি বলছেন,—পুকুর ও নদীর জলেতে ঠাকুরসেবা হয় না। পুকুরের জলে মাছ, জীবজন্তু থাকে; নদীর জলে অনেক মড়া ভেসে যায়। কেউ বলছেন,—নলকূপের জলে পূজা হবে না, ওতে ত' ওয়াসার থাকে চামড়ার। সাধু-শাস্ত্র বলছেন—তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠ চামার। তাহলে কোন্ জলে পূজা হবে, ঠাকুরসেবা হবে? গঙ্গাজল ত' নদীর জল। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ যারা, **Fertile brain**—উর্ব্বর মস্তিষ্ক যাদের, তাদের **brain**এ এইসব উল্টোপাল্টা চিন্তা-ভাবনা আসে। শাস্ত্রে ত' সব মীমাংসা দেওয়া আছে। আমি শাস্ত্রের কিছুটা মানব, কিছুটা মানব না, তা হবে না। **Positive-Negative**—মুখ্য-গৌণ সব বিচারই মানতে হবে শাস্ত্রের।

চাতুর্মাস্য-ব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা কার্ত্তিকব্রত পালনের বিশেষ বিধি-বিধান যা কিছু ব্যবস্থা দেওয়া আছে সবকিছু শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাকে কেন্দ্র করে, রাধামাধবের প্রীতি কামনাকে কেন্দ্র করেই। শ্রীদামোদর-কৃষ্ণ যিনি, তিনি কি পূজা নিচ্ছেন তাঁর শক্তিকে বাদ দিয়ে? কার্ত্তিক মাস, ঊর্জ্জব্রত মাসের অধিশ্বরী হচ্ছেন—শ্রীমতী রাধারাণী। উর্জ্জেশ্বরী রাধারাণী 'কার্ত্তিকস্যাধিদেবী' বলে স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়েছেন। কৃষ্ণ কি সেখানে উদরে দামবন্ধনযুক্ত বালগোপাল দামোদর-কৃষ্ণ? তিনি কি তাঁর শক্তিকে বাদ দিয়ে কিছু পূজা নিচ্ছেন? তা ত' নয়। এই যে আকাশপ্রদীপ দিচ্ছেন আপনারা, এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? —শ্রীরাধা-দামোদরের প্রতি ভক্তি-বিধান। সেখানেও মন্ত্রের মধ্যে ত' আছে।—

"দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

'দামোদরায় নভসি' মানে আকাশে (প্রদীপ) দেওয়া হচ্ছে দামোদরের উদ্দেশ্যে। 'তুলায়াম্' মানে কার্ত্তিক মাসে, 'লোলয়া সহ' মানে লক্ষ্মীদেবীসহ, আর এখানে 'লোলয়া' অর্থে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধাসহ। রাধারাণীর কতকগুলো নাম আছে। রাধারাণীর নাম দেবী, কৃষ্ণময়ী, রাধিকা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিময়ী, সর্ব্ব-সম্মোহিনী পরাদেবী, গৌরী, কল্যাণী, দুর্গা প্রভৃতি। শাস্ত্রে রাধারাণীর ১০০৮ যে নাম আছে তার ভিতরে ত' এগুলো রয়েছে।

"তব রক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে"—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থে দুর্গাদেবী বলছেন। ইনি মহামায়া দুর্গাদেবী নন, যোগমায়া দুর্গাদেবী বলছেন। তত্ত্বদর্শনটা যেন আমরা উল্টোপাল্টা করে না ফেলি। যিনি ভগবানের সামনে সাক্ষাদ্ভাবে আসতে পারছেন না, তিনি হলেন মহামায়া দুর্গাদেবী। কিন্তু যোগমায়াদেবী সবসময় ভগবানের লীলার সহায়কারিণী—লীলাবিস্তারিণী শক্তি।

যখন শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে পঞ্চবটী বনে আছেন, সেইসময় সীতাহরণ হয়ে গেছে। তিনি সীতাদেবীকে কি করে উদ্ধার করা যায় চিন্তা করছিলেন। এদিক্ ওদিক্ খবর নিচ্ছিলেন। এর আগে অগ্নিসাক্ষী করে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বিভিন্ন বানর-সৈন্যকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র ঐ সময় খুব ব্যস্ত, চিন্তান্বিত। জায়গাটা ছিল শিবঠাকুরের স্থান—মাদুরা। মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র, আর শিবানীর কি দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে—তিনি চট্ করে সীতার মূর্ত্তি ধারণ করে মন্দিরের বাহির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছেন, এমন সময় ঐদিকে নজর পড়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র বললেন,—মা! ভাল আছ ত' তুমি? 'মা' বাংলা-ভাষায় বললাম, ওখানে 'অম্বা'

শব্দ ব্যবহার করেছেন। অম্বে! তুমি ভাল আছ? শিবানী সীতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র ত' বুঝতে পারলেন—এ ত' আমার সীতা নয়। রামচন্দ্র চলে গেলেন। তারপর শিবানী মন্দিরে গেছেন। শিবঠাকুর বলছেন,—তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথাবার্ত্তা নাই। আজ থেকে তুমি আমার ডানদিকে বসবে অথবা আমার সামনে বসবে, আমি তোমার পূজা করব। তুমি ত' আমার উপাস্যা! তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা হল! আমার-তোমার সকলের উপাস্য যে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকে তুমি পরীক্ষা করতে গেছ তিনি অন্তর্যামী কি না? শিবঠাকুর গ্রহণ করলেন না শিবানীকে। দেহত্যাগ করে আবার নূতনভাবে আসতে হল শিবানীকে। এসব পৌরাণিক দৃষ্টান্তে ত' অনেক শিক্ষা আছে। শাস্ত্র মানেই ত' শিক্ষা, তত্ত্বদর্শন। উল্টোপাল্টা করে কারও রেহাই নাই। ভাগবতে বলছেন,—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ (ভাঃ ২।৫।১৩)

যিনি লজ্জাবশতঃ ভগবানের সামনে যেতে পারছেন না, পিছনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই মহামায়া। যোগমায়ার কোনরূপ আপত্তি নাই ওখানে যেতে, কোন নিষেধনামা নাই। সব জিনিসটা ত' তত্ত্বদর্শনের মধ্যে রয়েছে। আমি যদি তত্ত্বদর্শন না শিখি, না বুঝি, আমার সাধন-ভজন হবে না।

গুরুদেব বললেন,—তুমি হরিনাম কর, হরিনাম করলে সব হয়ে যাবে। গুরুদেব কথাটা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু হরিনাম করতে গেলে যে আরও কতকগুলো বিধি-নিষেধ আছে, সেগুলোও ত' মানতে হচ্ছে। নাম করতে গেলে নামাপরাধের বিচার আমাকে মানতে হচ্ছে। আমি যদি অপরাধ করে যাই, তাহলে নামের ফল হবে না। শুদ্ধনামের উদয়ে যে প্রেমোদয় হবে, তা ত' হচ্ছে না। নামাপরাধ কি কি, তা আমাকে জেনে নিতে হবে। না জানলে সাবধান হব কি করে? তত্ত্বদর্শন সব জানতে হয়, বুঝতে হয়, শিখতে হয়।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

তত্ত্বদর্শন যত কঠিন হোক না কেন গুরুকৃপাবলে, ভগবৎকৃপাবলে ওটা আমি জানব, বুঝব, শিখব—এ ভাবটা থাকবে ভিতরে। আমি নিজ চেষ্টাদ্বারা শিখব, ওটা হবে না। গুরুকৃপাবলে, বৈষ্ণবকৃপায়, ভগবৎকৃপাবলে ওটা হবে। আমি ত' জানি না—কে ভাল, কে মন্দ, কার কি তত্ত্বদর্শন। ঐ বিষয়ে জানতে গেলে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের করুণাপ্রার্থী হতে হবে। নইলে আমার তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা

হচ্ছে না। ভাল-মন্দের বিচারটা যদি আমার না থাকে, তাহলে আমার সাধন-ভজন হবে না, আমি খারাপটাকে ছাড়তে পারব না, ভালটাকে গ্রহণ করতে পারব না। ভাগবতের শ্লোকের ভিতরে রয়েছে—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" দুঃসঙ্গ কি, তা যদি না জানি, তাহলে ছাড়ব কি করে? আর সাধুসঙ্গ কি, সেটা যদি না জানি তাহলে আমি গ্রহণ করব কি করে? "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ॥" সাধু-মহাজনের যে তত্ত্বদর্শন, সিদ্ধান্ত, সেইটাতে আমার যত সংশয় আছে, প্রশ্ন আছে, যত সন্দেহ আছে সবকে দূরীভূত করে, আমাকে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এবং ঊর্জ্জাদর লেখা আছে। ভক্ত যা কিছু করছেন সবই ভগবানের প্রীতিকামনায়। গীতায় লেখা আছে,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

আমি সংসারের কাজকর্ম্ম করব কার জন্য? 'যজ্ঞার্থাৎ'—যজ্ঞের জন্য। সে আবার কি ব্যাপার? 'যজ্ঞ'-শব্দে ভগবানকে বুঝানো হয়েছে। ভগবান্ বিষ্ণু—ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর হরি; তাঁর জন্য, তাঁর প্রীতিকামনায় আমি সংসারে কর্ম্মাচরণ করি এবং করব। 'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ'—শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা দিয়েছেন যজ্ঞ-শব্দের। 'অন্যত্র কর্ম্মবন্ধনঃ' কৃতকর্ম্ম যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে আমার কর্ম্মবন্ধন হবে। "তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"—তুমি ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, প্রীতিকামনায় সংসারে কর্ম্মাচরণ কর, কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

ভাগবতে বলছেন,—"তৎ কর্ম্ম হরি-তোষণং যৎ স্যাৎ, সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"—সেই কর্ম্ম তুমি করবে, যাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। সেই কর্ম্মই হল বাস্তব কর্ম্ম, ভক্তি। কর্ম্মটাই ভক্তি?—হ্যাঁ, সে কথা পঞ্চরাত্রে বলছেন,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদ্॥"

ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিকামনায় অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় যে অনুকূল ব্যবস্থাদি গ্রহণ, সেটাই হল ভক্তি।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

গীতা পাঠ করছেন আপনারা, গীতা পাঠের শেষের দিকে গীতা-মাহাত্ম্যসূচক একটা শ্লোক আছে, গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত যে সংস্করণগুলো আছে, তার শেষের দিকের সর্ব্ব শেষ শ্লোকটা আমার বক্তব্য বিষয়।—

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যা বলেছেন সেইটাই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। দেবকীপুত্র কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব। 'একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি'—শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কৃষ্ণমন্ত্র, 'কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা'—সেই পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হল একমাত্র ভক্তি—সেইকথা বুঝিয়েছেন এখানে। অপরাপর গীতার শেষে যে মহিমা-মাহাত্ম্যসূচক ৮৪টী শ্লোক আছে তার মধ্যে কয়েকটী শ্লোকে শ্রীদেবকীনন্দন কৃষ্ণ, শ্রীগোপালকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের গীতা শ্রবণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে,—

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থ ব্রতাদিভিঃ ॥

যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, ব্রতপালন, দানাদি অপেক্ষা গীতাপাঠ শ্রেষ্ঠ। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতপাঠে খুব সন্তুষ্ট হন। ঐশ্বর্য্যপর মূর্ত্তির কথা প্রথমে বললেন। তারপরে বাৎসল্য রসের অধিদেবতা গোপালকৃষ্ণ হাজির হচ্ছেন নারদ-ধ্রুব পার্ষদের সঙ্গে —যেখানে গীতা পাঠ হচ্ছে।

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥

তারপরে রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে হাজির হচ্ছেন।—

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥

এইটা হল শ্রেষ্ঠ কথা, চরম কথা। শ্রীরাধানাথ হাজির হচ্ছেন, রাধা-শ্যামসুন্দর গিয়ে হাজির হচ্ছেন যেখানে গীতা পাঠ করছেন ভক্তগণ। শাস্ত্রের বিচারগুলো ত' এইভাবে দেখানো হয়েছে পর পর। আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেটাকে বাদ দিলে ত' আমরা কিছুই করতে পারি না—আমাদের সাধন-ভজন অসম্পূর্ণ—অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়।

হুগলীতে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ-মানসে পশ্চিম-বঙ্গের হুগলী-জেলার ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। হুগলীবাসী ভক্তগণের হরিকথা শ্রবণ-পিপাসা সন্দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ বর্ত্তমান বর্ষের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, (ইং ২৫।৫।৯২)

সোমবার হুগলী-জেলার রামনগর গ্রামে শ্রীমনোজকুমার জানা মহাশয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। তাঁহার প্রচারপার্টিতে ছিলেন শ্রীযদুবর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলাদ্রিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভজন-কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসীতানাথ দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামল-কৃষ্ণ দাসাধিকারী (রামায়ণ-গায়ক) প্রভৃতি। শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী শেষের দিকে উক্ত প্রচারপার্টিতে যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব রামনগর গ্রামে শুভপদার্পণ করিলে অপেক্ষমান স্থানীয় ভক্তগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন এবং কীর্ত্তনসহযোগে তাঁহাকে মনোজবাবুর গৃহে লইয়া যান।

১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব যথাক্রমে বিনগ্রামের শ্রীসন্ন্যাসী জানা, শ্রীভোলানাথ মেটে, শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র বেরা, শ্রীশশধর পাত্র, শ্রীরামপদ মণ্ডল, শ্রীজ্ঞানদা মেটে এবং কোটালপাড়া নিবাসী শ্রীবেচারাম হাইত ও পুরস্তুরা নিবাসী শ্রীনর্ব্বেশ্বর পাত্র মহাশয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের পদার্পণে প্রত্যেক গৃহে মহোৎসবের আয়োজন হইত এবং উক্ত মহোৎসবে প্রত্যহ স্থানীয় গ্রামবাসিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব 'সনাতন ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১২ই জ্যৈষ্ঠ বিনগ্রাম নিবাসী শ্রীসন্ন্যাসী জানার গৃহপ্রাঙ্গণে ভাষণ চলাকালীন শ্রীল আচার্য্যদেবকে একটী প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"বৈষ্ণবের পক্ষে চাষাবাদ বাঞ্ছনীয় কি না?" তদুত্তরে তিনি প্রায় একঘণ্টাকাল যাবৎ শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহার ভাবগম্ভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা শ্রবণ করত সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন এবং পুনরায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া রাখেন। ভাষণের আদি ও অন্তে প্রত্যহ ব্রহ্মচারিগণকর্ত্তৃক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেবের বক্তৃতার পর প্রত্যহ শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করিতেন এবং শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে ভারতবর্ষের তীর্থস্থানসমূহ এবং শ্রীগৌরলীলা-কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করাইতেন।

বলাবাহুল্য, প্রত্যহ বিকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে স্থানীয় আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলে যোগদান করিতেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দের উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্যই প্রশংসার্হ।

—**নিজস্ব সংবাদ**

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন্ — ৭৯৪০০১
জেলা — ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৯২), রবিবার হইতে ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৩।৮।৯২), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১।৮।৯২), শুক্রবার **শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্ম-সভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২রা আষাঢ়, ১৩৯৯।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারীর** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

৩রা ভাদ্র (২০।৮।৯১), বৃহস্পতিবার

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১।৮।৯২), শুক্রবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণ—৮-৩০টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলাপ্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

৫ই ভাদ্র (ইং ২২।৮।৯২), শনিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যা'তে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ৪ হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৯৯, ইং ১৭/৮/৯২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতম্

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ে]

১। ইত্যুক্তো ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ।
প্রত্যাহ প্রণতান্ দেবান্মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২৩॥

গোকুলেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

শ্রীভগবানুবাচ—

২। হে সুরজ্যেষ্ঠ হে শম্ভো দেবাঃ শৃণুত মদ্বচঃ।
যাদবেষু চ জন্মধ্বমংশৈঃ স্ত্রীভির্ম্মদাজ্ঞয়া॥ ২৪॥

৩। অহং চাবতরিষ্যামি হরিষ্যামি ভুবো ভরম্।
করিষ্যামি চ বঃ কার্য্যং ভবিষ্যামি যদোঃ কুলে॥ ২৫॥

ভগবান্ বলিলেন,—হে চতুরানন! হে শঙ্কর! হে দেবগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর,—আমার আদেশে তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত স্ব-স্ব অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। আমিও যদুকুলে জন্ম লইয়া অবতীর্ণ হইব,—ভূভার-হরণপূর্ব্বক তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিব ॥ ২৪-২৫ ॥

৪। ইত্যুক্তবন্তং জগদীশ্বরং হরিং, রাধা পতিপ্রাণ-বিয়োগ-বিহ্বলা।
দাবাগ্নিনা দুঃখলতেব মূর্চ্ছিতাশ্রু-কম্প-রোমাঞ্চিত-ভাবসংবৃতা ॥ ২৮ ॥

স্বীয় পতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বলিলে রাধা প্রাণস্বরূপ পতির বিরহে বিহ্বলা হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইলেন, তাঁহার নেত্র অশ্রুতে আপ্লুত এবং দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইল ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধোবাচ—

৫। ভুবো ভরং হর্ত্তুমলং ব্রজের্ভুবং, কৃতং পরং মে শপথং শৃণোত্বতঃ।
গতে ত্বয়ি প্রাণপতে চ বিগ্রহং, কদাচিদত্রৈব ন ধারয়াম্যহম্ ॥ -৯ ॥

রাধা বলিলেন,—হে প্রাণনাথ! আপনি ভূভার হরণজন্য ভূতলে গমন করিবেন, অতএব আমার এক অমোঘ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করুন; আপনি চলিয়া গেলে আমি এখানে কোনরূপেই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

৬। ত্বয়া সহ গমিষ্যামি মা শোকং কুরু রাধিকে।
হরিষ্যামি ভুবোঃ ভারং করিষ্যামি বচস্তব ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধিকে! শোক করিও না, আমি তোমার বাক্য পালন করিব,—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া ভূভার হরণ করিব ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধিকোবাচ—

৭। যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি যত্র নো যমুনা নদী।
যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥ ৩২ ॥

রাধিকা বলিলেন,—যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা-নদী ও গোবর্দ্ধন-গিরি নাই, সেখানে আমার মনের শান্তি হইবে না ॥ ৩২ ॥

৮। বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥ ৩৩ ॥

তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন-গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

[শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ে]

৯। **শ্রীরাধয়া পূর্ণতমস্তু সাক্ষাদ্ভূত্বা ব্রজে কিং চরিতং চকার।**

তদ্‌ব্রূহি মে দেবঋষে ঋষীশ, ত্রিতাপ-দুঃখাৎ পরিপাহি মাং ত্বম্॥ ৩॥

(বহুলাশ্ব বলিলেন,—) পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরে রাধার সহিত অবতীর্ণ হইয়া কি লীলা করিয়াছিলেন, হে ঋষিসত্তম নারদ! তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আধিদৈবিকাদি তাপ হইতে পরিত্রাণ করুন॥ ৩॥

শ্রীনারদ উবাচ—

১০। **অথ প্রভোস্তস্য পবিত্রলীলাং, সুমঙ্গলাং সংশৃণুতাৎ পরস্য।**

অভূৎ সতাং যো ভুবি রক্ষণার্থং, ন কেবলং কংসবধায় কৃষ্ণঃ॥ ৫॥

নারদ বলিলেন,—অনন্তর পরম প্রভু সেই কৃষ্ণের মঙ্গলময়ী পাবন-লীলা শ্রবণ কর; তিনি যে কেবল কংসবধের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন তাহা নহে, তিনি সাধু-দিগের রক্ষণার্থও ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ৫॥

১১। অথৈব **রাধা বৃষভানুপত্ন্যামাবেশ্য রূপং মহসঃ পরাখ্যম্।**

কলিন্দজা কূল-নিকুঞ্জদেশে, সুমন্দিরে সাবততার রাজন্॥ ৬॥

হে রাজন! **শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরম তেজ বৃষভানু-পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকূলের নিকুঞ্জদেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূতা হন**॥ ৬॥

১২। **ঘনাবৃতে ব্যোম্নি দিনস্য মধ্যে**

ভাদ্রে সিতে নাগতিথৌ চ সোমে।

অবাকিরন্ দেবগণাঃ স্ফুরদ্ভি-

স্তন্মন্দিরে নন্দনজৈঃ প্রসূনৈঃ॥

রাধাবতারেণ তদা বুভূবুর্নদ্যোঽমলাভাশ্চ দিশঃ প্রসেদুঃ।

ববুশ্চ বাতা অরবিন্দরাগৈঃ, সুশীতলাঃ সুন্দরমন্দযানৈঃ॥ ৭-৮॥

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী-তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণা হন, সে-সময় আকাশ মেঘাবৃত ছিল। তখন দেবগণ সেই মন্দিরে নন্দন-বনজাত প্রফুল্ল প্রসূন বর্ষণ করিলেন, নদীসকল অমল ও দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, পদ্মপরাগসহ সুগন্ধ সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল॥ ৭-৮॥

১৩। সুতাং শরচ্চন্দ্রশতাভিরামাং, দৃষ্ট্বাথ কীর্ত্তির্মুদমাপ গোপী।

শুভং বিধায়াশু দদৌ দ্বিজেভ্যো, দ্বিলক্ষমানন্দকরং গবাঞ্চ॥ ৯॥

শত শরৎ-শশধর-কান্তি রমণীয়া কন্যা দর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত

হইলেন। তিনি সত্বর শুভবিধান করিয়া আনন্দদায়ক দ্বি লক্ষ গো দ্বিজগণকে দান করিলেন ॥ ৯ ॥

১৪। প্রেঙ্খে খচিদ্রত্নময়ূখপূর্ণে, সুবর্ণযুক্তে কৃতচন্দনাঙ্গে।
আন্দোলিতা সা ববৃধে সখীজনৈর্দিনে দিনে চন্দ্রকলেব তাভিঃ॥
যদ্দর্শনং দেববরৈঃ সুদুর্ল্লভং
যজ্ঞৈরবাপ্তং জনজন্মকোটিভিঃ।
সবিগ্রহাং তাং বৃষভানুমন্দিরে
লক্ষ্যন্তি লোকা ললনাপ্রলালনৈঃ ॥ ১০-১১ ॥

অনন্তর রাধা, কিরণপূর্ণ রত্নখচিত চন্দনলিপ্ত সুবর্ণময় দোলায় সখীজনকর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে-দিনে নিজপ্রভায় শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শন দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ, যাঁহা কোটি কোটি জন্ম-যজ্ঞাচরণেও লাভ হয় না, লোকসকল তাঁহাকে আজ বৃষভানু-মন্দিরে শরীরধারিণী এবং ললনাগণদ্বারা লালিত দর্শন করিতেছে ॥ ১০-১১ ॥

১৫। শ্রীরাসরঙ্গস্য বিকাসচন্দ্রিকা
দীপাবলীভির্বৃষভানু-মন্দিরে।
গোলোকচূড়ামণি-কণ্ঠভূষণাং
রাধাং পরাং তাং সততং স্মরামি ॥ ১২ ॥

শ্রীরাস-রঙ্গের প্রকাশকারিণী দীপাবলীরূপ যে জ্যোৎস্না আজ বৃষভানু-মন্দিরে উদিত, **গোকুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠভূষণ**-স্বরূপা সেই পরমা রাধিকাকে সতত স্মরণ করি ॥ ১২ ॥

ফলশ্রুতিঃ—

১৬। শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্তং নিত্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধামাধবয়োঃ পাদে ভক্তিং দাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
কর্ম্ম নির্ম্মূলনং কৃত্বা জিত্বা মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ম্।
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যাতি গোলোকমুত্তমম্ ॥

যিনি এই শ্রীরাধিকা-জন্ম-বৃত্তান্ত নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীরাধা-মাধবের চরণযুগলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তিনি কর্ম্মকাণ্ড উন্মূলন করত দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া সমস্ত লোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তম গোলোকধামে গমন করিবেন ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর]

২৮। জড়ভজন কি?

"জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার, ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৯। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ গুরুপদাশ্রয়ের বিরোধী কেন?

"গুরুপদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্গুরু-লাভের যত্ন এবং তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্গুরুগণ শিষ্যগণকে কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্গুরু পর্য্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

৩০। আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কি এক?

"আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব, এই দুইয়ের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-ভেদ যতদিন হৃদয়ে উদিত না হয়, ততদিন উক্ত দুইটী শব্দের ব্যবহারে বিচার থাকে না। শুষ্কবাদীদিগের অপ্রাকৃত ভাবোদয় হওয়া কঠিন। অতিশয় সুকৃতিবলে অপ্রাকৃত তত্ত্বে রতি হয়; নতুবা আধ্যাত্মিক বিতর্করূপ প্রাচীরের এপারে থাকিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য দর্শন করিতে পারে না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩১। **Trinity** মতবাদ কিরূপে উৎপন্ন হইল?

"জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত-প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটি সংক্রামক হইয়া জু (ইহুদি)-দিগের ধর্ম্মে এবং শেষে কোরাণমতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটী শয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বর-বিষয়ক-মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে **Trinity** মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩২। **Trinity** মত-বিস্তারের ইতিহাস কি?

"আদৌ **Trinity** মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন গড্, হোলিঘোষ্ট্ ও ক্রাইষ্ট্—এই তিনটী তত্ত্ব-বিচারদ্বারা তাহার যুক্ত-মীমাংসা বাহির করিলেন। যে-

কালে বা যে-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে-সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন।"
—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩৩। খৃষ্টমতাবলম্বিগণ সনাতন ধর্ম্মের যে নিন্দা করেন, ইহা কি যুক্তিযুক্ত ?

"One, who is at heart the follower of Mohamad will certainly find the doctrines of the New Testament to be a forgery by the fallen angel A Trinitarian Christian, on the other hand, will denounce the precepts of Mohamad as those of an ambitious reformer. The reason simply is, that the critic should be of the same disposition of mind as that of the author, whose merits he is required to Judge. Thoughts have different ways. One, who is trained up in the thoughts of the Unitarian Society or of the Vedanta of the Benares School, will scarcely find piety in the faith of the Vaishnabs. An ignorant Vaishnab, on the other hand, whose business it is to beg from door to door in the name of Nityananda will find no piety in the Christian. This is because the Vaishnab does not think in the way in which the Christian thinks of his own religion. It may be, that both the Christian and the Vaishnab will utter the same sentiment, but they will never stop their fight with each other only because they have arrived at their common conclusion by different ways of thoughts. Thus it is, that a great deal of ungenerousness enters into the arguments of pious Christians when they pass their imperfect opinion on the religion of the Vaishnabs."

—The Bhagavat : "Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

৩৪। তান্ত্রিক শক্তিবাদ কোন্ দর্শন হইতে উদ্ভূত ?

"তন্ত্র-সকলের মত নানা প্রকার ; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক স্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা,

কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে 'মিথ্যা', কোন স্থলে 'সত্য' বলা হইয়াছে। কোন স্থলে 'নাদবিন্দু'কে, কোন স্থলে 'প্রকৃতি-পুরুষ'কে ও কোন স্থলে 'কেবলা প্রকৃতি'কে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৫। তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

"তন্ত্র-সকলে যে-সকল লতা-সাধন, পঞ্চমকার-সাধন, সুরা-সাধন-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কম্‌টী (কোঁৎ) প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি-পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৬। মায়াবাদের জন্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি ?

"ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে বৌদ্ধনামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধ-মতের অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৭। মায়াবাদিগণ কি আস্তিক নহেন ?

"মায়াবাদিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে নাস্তিক।" —'কথাসার', চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

৩৮। শৈব-মত কোথা হইতে উদ্ভূত ?

"আমাদের বিবেচনায় শৈব-মত কপিল-সাংখ্য-নিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণকর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক-মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্র-মতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফল-কালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৯। বৌদ্ধ-মত ও জৈন-মত কেন প্রচারিত হইল ?

"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ-মত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈন-মত প্রচার করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪০। বৌদ্ধ ও জৈন-মতের সংক্ষিপ্ত কথা কি ?

"বৌদ্ধ-মতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করত শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া,

নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরনির্ব্বাণ লাভ করে। পরনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি-অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়। উভয় মতেই জড়-জগৎ নিত্য ; কর্ম্ম অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট ; অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরনির্ব্বাণই সুখ ; জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল ; পরনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক ; ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদের প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।” —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪১। পাশ্চাত্যদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের ন্যায় কোন নির্ব্বাণবাদ-ধর্ম্ম আছে কি ?

“বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটী নির্ব্বাণবাদ-ধর্ম্ম ইউরোপ খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে— বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করত পরিভ্রমণ করিতেছে ; কোন জন্মে নির্ব্বাণ-বিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে ; কিন্তু পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্ম-জন্মান্তর নাই।” —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৪২। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন আনুকরণিক অবতারবাদ সমর্থন করিয়াছেন কি ?

“কতকগুলি লোক স্থানে-স্থানে নূতন গৌরাঙ্গ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই ‘মায়াবাদী’। ছদ্মবেশে হরিকীর্ত্তনাদি (?) দ্বারা অনেকের মোহ উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করত হরিকীর্ত্তন (?) করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্ত্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে, অনেকেই তাঁহাদের গতিক দেখিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় উদয় হইতেছেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত এবং থিয়সফি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন —‘যখন গৌরচন্দ্র স্বয়ং উদিত হইতেছেন, তখন তৎপার্ষদ হইয়া আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন ?’”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সঃ তোঃ ৮।১

৪৩। 'সমন্বয়বাদী' বা 'খড়-জাঠিয়া বেটা' কি শুদ্ধভক্ত ?

"ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয় ; কখনও কখনও কথার আলোচনায় দশা (?) প্রাপ্ত হন ; আবার আধ্যাত্মিক-সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন, বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। * * * তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জগতের বিচার-প্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাবা খেলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বাস্তবসত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথার দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের "কেন কং বিজানীয়াৎ"—মন্ত্রে অনাত্ম-নিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্মাতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অক্ষজজ্ঞানোত্থ বিচার নিরসন করিবার জন্য শ্রুতির এই মন্ত্র। কারণ, বৃহদারণ্যক—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারা আত্মার অনুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অপাণিপাদঃ" মন্ত্রে জীবাত্মার ও পরমাত্মার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটী মাটির জিনিষ অপর একটী মাটির জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না। দুইটী মাটির জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা প্রযোজক কর্ত্তা ; তিনি জীবের তৎকালিক বদ্ধাভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করান ; তখন বদ্ধ জীবের অভিমানে জগদ্রূপ ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে, "ঈশাবাস্য" শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না ; সে মনে করে জিহ্বা হইয়াছে—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, কুকুর-দন্ত হইয়াছে—মৎস্য-মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে—আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য। অনাত্ম-বৃত্তি 'আমি' বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহুস্থানের

মালিক। এইরূপ বুদ্ধিতে জীব নিজকে কর্ম্মফলের ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়।

এইরূপ দুঃসঙ্গের প্রবলতার ও ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সমস্ত জগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্ম-প্রচারক, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা, সকলেই চান—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্ম-বৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। 'আমার ভোগ', 'আমার ভোগ' —'দেহি, 'দেহি' রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা একবারও কীর্ত্তন করে না। যেদিন হৃষীকেশের সেবা করা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র কৃত্য। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" শ্রুতি-মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—এই গীতোপনিষদ্ বাক্যে 'পরম সমতা, উপদিষ্ট হইয়াছে। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥"—এই বাক্যে শ্রীধরস্বামী মুক্তকুলেরও নিত্যসেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেখান হইতেই পরমপুরুষের সেবা হওয়া উচিত। আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে মানুষ, দেব, পশু-পক্ষী—যেখানে যতপ্রকার অস্তিত্ব, তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য কিছু 'বৃত্তি'-শব্দবাচ্য নহে। অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, সেদিন আমরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যেদিন সেই মুরলীর ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। প্রাজাপত্য আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ-সুখ, আত্ম-সুখ, দুস্ত্যাজ্য আর্য্য-পথ, নিজ পরিজন, স্বজনাদির তাড়ন-ভর্ৎসন—কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। ভগবানের নামমধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, চেতন-চক্ষুদ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়ন-পথের পথিক হইবে; সেই পরমাশ্চর্য্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব, ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট

হইব। বাহ্য জগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্ম্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা আত্মা বা চেতনের নিত্যাবৃত্তি শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া স্থায়িভাব রতিতে অবলম্বন, উদ্দীপনরূপ বিভাব ও অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণ করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্ব-অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরমপদ লাভ হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

আত্মবৃত্তি পঞ্চবিধ রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্তরসটী প্রতিকূল-ভাব-পরিত্যক্ত একটী নিরপেক্ষ অবস্থান মাত্র। দাস্যরস দ্বিতীয় রস। দাস্যরস কিয়ৎপরিমাণে মমতাযুক্ত; সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্যরস শান্তরসের গুণ ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত, ইহাতে দাস্যরসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই। উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজিত। বাৎসল্যরস দাস্যরস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম বিষয়বস্তুকেও পাল্য ও আশ্রিত জ্ঞান হয়। মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিরসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ রতিতে শ্রীকৃষ্ণসেবাই আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, নিত্যাবৃত্তি।

জীবের স্বরূপ-বিচারে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে—"কৃষ্ণের স্বরূপ হয় জীবের নিত্য প্রভু।" শ্রুতিমন্ত্রে যে 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়ঃ' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্যাবৃত্তি-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। 'রনজ্'-ধাতু হইতে 'রতি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'রনজ্'-ধাতুর অর্থ —অনুরাগ বা টান বুঝায়। 'আত্মা'-শব্দে 'আমি', 'পরমাত্মা'-শব্দে 'পরম-আমি'। অর্থাৎ প্রভাব ও বৈভব শক্তিপূর্ণ কর্তৃসত্তাধিষ্ঠান সমগ্র আমি বা পরমাত্মাও 'আমি-ই'; বিষয়-বিচারে—'পরম আমি' আর আশ্রয়-বিচারে অনুশক্তিক প্রভু-বাধ্য বিভুর অধীন 'ক্ষুদ্র আমি'। 'তত্ত্বমস্যাদি' শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

———

সেশ্বর-ছাত্র

জগতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং নিজেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্তও করেন। এই শ্রেণীর লোক 'আস্তিক' নামে অভিহিত হন। অপর শ্রেণীর লোক ভগবানের সেবা করা ত' দূরের কথা, তাঁহার অস্তিত্বও স্বীকার করে না, স্বেচ্ছাচারী হইয়া জীবন-যাপন করে। ইহারা 'নাস্তিক' নামে কথিত হয়।

ভগবদ্বিশ্বাসী ছাত্রকেই সাধারণত 'সেশ্বর-ছাত্র' বলা হয়, তবে যে ছাত্রের ভগবানে বিশ্বাস আছে, ভগবানের সেবা করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ভগবৎ-সেবার জন্যই যাহার বিদ্যা-শিক্ষা, গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে সেবাময় জীবন-যাপনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য ও সঙ্কল্প, সেই ছাত্রই প্রকৃত সেশ্বর-ছাত্র নামের যোগ্য। 'সেশ্বর' অর্থে—আস্তিক—ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান, যুক্ত, কিংবা যিনি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ঈশ্বরের চিন্তাকরেন, সেই ব্যক্তিই সেশ্বর। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সেশ্বর-ছাত্রের সংখ্যা অতীব বিরল। শতকরা কেন, সহস্র সহস্র ছাত্রের মধ্যেও এইরূপ একটী সৎ-ছাত্র পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই বিবদমান অধর্ম্ম-প্রবল কলিযুগে বিনয়ী, নম্র, অনুগত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র সেশ্বর-ছাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর, কারণ জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন ভোগ-সুখে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত। ভগবানের সেবা করা যে জীব মাত্রেরই বিশেষতঃ মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, সে চিন্তাস্রোতকে তাহারা জগতের কোন অজ্ঞাত স্থানে জলাঞ্জলি দিয়া আজ নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মানুষের অবনতি আর কি হইতে পারে? এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অন্যান্য ইতর পশুও মনুষ্যের ন্যায়ই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভগবদনুসন্ধান বা ভগবৎ-সেবারূপ ধর্ম্মই কেবলমাত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত অন্যায় কার্য্যে সময় ব্যয় করিতেছে,

তাহারা মানুষ হইয়াও পশুতুল্য। সেইজন্য শাস্ত্র তাহাদিগকে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত দ্বিপদ পশু বা নরপশু আখ্যা দিয়াছেন।

শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে আমাদের চলিতে হইবে, নচেৎ অন্যায় হইবে। আজকাল বিজ্ঞানের কাল; তাই অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষিত হইয়া জাগতিক পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা মনুষ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইতেছে। কিন্তু সেশ্বর-ছাত্র আদৌ দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণ বাল্যাবস্থায়—গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন, গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেন। পরে যাঁহাদের ইচ্ছা হইত, তাঁহারা পুনরায় গৃহে গিয়া সংসারাদি করিতেন। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্যাশ্রম। পরে বাণপ্রস্থ ও ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক শেষ জীবন ঈশ্বরচিন্তায় কাটাইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বকালের লোক শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে-সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠিয়া গিয়াছে। এখন অধিকাংশ লোকই আশ্রমের ধার ধারে না, যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবন-যাপন করে। ইহা যে আমাদের অবনতির একটী প্রধান কারণ, একথাটী সুধী-সমাজ তাহাদের মস্তিকে আদৌ স্থান দিতেছেন না; তাই আজকাল ছাত্রগণ পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া 'ধরাকে সরার' ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। তজ্জন্য ভগবানের কথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা তাহাদের বোধ হইতেছে না।

সেশ্বরের পরিবর্ত্তে নিরীশ্বর বা নাস্তিক ছাত্রের সংখ্যাই বর্ত্তমানে বেশী। তাহারা পুণ্য বা নৈতিক জীবনের ধার ধারে না, বরং নৈতিক হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা পাপ-চিন্তা বা পাপ-কার্য্যদ্বারা জীবনটাকে কলুষিত করিয়া ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নরকের দ্বার প্রশস্ত করিতেছে। কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে কি-প্রকার অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, এ বিষয় চিন্তা তাহাদের নাই। বাল্যকাল হইতে যদি নৈতিক ও সেশ্বর না হওয়া যায়, তবে কি প্রৌঢ়ে বা বৃদ্ধকালে সেশ্বর হইতে পারিবে?

জগতে নিরীশ্বর ও অনৈতিকের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ নৈতিক হইলেও নিরীশ্বর-নৈতিকেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সুতরাং সেশ্বর ছাত্রের সংখ্যা যে অত্যল্প তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত সেশ্বর ছাত্রের মধ্যে অনৈতিকতা থাকা অসম্ভব।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কাঁচা মাটির হাঁড়িতে দাগ দিলে তাহা সহজে বসিয়া যায়, কিন্তু পোড়া হাঁড়িতে দাগ দিতে গেলে দাগ ত' বসেই না, উপরন্তু উহা ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে। আমাদের বাল্যজীবনের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপই।

বাল্যকালে মানুষের অন্তঃকরণ কোমল থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং বাল্যকালে একটী বিষয় যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ-বয়সে তাহা সহসা হইয়া উঠে না। এমনকি, অনেক সময় অনেক কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক-চিন্তাস্রোত মানুষের উপর আধিপত্য করে। সুতরাং বাল্যকাল হইতে চিত্তবৃত্তিকে জগতের কোন চিন্তাস্রোতের মধ্যে আটক না রাখিয়া, যিনি যথার্থ মনুষ্য-নামের সার্থকতা করেন, তিনিই সেশ্বর বা সৌভাগ্যবান্। প্রত্যেকেরই সেশ্বর হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ মঙ্গলের আশা খুবই কম ; প্রত্যেক ছাত্রেরই সচ্চরিত্র, বিনয়ী এবং নম্র হওয়া, পবিত্র মনে গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সাধু-গুরুসেবা করাই কর্ত্তব্য। তবেই সেশ্বর নামের যোগ্য হওয়া যাইবে।

শাস্ত্রে জানা যায়,—প্রহ্লাদ মহারাজ একজন সেশ্বর-ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু একজন নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদকে নিজগুরু শুক্রাচার্য্যের আলয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'ষণ্ডামর্ক'-নামক পুত্রদ্বয়ের উপর প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত একসঙ্গে পড়িতেন। একই স্থানে একই গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রহ্লাদ সেশ্বর ছাত্র হইলেন, আর অপর ছাত্রগণ আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। তিনি 'ক' এই অক্ষরটি পড়িয়াই বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে মনে করিলেন। কারণ, 'ক' উচ্চারণে যখন কৃষ্ণচিন্তা উদিত হয়, তখন আর কিছুরই দরকার হয় না। পিতার প্রতি পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহা তিনি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে সেশ্বর ছিলেন বলিয়া নিরীশ্বরবাদী পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কঠোর শাস্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই নিজের মনে করিতে পারিয়াছেন, শত বাধা-বিঘ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও কিছু করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রতি, পিতার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া, অনেক প্রকারেই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ কিন্তু সর্ব্বদাই পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তিনি বালক হইলেও ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। গুরুগৃহে পাঠের সময় অন্যান্য ছাত্রের সহিত একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিলেও তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণকথা স্মরণ করিয়াছেন এবং সেই অসুর-বালকগণকে বাল্যকাল হইতেই একমাত্র ভগবানের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, কৃষ্ণকথা কখনও বিস্মৃত হন না।

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥"

—এই শিক্ষা প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর-বালকগণকে দিয়াছেন।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৃথা কাল হরণ না করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবদারাধনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ হেন মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া জীবনটাকে অপব্যয় করা কোন-ক্রমেই উচিত নয়। অন্যান্য অসুরবালকগণের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা প্রহ্লাদ মহারাজের এইরূপ চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হন। অবশেষে নিজেও বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

এইরূপ সেশ্বর-ছাত্র অতীব বিরল। তিনি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় হরিবিদ্বেষীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া জগজ্জীবকে ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

তিনি আমাদিগকে প্রতিবাক্যে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি নবধা ভক্তির বিষয় জানাইয়াছেন। প্রতি অক্ষর পাঠেই তাহার কৃষ্ণের স্মৃতি হইত। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথা তিনি বলিতেন না। তিনি ভগবৎ-কৃপায় জগতের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এইরূপ একটী প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, আমাদের সেশ্বর হইবার দরকার কি? এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

আমরা যতদিন নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া না জানিব, ততদিন পুণ্যফলে কখনও স্বর্গে এবং পুনরায় পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যে আসিব এবং পাপফলে কখনও

নরকেও যাইতে বাধ্য হইব। সুতরাং জীবনে কখনও ভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর হওয়া উচিত নহে। নিরীশ্বর হইলে জাগতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিকও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের নির্ম্মম কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। জন্ম-মরণের সময় দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে এবং মৃত্যুর পরেও নরকের লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতেও নিষ্কৃতি পাইব না।

সেশ্বর ছাত্রের জীবনে কোন ভয় থাকে না। কারণ, ভয়ও যাঁহাকে ভয় করেন সেই ভগবানকে আশ্রয় করিলে আবার ভয় কিসের? তিনিই নির্ভয় যিনি বাল্যকাল হইতে সেশ্বর নামের যোগ্য হইয়াছেন। স্বয়ং যমও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহসী হন না; বরং ভগবদ্ভক্তকে তিনি নানাভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেবতারাও ভক্তের নিকট কৃপাকাঙ্ক্ষা করেন। সেশ্বর হওয়া সামান্য কথা নয়। প্রহ্লাদের মত ধ্রুবও একজন সেশ্বর ছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল ভগবানের পার্ষদ হইয়া আছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই এরূপ সেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেইরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কৃপায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমরাও ভগবানের দাসত্ব করিবার সৌভাগ্য পাইব —ভবসাগর পার হইতে সমর্থ হইব।

ভগবদ্দাস্য জীবমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য। ভগবদ্দাস্যে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জীবের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাতেই সর্ব্বশুভোদয় ও পরাশান্তি লাভ হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

"আমাদের জীবনের সময় যার যৎটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না।"

"শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন

কৃষ্ণ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

কৃষ্ণ—নিত্য-প্রভু, আর জীব—নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যজীব-স্বভাব প্রকাশ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

সর্ব্বশক্তির মূলাধার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি মায়াধীশ শ্রীহরিই একমাত্র পরতত্ত্ব। জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের সাধ্যবস্তু। ইহাই শুদ্ধজীবের বা তাঁহার সিদ্ধস্বরূপের পরিচয়। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্‌বস্তু, জীব অণুচৈতন্য। কৃষ্ণ চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য, জীব তাঁহার কিরণকণ-সদৃশ। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব ক্ষুদ্র। কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার তটস্থাশক্তির পরিণাম হইতেই জীবের সত্তা। জীব—জড় ও চিৎ, এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া পৃথক্। তজ্জন্য ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব সত্য ও নিত্য।

জীবের বদ্ধদশার কারণ

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব চিদ্ধর্ম্মী হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ্য এবং ভগবান্ চিদ্বস্তু, জীবও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু। অতএব এই উভয়স্থলেই ভগবানের সহিত জীবের নিত্যভেদ ও নিত্য-অভেদ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রভুর সেবা করাই দাসের একমাত্র কৃত্য। জীব সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইয়া মায়ার চাক্‌চিক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছে এবং মায়িক সংসারে অধঃপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ

দুঃখ লাভ করিতেছে। ভগবানকে ভুলিয়াই জীব অনাশ্রিত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া ইহজগতে দুর্দ্দশা বরণ করিয়াছে।

বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা

জীবের দুইটী অবস্থা—শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধাবস্থায় জীবের জড়সম্বন্ধ থাকে না। 'কৃষ্ণদাস' অভিমানই জীবের শুদ্ধ পরিচয়। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম। সেব্যের প্রতি সেবকের যে সহজ আনুগত্য-ভাব, তাহাই প্রেম বা প্রীতির মূলীভূত কারণ। সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটী বস্তুই নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। নিত্যমুক্ত-গণ নিত্যকাল ভগবদ্ধামে থাকিয়া ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। আর নিত্যবদ্ধ জীবগণ স্বরূপ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে 'আমি-আমার'-অভিমানবশে "আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী" পরিচয়ে কর্ম্মফলের ভোক্তা সাজিয়া বসেন। তখন সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ তাহার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীরে এবং ক্ষুৎ-পিপাসা, জড়সঙ্গ-স্পৃহা তাহার স্থূলশরীরে প্রবেশ লাভ করে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের নিত্যধর্ম্ম অবিকৃত থাকে, বদ্ধাবস্থায় উহা বিকৃত হইয়া হেয়, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক ধর্ম্মে পরিণত হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব আবার অনিত্য-ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের আবাহন করিয়া নিরীশ্বর নাস্তিক হইয়া পড়ে। ইহাই তাহার চরম বিপর্য্যয়। এই অবস্থায় তাহার উদ্ধারের আর কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকে না—চির রৌরব ভোগ করে।

গুরুপদাশ্রয়ে সংসার-মুক্তি ও প্রেম-প্রাপ্তি

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—"ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥

* * * *

সদ্গুরু-চরণে জীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥

তবে সেই জীব সাধু-গুরুর কৃপায়।
সম্বন্ধজ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায়॥
তবে পায় প্রেমধন—সর্ব্বধর্ম্মসার। (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব ভব-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় যখন ক্লিষ্ট হইতে থাকে, সংসার-জলধিমধ্যে নক্র-মকররূপ কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নে অস্থির হইয়া হাবুডুবু খায়, তখন সুকৃতিবশে সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তাহার নিজের ভুল কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া তখন ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করে।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১০/১২২-১২৩)

তাই জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের নিমিত্ত পরমকরুণাময় জীব-দুঃখদুঃখী ভগবান্ স্বীয় প্রেষ্ঠজনকে এজগতে গুরুরূপে প্রেরণ করেন। আবার কখনও তিনি স্বয়ং সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মূঢ় জীবগণকে স্বীয় তত্ত্ব জানাইয়া থাকেন। এজন্য সাধু-গুরুরূপেই ভগবৎকৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। ভগবৎসেবোন্মুখ জীব সদ্গুরুর নির্দ্দেশক্রমেই তাহার অপগতির কারন এবং স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় অবগত হন। এই সংসারের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, কে আমি, আমার কি কর্ত্তব্য, কেন আমি ইহসংসারে বদ্ধ হইয়াছি, কিরূপে পুনরায় মুক্ত হইব—প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধ-মোক্ষবিৎ তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবই সংশয় নিরসন ও সদুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর নিকট হইতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া জীব পুনরায় তাহার স্বধর্ম্মে—প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

গুরুকরণের আবশ্যকতা

কি আর্থিক, কি পারমার্থিক সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিত্যকল্যাণপ্রদ ভগবদ্ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব জানিতে গেলে নিশ্চয়ই সদ্গুরুর প্রয়োজন। গুরুকৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় কখনই জীবের বদ্ধদশা নিরাকৃত ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইতে পারে না। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলকামী সনাতন ধর্ম্মাশ্রয়ীর সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অবশ্যই সদ্গুরু-পদাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধালু তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা

করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা কর্ত্তব্য। দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে জন্ম-জন্মান্তরে অশেষ দুঃখ লাভ হয় ও সদ্গতি হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির জীবন বৃথা। তাহার প্রদত্ত কোন দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করেন না এবং তাহার সকল প্রকার চেষ্টাই বিফল হয়। অজিতেন্দ্রিয়গণ গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত চঞ্চল মনকে স্থির করিবার যত্ন করে এবং নিজচেষ্টায় সংসার-দুঃখ বিনাশের প্রয়াসী হইয়া আরও অধিক বিপদগ্রস্ত হয়। তাই সমুদ্রে বিপন্ন কর্ণধারবিহীন নিরাশ্রয় যাত্রীর ন্যায় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই।—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭)

গুরুপাদপদ্মে—গুরু-নিত্যানন্দে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কাহারও কোনপ্রকারে অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র বলেন,—ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত উপায়ন-হস্তে ভগবৎসেবাকামী ব্যক্তি সদ্গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। শব্দব্রহ্মে (শাস্ত্রে) ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত (কৃষ্ণৈকশরণ) আচারবান্ সদ্গুরুর আশ্রয় লইলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়।—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। (মুঃ ১।২।১২)
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২)
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

গুরুপাদপদ্মই ভগবদ্ভক্তি-বীজ লাভের আকর এবং গুরুপদাশ্রয়ই ভক্তিলাভের দ্বার। এই জন্যই অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥

সৎশিষ্য সদ্গুরুপদাশ্রয়ের পর তাঁহার নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি-বিষয়ে শিক্ষালাভ,

বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা ও সাধুপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবেন। এখন সৎশিষ্য ও সদ্‌গুরু কে, তাহাই আলোচ্য।

সৎশিষ্যের লক্ষণ ও পরিচয়

কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ, পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, **শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্** ॥
(গীঃ ২।৭)

আমি অতি মূঢ়, হীন, বদ্ধজীব। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন বাস্তব জ্ঞান নাই। ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ হইয়া 'কার্পণ্য'-দোষে অভিভূত হইয়াছি। হে আচার্য্যদেব! আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, সে-বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করত আমার সংশয় দূর করুন। আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম, আপনার শরণাগত হইলাম। প্রপন্ন আমাকে নিজদাস-জ্ঞানে শাসনদ্বারা সংশোধন করুন—ইহাই প্রকৃত শিষ্যের মনোবৃত্তি। শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য।

গুরুসেবক হইবার অধিকার সম্বন্ধে সাধু শাস্ত্র নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন ঃ—

"সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, বুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, শ্রদ্ধাবান্, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুরুসেবাপর, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবা-তৎপর, নিষ্পাপ, হরি-গুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু ব্যক্তিই শিষ্য হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমানশূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, জড়বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতাবিশিষ্ট, অচঞ্চল, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরু-সেবক হইতে পারেন।"

গুরু-সেবাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের সাক্ষাৎ গুরুসেবা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ঃ—

"প্রতিদিন গুরুর জল-কুম্ভানয়ন ; কুশ-পুষ্প-যজ্ঞীয়কাষ্ঠ আহরণ ; গুরুর শরীর মার্জ্জন, গৃহ মার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন ; গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান ; গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার ; গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সহিত সম্ভাষণ ; সর্ব্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম ; প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্ন-পানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ; কর্ম্ম, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধনদ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন ; শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে 'যে-অনুষ্ঠান' সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত 'দীক্ষা' গ্রহণ ; সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জ্ঞান ; ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম ; সর্ব্বসম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে সমর্পণ কর্ত্তব্য।" (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

———

পঞ্চতত্ত্ব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মিশ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পাঁচ তত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদনোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ ভেদবিশিষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গদেবই ভক্তরূপ, তিনি ভক্তস্বরূপ নহেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তাবতার, শ্রীগদাধর ভক্তশক্তি এবং শ্রীবাস শুদ্ধভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—ইঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ংপ্রকাশ এবং শ্রীঅদ্বৈত অংশাবতার। শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তদধীন ঈশ্বরতত্ত্ব; ভক্তশক্তি শ্রীগদাধর এবং শুদ্ধভক্ত শ্রীশ্রীবাস বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত ও তদভিন্ন শক্তিতত্ত্ব। পাঁচ তত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব শক্তি, আর তিনটী তত্ত্ব শক্তিমান্—তিনটী আরাধ্যতত্ত্ব, আর দুইটী আরাধকতত্ত্ব। যাঁহারা অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া স্বীয় কৃষ্ণানুশীলন শুদ্ধাবৃত্তিকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত। কেবল মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত—সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম-আস্বাদনরূপ নিত্যবিহার এবং জগতে কীর্ত্তন-প্রচাররূপ প্রেমদান করেন। এই পঞ্চতত্ত্বের কৃপাব্যতীত কেহ কখনও কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন না। যাহারা পঞ্চতত্ত্বকে মানে না, তাহারা দৈত্য। শ্রীচৈতন্যের দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার দয়া সবচেয়ে বড় দয়া। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। ভজনশীল ব্যক্তিকে শ্রীমুকুন্দ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু সহসা কাহাকেও ভক্তি দেন না। কিন্তু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আপামরে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব – একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ॥

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তারে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত, অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যা'রে তা'রে, না কৈল বিচার॥"

শ্রীমহাপ্রভু—ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত—ভক্তাবতার, শ্রীবাস পণ্ডিত—ভক্ত এবং শ্রীগদাধর—শক্তি। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগদাধর ব্যতীত আর সবই শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। শ্রীগৌরসুন্দর সম্বিদ্‌বিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর, হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীগদাধর—ব্যতীত আর তিনজন সন্ধিনী। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বের উপাদান-কারণ। শ্রীবাস পণ্ডিত সুজন বা ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অঙ্গনে, তাঁহার কীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করেন। শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসাদি সব। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীধামরূপে প্রকাশিত। শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমহাপ্রভুকে ও শ্রীনামপ্রভুকে পাওয়া যায়, শ্রীগদাধরের, শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বের আকর। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জড়কাম দূর হয়, সংসারবাসনা তুচ্ছ হয় এবং শ্রীমদনমোহনের সেবা লাভ হয়। পুরুষাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পরাকাশে শ্রীকৃষ্ণের যত প্রকাশ—স্বয়ংপ্রকাশ পর্য্যন্ত সবই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। একমাত্র মধুররস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয়গণ শ্রীনিত্যানন্দ হইতে প্রকটিত। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার দয়া হয়।

শুদ্ধভক্ততত্ত্ব ও অন্তরঙ্গ ভক্ততত্ত্ব—এই উভয়েই আরাধকতত্ত্ব। আরাধ্য সেবকরূপী তত্ত্বদ্বয় এই আরাধক তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবনবৃত্তিতে অবস্থিত। অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তি-তত্ত্ব মধুররসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা। তজ্জন্য মধুররসের নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুররসাশ্রিত হন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাই-চাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস ॥"

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই স্বয়ং ভগবান্। পাঁচটী তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও কৃষ্ণকেই একমাত্র ভজনীয় বস্তুরূপে প্রচারার্থ ভক্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও জীবমঙ্গলের জন্য সেবকোচিত লীলা প্রদর্শনকারী। তিনি ভোক্তার লীলা প্রদর্শন-কারী নহেন। ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর, নিখিলমাধুরী-আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের এক অপূর্ব্বচিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা পূজকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনরত। শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়বিগ্রহ মাত্র নহেন, তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁ'র নিত্যানন্দ-ভাই ॥

ভক্ত-অবতার তাঁ'র আচার্য্য-গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিনতত্ত্ব— সর্ব্বারাধ্য করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব— আরাধক করি' জানি॥"

অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ও তদ্বিতরণরূপ ঔদার্য্যপরাকাষ্ঠাই পঞ্চতত্ত্বের কৃত্য। জগতের প্রতি মহাবদান্যতা ব্যতীত পঞ্চতত্ত্বের আর কোনই কার্য্য নাই। প্রেমভাণ্ডারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পূর্ব্বে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ভাণ্ডার দুর্ভেদ্য দ্বাররুদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারে পাঁচ তত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্ন করত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিলেন। যতই প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতে থাকিল, অপ্রাকৃত প্রেমের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে উহা ততই উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া প্রেমরসাস্বাদনকারি-গণের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। প্রেমভাণ্ডার অবারিতদ্বার হইলে প্রেমরসবন্যা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল। তাহাতে বদ্ধজীবকুলের কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাবন্ধনবীজ নষ্ট হইয়া গেল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের তটস্থাখ্য জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যস্বরূপ ভোগবাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রভাবে সঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধনদ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকা জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদির উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতলবারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনাবীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভাবনা রহিল না।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ, তাঁ'র পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলা ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁ'র শুদ্ধ কলেবর॥

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন ।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে, কাঁদে, হাসে, গায় যৈছে মদমত্ত ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উঘাড়ে ।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায় ॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজনাশ ।
তাহা দেখি' পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥"

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ"—এই পদে যে 'আদি' শব্দ আছে, তন্মধ্যেই গুরুতত্ত্ব অনুস্যূত আছেন। এই ছয়প্রকারেই শ্রীগৌরসুন্দর বিলাস করেন। এই পঞ্চতত্ত্বই হরিনামরূপে কলি বা শ্রুতি-বিরোধিনী যুক্তিমূলক অসম্মতবাদ বিনাশ করিয়া নিজ বিলাস বিস্তার করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বেচ্ছাক্রমে কৃপাপরবশ হইয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক বাচ্য কৃষ্ণ বা তদভিন্নবাচক নামপ্রভু অপ্রাকৃত শব্দরূপে জগতে অবতীর্ণ। যাহাতে আমরা শ্রীদামোদরস্বরূপের অনুগত গৌড়ীয়গণের যূথে অবস্থিত হইতে পারি—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সনাতনস্বরূপাত্মা রঘুনাথভাব-বিস্তারী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ মদনমোহনাভিন্ন নামপ্রভুর কুসুমশরদ্বারা বিদ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিতে পারি, সেই শিক্ষাই আমাদের বরণ করা প্রয়োজন।

মহামন্ত্রে তিনটী শব্দ—'হরা+হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'। এই তিনটী শব্দই পঞ্চতত্ত্বাত্মক; পাঁচরূপে বিলাস করিতেছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥" (ভাঃ ১১।৫।২৯)

যাঁহারা উত্তম বুদ্ধিমান্, যাঁহারা চেতনময়, যাঁহারা চৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা প্রধানতঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ সংকীর্ত্তনাশ্রিত অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা ভজন করিয়া থাকেন। 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ যাঁহার জিহ্বায়, অথবা যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যিনি 'অকৃষ্ণ' বর্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—তাঁহার সাঙ্গ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—তাঁহার অঙ্গের অবয়ব বা উপাঙ্গ, হরিনামাদিই তাঁহার অস্ত্র, শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপাদি তাঁহার পার্ষদ। পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সম্বন্ধটী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।"

এই মহামন্ত্রে 'হরা-কৃষ্ণ', 'হরা-রাম' ও 'হরা-হরি'—এরূপ আশ্রয়বিগ্রহ সমন্বিত বিষয়বিগ্রহের নাম রহিয়াছে। ইহারাই আবার পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ অর্থাৎ হরা ও কৃষ্ণ, হরা ও রাম, হরা ও হরির মিলিত তনুই শ্রীগৌরসুন্দর। পঞ্চতত্ত্বের আদি-শব্দে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু বুঝাইতেছে; অতএব গৌরসুন্দর ছয়রূপে বিলাস করিতেছেন। হরা+হরি, কৃষ্ণ ও রাম—এই তিন বাচকের বাচ্যবস্তু—পরম মুক্তগণেরই আরাধ্য-বস্তু, অপরাধযুক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট সুলভ নহেন। যখন অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণকেও অহৈতুকী কৃপা করেন, তখন তিনি পঞ্চতত্ত্ব বা তন্মধ্যস্থিত 'আদি'-শব্দোক্ত গুরুতত্ত্ব সমাশ্লিষ্ট হইয়া ষট্তত্ত্বরূপে ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিবার জন্য অবতীর্ণ হন।

স্বয়ংরূপের সন্ধিনীশক্তি স্বয়ংপ্রকাশ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা প্রকট করেন। স্বয়ংপ্রকাশ—সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ। স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান লইয়া স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংরূপ বা স্বরূপের বৈভবকে স্বয়ংপ্রকাশই প্রকট করেন। তটস্থশক্তি জীবের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণরূপ কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু মায়াভর্ত্তা, জীবের পিতা ও বিশ্বের কর্ত্তা, নিয়ন্তা বা নিমিত্ত-কারণ; তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বয়ংপ্রকাশেরই অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুরই অংশের অংশ বা কলা; যথা—

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥"

শ্রীগদাধর পণ্ডিত—হরা, শক্তি, কলত্র অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ, আর শ্রীবাস—ঐশ্বর্য্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ সুজনশ্রেষ্ঠ। 'আদি'-শব্দে যে

গুরুদেব, ঐশ্বর্য্যরসে তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন, আর মধুররসে তিনিই শ্রীগদাধরের সহিত অভিন্ন।

যাহারা বিয়োগ-মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদিগের মায়া বা দম্ভ বিনাশ করিয়া তাহাদিগের অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিবার জন্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাসমন্বিত কৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে বা মহামন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের বিলাস প্রদর্শন করেন। নামই পঞ্চতত্ত্ব বা ষট্‌তত্ত্ব। মহামন্ত্রই—শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—সমস্তই গোকুল-নবদ্বীপ মহোৎসব শ্রীনামপ্রভু। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ নামরূপ অস্ত্রের দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের মায়া বা দম্ভ নাশ করিবার জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই এই মন্ত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যশক্তিবলে নিজেই অস্ত্র ও নিজেই অস্ত্রধৃক্—নিজেই নাম, আবার নিজেই নামকারী—নিজেই প্রেম বা নিজেই রস।

জন্মাষ্টমী

দ্বাপরের মহালগ্নে ওঠে ঝঞ্ঝা-ঝড়।
পুঞ্জীভূত কালোমেঘ ডাকে কড়্ কড়্॥
বিদ্যুতের অগ্নিশিখা অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়ে ভীত হয় সবে কাঁপে থর্ থর্॥
ঘন ঘন বজ্রপাত, বর্ষণ প্রবল।
একাকার করে তোলে সব জল-স্থল॥
চতুর্দ্দিকে ঘিরে ধরে সে যেন দুর্যোগ।
থাকে নাকো কোনদিকে কোন যোগাযোগ॥
সর্ব্বগুণযুত কাল পরমসুন্দর।
পৃথিবী পূরিয়া হৈল আনন্দমঙ্গল॥
বসুদেব ও দেবকী কংস কারাগারে।
মুক্তির প্রার্থনা নিত্য করে বারে বারে॥
শিশুরূপে মাতৃক্রোড়ে আসে মহাজ্যোতি।
আলোকিত করে বিশ্ব মহা পূতঃ অতি॥
পরিত্রাতা-আবির্ভাবে ধ্বংস হয় অরি।
স্মিতহাস্যে জেগে ওঠে যাদবকেশরী॥

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,** সাংবাদিক, পি. টি. আই

কাম

প্রাকৃত জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণের অবস্থান। এই গুণত্রয়ে আত্মবন্ধনপূর্ব্বক জীব ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া কামনাবশে বিবিধ দুঃখের আবাহন করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক মন রজোগুণযুক্ত হইলে সঙ্কল্প ও বিকল্প বিচার করে এবং বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে দুরপণেয় কামদ্বারা অভিভূত হয়। বিষয়-কামনা-পরবশ রজোবেগ-মোহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়-ভোগকালে আপাত-মনোরম বোধে কামকে পরমসুহৃদ্ মনে করে, কিন্তু পরিণামে যখন সেই কার্য্যের ফলস্বরূপে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বৈরী বলিয়া মনে করে। পুনঃ পুনঃ দুষ্পূরণীয় কামের দ্বারা অজ্ঞ জীব প্ররোচিত ও প্রতারিত হইলেও সেই কামকে চিরশত্রু বলিয়া জ্ঞান করে না, পরন্তু কর্ম্মসমূহের পরিণামে দুঃখরূপ ফল দর্শন করিয়াও তাহার আচরণ করিয়া থাকে।

কথায় বলে, "কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা" অর্থাৎ "কামার্ত্ত ব্যক্তিদিগের ভয় বা লজ্জা কোন কিছুই থাকে না।" কামরূপী নিত্যশত্রুর দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত হয়। ঘৃতবিন্দু সংযোগ করিয়া অনলকে যেরূপ শান্ত করা যায় না, তদ্রূপ ভয়-লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া জীব ভোগ্যবস্তু (অভিপ্রায় মত) প্রদান করিলেও দুর্জ্জয় কামকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ব্যক্তির মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে প্রমাণের অভাব নাই।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি - এই তিনটীকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া কাম পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কাম মনকে আশ্রয় করিয়া বহুবিধ সুখের কল্পনা করে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তাহা নিশ্চয় করে, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া রূপ-রসাদি বিষয় ভোগ করে, হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাম জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাহার আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তিলাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে মৃদু, মধ্য ও তীব্রভেদে কামের ত্রিবিধত্বের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ত্রিবিধ কামকে ক্রমান্বয়ে ধূম, দর্পণ ও জরায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ অগ্নি ধূমদ্বারা আবৃত হইয়া উজ্জ্বলতা গুণ হারাইলেও তাহার উষ্ণত্বাদি কিছু কিছু গুণ সম্ভব হয়, তদ্রূপ মৃদু কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলেও তাহা কিছু কিছু তত্ত্বার্থজ্ঞান

গ্রহণে সক্ষম হয়। ধূলিদ্বারা আবৃত হইলে দর্পণ যেমন স্বচ্ছতা হারাইয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয় না, তেমনি মধ্যকামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলে তাহা তত্ত্বার্থ গ্রহণে অক্ষম হয়। যেরূপ জরায়ুর দ্বারা আবৃত গর্ভে পদাদির প্রসার-চালনা সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ তীব্রকামের দ্বারা তীব্রভাবে জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে জ্ঞানের প্রতীতির লেশমাত্রও থাকে না।

জীবের আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায়গুলি হইল কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়্‌রিপু। রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহারই নাম 'কাম'। 'কাম' ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ানক ও রিপুগুলির সকলেরই মূল। বস্তুতঃ 'কাম' অর্থে কামনা, বিষয়-বাসনা। নিজসুখ-সম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম 'কাম'। "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" অর্থাৎ কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র কাম ও ক্রোধ জীবের মুক্তিদ্বারের অর্গলস্বরূপ। "কামক্রোধৌ হি মোক্ষদ্বারার্গলাবুভৌ।" জীবের কামনা মিষ্ট-রসাদি বা ধনাদির দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে 'লোভ' বলে। যখন বিষয়-বাসনা জীবকে অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করিয়া রাখে, তখন সে আত্মজ্ঞান নাশহেতু বিষয়াতীত নিত্যবস্তুকে দেখিতে পায় না, ইহার নামই 'মোহ'। কাম হইতে উদ্ভূত অজ্ঞানতা যখন 'আমি ধনী', 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ অহমিকা ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে 'মদ'। অহমিকা আবার যখন পরের উন্নতি দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত বা সঙ্কুচিত হয়, তখন যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম 'মাৎসর্য্য' বা 'পরশ্রীকাতরতা'। অতএব দেখা যাইতেছে, কামই সকল অনর্থের মূল, উহাই জীবের একমাত্র শত্রু। কামই জীবকে পরমার্থ লাভ হইতে বঞ্চিত করে। অনল-সদৃশ কামের অধীন হইলে শান্তি ত' দূরের কথা, নানাপ্রকার শোক, সন্তাপদ্বারা দগ্ধীভূত হইতে হয়।

স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—"সঙ্কল্পমূলা সর্ব্বে কামাঃ।" কাম-সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তি-বিশেষ। উহা কখনও আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না, উহা মনেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। যদি কাম আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক বলিয়া তাহা যেমন পরিত্যাগ করা যায় না, তেমনই কাম আত্মার ধর্ম্ম হইলে তাহা পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া পরিত্যাগের অযোগ্য হইত। তাই সর্ব্বাগ্রে অতি প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কামকে জয় অর্থাৎ বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে সেই কামজয়ের পদ্ধতির কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কাম্যবস্তু প্রদানের দ্বারা কাম জয় অসম্ভব

কামের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা জীবের সামর্থ্যের অতীত। কাম দুষ্পূরণীয়। ভোগ-পিপাসার শান্তির জন্য একের পর এক নিত্য নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহ করিলেও এই কামের পরিতৃপ্তি হয় না। কামের অভিপ্রেত দ্রব্য প্রদানের দ্বারা কাম-জয়ের যে প্রচেষ্টা, তাহা বালির বাঁধ দিয়া বন্যার জল আটকাইবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ। পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে তাহা একজনকে প্রদান করিলেও তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে না। তাই বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রবাহের মূল ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "কল্যাণকল্পতরু"-নামক গীতিকাব্যে লিখিয়াছেন, —

একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' যাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ॥

দানের দ্বারাও কামকে জয় করা যায় না। দান ত' দূরের কথা, সাম ও ভেদ-নীতির দ্বারাও তাহাকে বশীভূত করা যায় না। কারণ কাম অতিশয় উগ্র বলিয়া সে জীবের বিবেক-বুদ্ধি লোপদ্বারা তাহাকে নিষিদ্ধ ব্যাপারেও প্রবর্ত্তিত করে। তাই সাম, দাম ও ভেদনীতির দ্বারা কামকে স্ববশে আনিবার চেষ্টাও বৃথা।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই কামজয়ের একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র

আসক্তিমূলক সঙ্কল্পসকল কামের মূল বলিয়া তাহা হইতে যাবতীয় ভোগ এবং তাহার মূলীভূত কর্ম্ম সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জড় সঙ্কল্পাদি ত্যাগ করিতে পারিলে কাম কখনও উৎপন্ন হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। নিকৃষ্ট বিষয় ত্যাগ না করিলে উৎকৃষ্ট বিষয় লাভ করা যায় না। ভগবৎসেবা-সঙ্কল্প ব্যতীত কামসঙ্কল্প পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ পরতত্ত্ব আত্মানুভবের দ্বারা কাম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ৭।১০।৯) "বিমুঞ্চতি যদা কামান্" শ্লোকে পাওয়া যায়, "মানব যখন নিজের মনস্থিত কামনাসমূহ পরিত্যাগ করে, তখন ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয়।" এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতিও (কঠ ৬।১৪) "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" শ্লোকে বলিয়াছেন, —"যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা-বিমুক্ত হওয়া যায়, তখন জীবাত্মা অমৃত হয়, ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।" অখিল-সদ্গুণসম্পন্ন, গুণাতীত পুরুষোত্তমের সেবাপর

হইলেই জীবের জড়কাম সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটীকার ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নিত্য কামদেবের কামসেবা উদিত হইলে কামাবসায়িতা-নাম্নী সিদ্ধি প্রকৃতপ্রস্তাবে করতলগতা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাম-লোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বদ্ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

"যমাদি যোগপথের দ্বারা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত মন সেরূপ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না, যেরূপ মুকুন্দসেবার দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে নিগৃহীত বা শান্ত হয়।"

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ মন চঞ্চল হয় বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় জয় একান্ত আবশ্যক। বহিরিন্দ্রিয় আগে জয় করিতে পারিলে অন্তরিন্দ্রিয় ক্রমশঃ জিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলেই কামকে অনায়াসে জয় করা যাইবে। শ্রীভগবানে শরণাগতি ব্যতীত অতি প্রবল ও দুর্জ্জয় কামকে বশীভূত করিবার অন্য কোন উপায় নাই। আবার শরণাগতি লাভের একমাত্র উপায় শরণাগত ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।
শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলাবে সব,
সিংহরবে করিগণ যথা॥

শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

সাধুসঙ্গ-কৃপা, কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

দস্যুগণ যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রিতের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া স্বয়ং নিজেরাই তাহার বশীভূত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীব গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশানুসারে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাদের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকিলে কাম অনায়াসে বশীভূত হইয়া যাইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

কাম—কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।

শ্রীভাগবতের ৭।৭।৩০-৩৩ শ্লোক কিরূপে কাম জয় করিয়া ভগবানে ভক্তিলাভ করা যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধুভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ-কর্ম্ম কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তিসমূহের দর্শন-

পূজনাদি, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি — এইসকল ক্রিয়াদ্বারা কামাদি ষড়্বর্গ জিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে সুদৃঢ়া ভক্তি হইবে।”

ইন্দ্রিয়গণকে মনের কথানুসারে চলিতে দিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের শাসনে ও আনুগত্যে শ্রীহরিসেবা করিয়া গেলে ইন্দ্রিয়সমূহ জীবকে অধঃপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে। ভক্তের কৃপা পাইলে সকল ইন্দ্রিয়সমূহ রিপুভাব ত্যাগ করিয়া মিত্র হইবে। তখন কামও অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে এবং জীবকে বিমল প্রেমের আস্বাদন করাইবে। স্বয়ং মায়াদেবী যেক্ষেত্রে ভগবদাশ্রিতের প্রতি কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না, সেইক্ষেত্রে তদধীন গুণ বা গুণজাত কামাদি ভগবদাশ্রিতের কি ক্ষতি করিতে পারে? মানব প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয়ে থাকিলে যেরূপ অন্য রাজা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তদ্রূপ অসীম পরাক্রান্তশালী সর্ব্বশক্তিমান্ কামদেব মদনমোহনের আশ্রয়লাভপূর্ব্বক তাঁহার ভক্তিরূপ দুর্গে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া যাইতে পারিলে কামাদি আর কোন বিপদের সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যেক সৌভাগ্যবান্ জীবকে অপ্রাকৃত কামদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিস্তার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, —

জড় কাম পরিহরি,　　শুদ্ধকাম সেবা করি’,
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[হাজী দেশারথ কলেজ, পাঠানখালি (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), তাং ১১।৫।১৯৮৫]

সর্ব্বাগ্রে মদভীষ্টদেব জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী! আজ আমরা সনাতন ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণের জন্য এস্থানে সমবেত হয়েছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়

প্রথমতঃ এই পাঠানখালি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় (শ্রীঅরবিন্দ পাণ্ডা), পরবর্ত্তি-কালে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে বহু কথা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আলোচনা করেছেন। তথাপি আমার আলোচনার জন্য কিছু অবশেষ রেখেছেন এঁরা। শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আবার একটী নূতন প্রশ্নও এসেছে এখানে। সে সম্বন্ধেও আমি কিছু আলোচনা করব। সনাতন ধর্ম্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওকথা আলোচনা করতে হত। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে আমাকে উপকার করেছেন।

প্রশ্নটা হল, —'পৃথিবীতে যে-সব ধর্ম্ম সৃষ্টি হয়েছে, তাদের একজন একজন করে প্রবক্তা ছিলেন। যেমন, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ ইত্যাদি। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের প্রচারকরূপে কে এসেছিলেন।' প্রশ্নটা ভালই। সর্ব্বপ্রথমে সনাতন ধর্ম্মের প্রবক্তা, সংরক্ষক, পালন-পোষণকর্ত্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতম্"—কথাটা বলা হয়েছে শাস্ত্রে। সনাতন ধর্ম্ম হল ভগবৎপ্রণীত। ভগবান্ সনাতন, জীবাত্মা সনাতন, ভক্তিতত্ত্ব সনাতন এবং সেই ভগবানকে পাওয়ার যে রীতি-নীতি সেটাও সনাতন। সনাতন ঋষিনীতির দ্বারাই সনাতন ভক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে সনাতন পরম পুরুষ ভগবানকে লাভ করা যায়—একথা সনাতন শাস্ত্রেই উক্ত হয়েছে।

সেই সনাতন ধর্ম্ম প্রথমেই গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বলে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশ এই 'গুরুনিষ্ঠ' ধর্ম্মকে —সনাতন ধর্ম্মকে **True Catholic Religion** বলেছেন, যদিও সনাতন ধর্ম্মই আদি। এই সনাতন ধর্ম্মকে আবার 'বেদনিষ্ঠ' ধর্ম্ম বলা হয়েছে। "যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে। যাহা নাহি ভাগবতে তাহা নাহি পৃথিবীতে॥" ভাগবতের ইতিহাসে ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। সনাতন ধর্ম্মের মূল-প্রচারক, ধারক-বাহক হলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আদি-অনাদি তিনি। কালবিচারে দেখা যায়, সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছেন, ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। এইরূপ অবতারাবলীর আবির্ভাব চিন্তা করলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র Junior, আর **Senior** হবেন নৃসিংহদেব বা শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু একই ব্যক্তি যদি বার বার আসরে **Part play** করতে আসেন বিভিন্ন সময়ে, তাহলে তাঁর প্রাচীনত্ব কখনও নষ্ট হয় না। সেইকথা সনাতন শাস্ত্রে বলেছেন।

অবতারী এবং অবতার—দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে শাস্ত্রে। সমস্ত অবতারের মূলতত্ত্ব যিনি, তিনি হলেন অবতারী। শ্রীনৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি আদি

সকলেই অবতার। সমস্ত অবতারের অবতারী হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ব্রহ্মাজী গোবিন্দ স্তব করেছেন, তার ভিতরে বলছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সমস্ত অবতারের কথা এর ভিতরে আলোচনা করেছেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলছেন,—সমস্ত অবতারের মূলীভূত কারণ—Main Fountain Source হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে সেই কথাই আবার বললেন,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি-অনাদি, সকলের উপরওয়ালা। কে সেই কৃষ্ণ?—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

ভগবান্ যে ধর্ম্মের ধারক-বাহক, সেই তত্ত্বদর্শনের মধ্যে এসেছেন শ্রীব্রহ্মা, নারদঋষি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ভগবান্ প্রথম উপদেশ করেছেন সনাতন ধর্ম্ম। যদি প্রশ্ন হয়, সনাতন ধর্ম্ম প্রথমে কোথা থেকে এল? তদুত্তর এই যে, প্রথম আদৌ ভগবান্ তিনি উপদেশ করেছেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব। তাহা চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশিত। ব্রহ্মাজী নারদকে সেই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। নারদঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সেই তত্ত্ব উপদেশ করেছেন।

যেখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণস্তথা।" ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। তিনি বেদবিভাগকর্ত্তা হয়ে এসেছেন। বেদকে চারভাগে ভাগ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সেইজন্য তাঁর নাম হয়েছে বেদব্যাস। ব্যাস-শব্দের অর্থ বিস্তৃতি। যিনি বৈদিক জ্ঞানকে বিস্তৃত করেছেন, বৈদিক জ্ঞানের যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান দিয়েছেন, তিনি হলেন বেদব্যাস। ব্যাস হল একটা Post—পদাধিকার-এর নাম। সেই পদাধিকার নিয়ে ভগবান্ ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করেছেন, সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এইভাবে সনাতন ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছে জগতে এবং এই কলিকাল পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। কাল-বিচার একটা পৃথক্ জিনিস। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটে যুগকে যদি একটা Unit ধরা যায়, এইরকম ৭১টা Unit সমান একটা মনুর রাজত্বকাল এবং এইরূপ ১৪টা মনুর রাজত্বকাল অতিক্রান্ত হলে আমাদের ব্রহ্মাজীর হয় অর্দ্ধদিবস, ১২ ঘণ্টা। হিসাব শুনলে মাথা খারাপ হয়। আমাদের ব্রহ্মার পরমায়ু ঐরকম ধরণের ২৪ ঘণ্টায় দিন, ৩৬৫ দিনে বৎসরের শতবর্ষ পরমায়ু। তথাপি তাঁর একটা অবসানকাল রয়েছে।

শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই এই সনাতন ধর্ম্মের মাঝখানের ধারক-বাহক। তিনি বেদবিভাগ করে সমগ্র জগৎকে জানিয়েছেন সবকিছু। পরবর্ত্তিকালে ঋষিগণ সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁদের যে উপলব্ধ সত্য সেটা জগৎকে জানিয়েছেন। পরবর্ত্তিকালে সনাতন ধর্ম্মের ধারক-বাহক কারা?—যদি এই প্রশ্ন করা হয়, তাহলে বলতে হবে—তাঁরা আর্য্যঋষিগণ, মুনি-ঋষিগণ। যে মুনি-ঋষিগণের সম্বন্ধে গীতা-ভাগবতে বহু কথাই বলা হয়েছে। তাঁদের অধিকার—জগৎ যে অবস্থা নিয়ে নিদ্রিত আছে, ঋষিগণ সেই অবস্থায় জাগ্রত। জগৎ যে জিনিস আলোচনা থেকে বিরত আছে, ঋষিগণ সেই জিনিস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। মুনি-ঋষিগণের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন গীতার ভিতরে—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

তাঁদের দরদ জগতের প্রতি। তাঁদের কল্যাণচিন্তা কিরূপ, সেটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে। যদি বলা যায় যে, সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করলেন কে?—সনাতন ধর্ম্মের আদি প্রচারক বলতে গেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস– যিনি বেদবিভাগ করেছেন। বেদের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এই বেদের ব্যাখ্যা-গ্রন্থের নাম হল উপনিষদ্—বেদের শিরোভাগ। উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল ১১৮০ খানা। তার সার সঙ্কলন করা মুস্কিল্। তথাপি এর একটা Chart পাওয়া যায়,—

ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তৈত্তিরী।
ঐতরেয়ঞ্চ-ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥

এই দশখানা এবং শ্বেতাশ্বতর ও কৌশিতকী - এই বারখানা আলোচনা করলে মোটামুটি বেদ সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। তারপরে তিনি দেখলেন, এতেও কিছু হচ্ছে না। তখন তিনি বেদান্ত-দর্শন রচনা করলেন। পরে তার ব্যাখ্যা মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণাদি তিনি রচনা করলেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় বুঝাতে পেরেছেন, শাস্ত্র ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য ত্রিবিধভাবে রচিত হয়েছে। কথাটা ঠিক। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—তিনপ্রকার অধিকারীর জন্য তিনরকম ধরণের শাস্ত্র রচিত হল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই করলেন এটা। কেননা, অধিকার-ভেদ সবসময় মানতে হবে আমাদের। সকলের জন্য সমান অধিকার নয়। কিন্তু তাঁর যে বক্তব্য বিষয় ছিল, সেই বক্তব্য বিষয় তিনি সকলকে বুঝাতে পারেন নাই। সেটা বুঝাতে না পারার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। যা ভাগবত প্রকাশের পূর্ব্বাভাস বা প্রস্তাবনা।

তাঁর শম্যাপ্রাস বদরিকাশ্রমে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর গুরু নারদঋষি এসে হাজির হয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে ব্যাস ? ব্যাস বললেন, —আমি বুঝতে পারছি না, আমি কি এমন অজ্ঞাত অন্যায় করেছি। জীবকল্যাণের জন্য আমি ত' জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করি নাই—আমার বিশ্বাস। কিন্তু মানসিক শান্তির অভাব হচ্ছে কেন আমার ? নারদঋষিকে সেটা বুঝিয়ে দিতে বললেন। নারদঋষি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে পরে বললেন,—আমি তোমার অশান্তির কারন বুঝতে পেরেছি। তখন ব্যাসদেব বললেন,—হে গুরো ! হে অন্তর্যামী ! আপনি দয়া করে বলুন তাহলে, আমাকে বুঝিয়ে দিন। নারদঋষি বললেন, —জীবকল্যাণের জন্য তুমি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছ, তার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারে নাই বদ্ধজীব সব। কি বুঝাতে চেয়েছিলেন তিনি ? —ভগবানই পরমেশ্বর, পরাৎপরতত্ত্ব, পরমভজনীয় বস্তু ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁর আরাধনার বাস্তব তাৎপর্য্য বুঝতে পারে নাই কেউ। শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য, তাঁর মূল বক্তব্য ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তি তত্তদ্-অধিকারে থেকে তাঁদের নিজেদের উপাস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল এবং তাদের প্রাধান্য নিয়ে গণ্ডগোল আরম্ভ করল। মূল তত্ত্ববস্তু যিনি, তাঁকে বাদ দিয়ে সকলে চলতে চাচ্ছেন। একটা গ্রাম্যকথায় আছে—"যার জন্য রামের মা, তারে তুমি চিন্‌লে না।" ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে ভগবানের। তাঁর আরাধনার কথা কেউ বলছেন না। সেকথা অত্যন্ত দুঃখসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে স্বয়ং কৃষ্ণ বলছেন যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে,—

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ।
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্ময়ন্ত্যবজানতে॥

কৃষ্ণ নিজমুখে বলছেন,—জান যুধিষ্ঠির ! আমার আরাধনা বহু ব্যক্তি কষ্টকর বলে মনে করে। উপাসনাদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন। কিন্তু আমি ত' সাধারণের কাছে অতি সহজলভ্য। ভক্তিদ্বারাই আমাকে বশীভূত করা যায়। একটু জল আর তুলসীদল দিলেই আমি সন্তুষ্ট হই। আমি শাস্ত্রে বলে রেখেছি,—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

এই ত' আমার ভক্তবাৎসল্য, কিন্তু আমার সাধন-ভজন কেউ করতে চাচ্ছে না, আমায় ভালবাসতে কেউ চায় না। আমার যাঁরা প্রতিভূ, আমি যাঁদের কিছু কিছু বিশেষ অধিকার দিয়ে বসিয়েছি, সেই আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনা করে

জগতের লোক কিছু আদায় করে নিতে চাচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে। আমি মূল-মালিক, আমাকে কেউ চেনে না, জানে না, বুঝে না। ভগবান্ দুঃখ করে একথা বললেন।

বেদব্যাস বললেন,—আমি ত' সাধন-ভজনের কথা ঠিক বলেছি। রাজসিক, তামসিক শাস্ত্রেও আমি বলেছি—ভগবান্ পরমারাধ্য তত্ত্ব। সবকিছু বলেছ, কিন্তু দুনিয়ার লোক সেটা বুঝতে পারে নাই। তিনি কোথায় কিভাবে বলেছেন, সেইটাই আলোচনার বিষয় আজ :—

শৈব-ব্রাহ্মেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবৎ-শাস্ত্রযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।"

শিবশাস্ত্র—তামসিক শাস্ত্র, ব্রহ্মশাস্ত্র—রাজসিক শাস্ত্র। এগুলোর মধ্যেও আমি মোক্ষম কথা বলে রেখেছি। কি বলেছেন তিনি?—'তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবৎ-শাস্ত্রযোগী যৎ।' রাজসিক-তামসিক শাস্ত্র থেকে সেই বাক্য সব গ্রহণ করতে হবে—যেটা ভগবৎ-শাস্ত্রোপযোগী বাক্য। 'তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্'—এইটাই মোক্ষসাধক জ্ঞান। "অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥" এছাড়া আর যেসব বাক্য বলা আছে সেগুলো অসার, গৌণ বাক্য। অসুর-মোহনের জন্য যা বলা হয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। মূলবাক্য গ্রহণ করতে হবে—ভগবান্ পরাৎপরতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনিই মূলাধার, তিনিই সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব। এইভাবে সেই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝালেন শ্রীবেদব্যাস। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের ধারক-বাহক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

বেদব্যাসকে যদি আমরা অস্বীকার করি, তাহলে সনাতন ধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়ে যাবে। সেইকথা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ, মুনি-ঋষিগণ বুঝাতে চেয়েছেন। তাঁকে বাদ দিলে হবে না, তিনি হলেন **Highest Authority** শাস্ত্র সম্বন্ধে। শাস্ত্র কাকে বলি? বেদ কাকে বলি? —বেদ হল ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী, অপৌরুষেয় বাণী, পরোক্ষবাদ—**Indirect speach**। (ক্রমশঃ)

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ (ইং ৫।৬।৯২), শুক্রবার গৌর-পঞ্চমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫৫ মিনিটে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে সারস্বত বৈষ্ণবগণের সুপরিচিত **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজ** আমাদিগকে অকূল বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করত প্রয়াণকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধহৃদয়, সঙ্কীর্ত্তনে পরমোৎসাহ ও সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

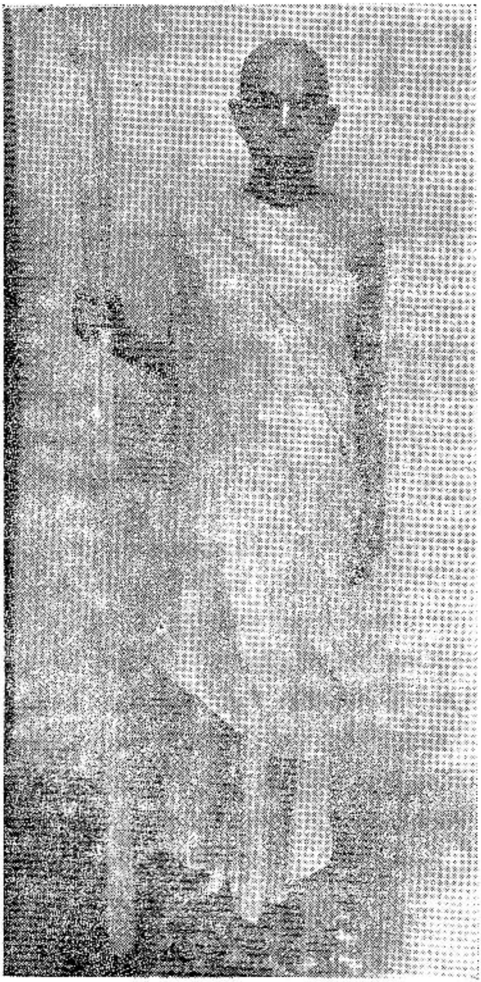

বেলা ১২ ঘটিকায় যথারীতি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ বিহারী-জীউর প্রসাদীমাল্য শ্রীমৎ ঊর্দ্ধ্বমন্থী মহারাজকে অর্পণ ও আরতি করিয়া শয়নদোলা সহ শ্রীমন্দিরপরিক্রমান্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রা সহ জাহ্নবী-পুলিনে "শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে" লইয়া যাওয়া হয়। সমাধির স্থান যথারীতি প্রস্তুত হইলে আশ্রমবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে সাত্বত-বিধানানুযায়ী সৎক্রিয়াসার-দীপিকাবলম্বনে বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ তাঁহার সমাধিকৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানা যায় না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলায় আবির্ভূত হন। পূর্ব্ব-জীবনে তিনি L. M. F. পাশ করিয়া সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন এবং পরে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত বোম্বে, দিল্লীস্থ বিভিন্ন মঠাদির সেবা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীপাদ দীনবন্ধু বাবাজীর (পূর্ব্বনাম শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী) সহিত মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে আসেন এবং পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে শুদ্ধভাবে ভজন করিবার আর্ত্তি প্রকাশ করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার আর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে থাকিতে নির্দ্দেশ দেন। তথায় তিনি তদানীন্তন মঠ-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে সেবা-কার্য্যাদি করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীসমিতির পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে নবদ্বীপে আসেন এবং বিগত ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৬৯ (ইং ১১/৩/১৯৬৩), সোমবার শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিতে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ প্রাপ্ত হইয়া 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ'-নামে পরিচিত হন।

বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাই তিনি মঠে থাকাকালে সন্ন্যাসের পরেও শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ ও বৈষ্ণব-দর্শনে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহার তত্ত্বসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা, শ্রীনামে রুচি ও পরাবিদ্যানুরাগ দেখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসমিতির প্রকাশিত পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘের একজন সম্পাদক ও শ্রীসমিতির পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সমিতির সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রকাশনে বহুপ্রকার সেবা করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনাদি-বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করিতেন।

গত ১৩ই আষাঢ় (ইং ২৮/৬/৯২) রবিবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (নবদ্বীপ) শ্রীল মহারাজের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিরহ-সভায় বৈষ্ণবগণ শ্রীল মহারাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করেন। তিনি আজ জড়দৃষ্টির অন্তরালে গেলেও তাঁহার জীবন-দীপশিখা যেন আমাদের সংসার রণাঙ্গনে চলার পথে পাথেয়-স্বরূপ হয়—ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি, বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ

৫ পদ্মনাভ, কারণোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৯, ইং ১৭/৯/৯২

৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ১॥

যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানুরাজের পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপা, সেই রাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ১॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ২॥

রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র-সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাদ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ-কুম্ভোপরি সঞ্চালিত সুদীর্ঘ মুক্তামালার দ্বারা যাঁহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ২॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৩॥

যাঁহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কান্তি-বিশিষ্ট, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্য-রূপ কর্পূরদ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-রস বিস্তার করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ৩॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৪॥

কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদুবাক্যদ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ৪॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৫॥

যিনি নিখিল ব্রজ-মহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর

কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্রী, যাঁহার অন্তরাত্মা ললিতা-সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথ প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্র-বক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকাং মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হইয়া কর্ণকুহরে কণ্ডূয়ণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকাং মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

নির্ম্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বকাসুর-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর-স্বভাবে নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৫ পৃষ্ঠার পর]

৪৪। আত্মবঞ্চক কাহারা ?

"যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট কীর্ত্তনাদির রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিভ্রান্ত আত্মবঞ্চক।"

—'তত্ত্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪৫। বৈড়াল-ব্রতিক কাহারা ?

"বৈড়াল-ব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে তচ্চিহ্নসকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে ; কোন দূর-উদ্দেশ্যসাধনই তাহাদের প্রয়োজন।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪৬। মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলনায় কপট পাপী কাহারা ?

"ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল-ব্রতিগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের নানাবিধ পাপ-কার্য্য করেন।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৪৭। ধর্ম্মধ্বজী কাহারা ও কয় প্রকার ?

"যাহারা ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন-সকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী—দুইপ্রকার অর্থাৎ কপট ও মূঢ়, বঞ্চক ও বঞ্চিত।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৮। পক্বযোগীর আনুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব কি ?

"কেবল বেশধারিগণ কপট পক্বযোগীর বেশ ধারণ করিয়া জগদ্বঞ্চনা করে। পক্বযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারা জীবন-ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সুখ অন্বেষণ করে। হরি-কীর্ত্তনই কৃষ্ণধর্ম্ম। অতএব কপটভাবে কীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রকটন-দ্বারা পক্বযোগীদিগের ন্যায় কর্ম্ম-ধর্ম্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশপূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে। তাহাতে

ফল এই হয় যে, যে-সকল সুখ-বিলাস-বিনোদদ্বারা তাহারা লোকদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে, সেই সকল বিলাসদ্বারা ঐসকল বেশধারীদিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্ত্তনাদিতে কপট রোদন ও মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দ্বারা তাহারা বিষয়ীদিগের বিষয়ী হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-বেশ ও ভিক্ষ্বাশ্রমাদি লক্ষণের গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট যাইতে পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাকৃত-জনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণগুণ-মহিমা-শূন্য হইয়াও কপট অনুরাগের লক্ষণ নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলক-প্রেমাদি বাহ্য রসের দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস-স্বরূপ হয়।" —ভজনামৃতম্

৪৯। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কুসঙ্গ কি?

"বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্ম্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্টাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করত সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ 'গুরু' হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপট, কুটীল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন।"

—'জনসঙ্গ,' সঃ তোঃ ১০।১১

৫০। অনর্থযুক্ত জীবের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টা কি হিতকর?

"ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ও ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-চেষ্টা সকল—অত্যন্ত অহিতকর।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

৫১। উপধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের 'ব্রহ্মচারী,' 'সন্ন্যাসী', 'পরমহংসা'দি পরিচয় প্রদানদ্বারা কি অপকার হয়?

"আজকাল নানাপ্রকার উপধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর ব্যক্তি আপনাদিগকে 'ব্রহ্মচারী', 'সন্ন্যাসী', 'পরমহংস' পরিচয় দিয়া প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মের উৎসাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" —'ব্রহ্মচারি-আশ্রম', সঃ তোঃ ১০।৭

৫২। যে কোন মতকে 'মহাপ্রভুর মত' বলিলেই কি প্রভুর শিক্ষা লাভ হইবে?

"অনেক স্থলে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম্ম-বিপাকে শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তি-রহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্ট মতকে প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন।" —'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৫৩। বাউলাদির মত কি বৈষ্ণব-মত ?

"বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে-সকল মত আছে, সে-সম্প্রদায়ই অবৈষ্ণব-মত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫৪। বাউল-মত কি শ্রীসনাতন গোস্বামী বা শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত ?

"বাউল-ধর্ম্ম যে আকারে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা—দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করে না; রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। ** ঐ প্রথার প্রবর্ত্তক যে কে, তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখনও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং কখনও শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কু-প্রথা শিক্ষা দেন নাই।" —'বাউল-মতের বিচার', সঃ তোঃ ৪।৪

৫৪। অভদ্রবেশ কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত ?

"মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী শ্রীসনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ির একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া দিলেন। অতএব **বাউল বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে।"** —'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৬। বাউলগণ কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ?

"বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।" —'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৭। সাঁই, দরবেশাদি সম্প্রদায় কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ? যদি না হয়, তবে তাহারা কি ?

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করাতেই সাঁই, দরবেশ, চরণপাসী, দুলাল-চাঁদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুসলমানের ফকির-বেশ ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে এবং আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা মুসলমান ফকিরের বেশ-ধারন ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং

চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে, ইহার প্রমাণ—'গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন।' কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণ-পালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এ কারণ **সাঁই, দরবেশ** প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে **একপ্রকার গুরুত্মদী সম্প্রদায়ী** বলিতে হইবে।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫৮। 'বৈষ্ণব-বংশ', 'বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ' প্রভৃতি কথা কি ঠিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরবজনক?

"বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়! আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং **বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।**"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

৫৯। 'সহজিয়া' ধর্ম্ম কি বৈষ্ণবধর্ম্ম?

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই 'সহজিয়া' বলিয়া একটী ঘৃণিত মত গোপনে গোপনে চলিতেছে. ঐ মতের কার্য্য সকল অত্যন্ত হেয়। সহজধর্ম্ম' বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে. তাহা পৃথক্। চিন্ময় জীবের চিন্ময় কৃষ্ণসেবাই সহজধর্ম্ম। যদিও এই ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে সহজ অর্থাৎ আত্মার সহিত জাত হইয়াছে, তথাপি জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা সহজ নয়। সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজধর্ম্ম যে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা সেরূপ নয়। **আত্মার সহজধর্ম্মে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত**। সম্প্রতি যে ধর্ম্মকে 'সহজিয়া'-ধর্ম্ম বলে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ।"

— সহজিয়া মতের হেয়ত্ব,' সঃ তোঃ ৪।৬

৬০। মুষ্টি-ভিক্ষা কি উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হয়? বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা কি?

"আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থ মুষ্টি-ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটী

ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। ** ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ জগতের কোন কার্য্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে।"

—'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৬১। কেন মুষ্টিভিক্ষা প্রথার ব্যভিচার হইল ?

"বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া এই অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ-দল মুষ্টিভিক্ষা প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন।" —'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

৬২। ব্যবসায়ি-গায়কগণের মুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কি আদর করেন ?

"ব্যবসায়ি-গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে **বজ্রাঘাতের ন্যায়** পড়িয়া থাকে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস' সঃ তোঃ ৬।২

৬৩। আখ্‌ড়াধারি-মহান্তগণের অবৈধ যোষিৎসঙ্গ কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত ?

"গোবিন্দদাস বাবাজীর ন্যায় মহান্তদিগের জন্য গৌড়ভূমির দেবালয়সকল দূষিত হইয়া গেল। আমাদের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই প্রকার দোষ আশঙ্কা করিয়াই ছোট হরিদাসকে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়াও কি ধর্ম্মধ্বজীদিগের ভয় হয় না ?"

—'শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট', বিঃ পঃ, ১ম বর্ষ

৬৪। শ্রীভক্তিবিনোদের সমসাময়িক গৌড়মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ?

"বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চয়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"—এই ন্যায়ানুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সাধকের পক্ষে গুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তৎফলে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কথাদ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য লোক আমার উপরে উঠে যাচ্ছে, এ জন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়ায়ই ভাগবত-ধর্ম্মকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম বলে বলা হয়েছে।

'আমি সেবা ক'র্‌ব, আমি সেব্য নহি'—এই সুবুদ্ধি যদি উদিত হয়, তা'হলে যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পে'য়েছি ও শি'খেছি, সেগুলি কে'টে যে'তে পারে। তা' না হ'লে ঐ দুর্ব্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থা'ক্‌বে।

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা-আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার বাসনায় পুনরায়-বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজন-রাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়-মনো-বাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥'—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে তিনি বঞ্চনা করেন, কারণ তত্তৎ অধিকারী বক্তির সেই সেই বিষয়যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর অন্য কোনও পথ নাই। "পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যে স্থানে, সেই স্থানেই মানব-জ্ঞান অন্য প্রকারের।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজেকে অবৈষ্ণব বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিভজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলময় বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষন হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে। তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দবোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানের নিকটে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন না। আবার অধোক্ষজসেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

হরিভজন করিলেই শরীর, মন, আত্মা—এই তিনটীই ভাল থাকবে, আর ভজন-বিমুখ হইতে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলে আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্ম কম পড়ে।

যে কপটতাযুক্ত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণ-ভজনের একটী অভিনয়মাত্র দেখায়, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই কৈতবসমূহ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—'এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত কৈতব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে অজ্ঞতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে অকৃত্রিম সাধুগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া অজ্ঞের তুচ্ছ বিষয়সুখ-বাসনা নিরস্ত করিয়া দেন; যেমন ধ্রুবকে কৃষ্ণ নারদের দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের

কপটতামূলক অজ্ঞতাভিনয় আছে বলিয়া তাহারা প্রকৃত নিষ্কপট ও অকৃত্রিম সাধুর দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদের বিষয় ভুলাইয়া দেয় না, তাহারা কৃষ্ণ মায়ার চাতরে পড়িয়া যায়। মোট কথা এই যে, কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপটী ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও সুদুর্ল্লভা প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই দয়াপরবশ হইয়া সদ্গুরু-পাদপদ্মের দ্বারা স্বচরণামৃত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

যে-সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যাহারা হরি-সম্বন্ধবিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবনধারণ না করাই ভাল। দ্বিপদ-মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি যদি হরির উপাসনা না করেন, তবে তাঁহারা কেবল-মাত্র জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন। দেবতাদের উপাস্য যে কৃষ্ণ, তিনি মনুষ্যেরও উপাস্য। সুতরাং অন্যান্য দেবতার উপাসনা না করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যাইবে।

দশমে দশম লক্ষণ

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

(ভাঃ ১০।১।১-স্বামি-টীকা)

দশমের অন্তর্গতই নয়টী লক্ষণ বা নব-লক্ষণ। শাস্ত্রকারগণ দশমের বিশেষ আদর করিয়াছেন। তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া আচার্য্যবর্গের মধ্যে অনেকেই দশমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা সেই আচার্য্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' পরিচালন করিব। আচার্য্য-সমাজের মূল পুরুষ শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ংই দশমের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় প্রথম হইতে নবম তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্তই দশমের অন্তর্গত—বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ১০ অধ্যায়ে ইহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ১
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ২॥

এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্ব যে আশ্রয় তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানছলে ও কোন স্থানে সাক্ষাদ্ বিচারের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের 'আশ্রয়'-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাক্ষ পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে,—জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ, আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত তত্ত্ব। 'সর্গ' হইতে 'মুক্তি' পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব। সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যান ছলে কিঞ্চিৎ গৌণরূপে এবং সাক্ষাদ্ উপদেশ ছলে সাক্ষাদ্ আশ্রয় তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৯৬)

সুতরাং 'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং' অর্থাৎ দশমতত্ত্বের বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব 'নবানামিহলক্ষণম্।'

পরতত্ত্বই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। উক্ত অচিন্ত্যভেদ ও অভেদ-তত্ত্ব বলায় বস্তু বা তত্ত্বটী অদ্বয় বা অভেদ নহে। যাহারা অচিন্ত্যভেদাভেদকে 'অভেদবাদে' পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমরা শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে দেখিয়াছি—'বৈষ্ণবমাত্রেই অদ্বৈতবাদী বা অভেদবাদী।' বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং দার্শনিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবমূলা। তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীকেও স্পষ্টভাবে 'অভেদবাদী' রূপে অঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই, ভীতও হন নাই। আমরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃত আলোচনা করিব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"**মাভেদবাদ** ইত্যেয় নালেখি ক্ষম্যতামিদম্।"

এক আশ্রয়-তত্ত্বের অন্তরালে নয়টী তত্ত্ব ক্রোড়ীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং দশম এক বচনাত্মক শব্দ হইলেও তাহাতে আরও নয়টী তত্ত্ব আশ্রিতরূপে নিত্য বর্ত্তমান। এই বিচার পরিত্যাগ করিলে মায়াবাদীর ন্যায় অভেদবাদী হইতে হয়। বেদের পূরণকারী পুরাণসমূহ দশলক্ষণে পরিপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির বিচারধারাও দশলক্ষণে লক্ষিত। 'মধ্ব প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমম্' - ইত্যাদি শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনমূলক তত্ত্বসমূহ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোকে নবতত্ত্বান্বিত দশমের কথাই বিচারিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দশমূল রচনা করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে দশমের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইয়া সারস্বত ধারার অবস্থিত থাকিব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশমূল, আম্নায়-দশমূল, ভগবদ্গীতা-দশমূল, ভাগবত-দশমূল, চরিতামৃত-দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্ত্তমান বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সমগ্র দশমূল গ্রন্থসমূহের নির্য্যাস-স্বরূপ পৃথক্ আরও একটী 'দশমূল-নির্য্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি এই 'নির্য্যাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'দশমূলকে যিনি হেলা করিবেন তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না।' সুতরাং নবধা ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ দশমূল-নির্য্যাস আলোচনা করা। তজ্জন্য আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যই এই নির্য্যাসের বিস্তার করা।

যাহারা অদ্বয় বা অদ্বৈতবাদী অথবা অভেদবাদী তাঁহারা সর্ব্বত্রই ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের স্বীকার করিতে নারাজ। একত্বই তাহাদের মূল স্বরূপ। এক বই দুই এর কোন কথা তাহাদের চিন্তার ভিতরে গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমরা তাহাদের অক্ষমতায় বিশেষ লজ্জিত হইতেছি। 'এক' শব্দ বহুত্বের পরিপোষক অথবা বহুত্বের সেবক, গোলাম বা দাস। বহুত্ব স্বীকৃত না হইলে একত্বের কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ এক বলিয়া কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান দশ-প্রমাণের দ্বারা লক্ষিত হয় না। প্রমাণ দশকের বহির্ভূত কোন তত্ত্ব যাহারা স্বীকার করিতে চেষ্টা করেন তাহারা ভ্রান্ত, নাস্তিক ও অসুর শ্রেণীভুক্ত। তাহারা এক বলিতে কি ধারণা করিয়া থাকেন? আমরা বলিতে চাই—এক 'আশ্রয়'-তত্ত্বই যাবতীয় আশ্রিত-তত্ত্বের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। এই শ্রেণীর একের অন্তর্গত দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং দশম শুধু দশম নহে—ইহার অন্তর্গত বহু লক্ষিত হইতেছে ও হইবে।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠার পর]

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য শিষ্যের একান্ত পালনীয় ঃ—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, দেবমন্দিরে গমন, ভগবৎপ্রবোধন, নির্ম্মাল্য পরিহার, সবাদ্য আরাত্রিক, প্রাতঃস্নান, শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ, বৈষ্ণবচিহ্ন—**ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র** ও গলে ত্রিকণ্ঠী **তুলসী মালিকা ধারণ**, হরিনামাক্ষর ধারণ, শিখাবন্ধন, তুলসী চয়ন, অর্চ্চনে **শ্রীগুরুর অনুমতি গ্রহণ,** পরিচর্য্যা, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস, মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা প্রদর্শন, জপ, ধ্যান, স্মরণ, **অভীষ্ট দেবার্চ্চন, শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তিপূজা,** মহোপচারে ভগবৎপূজা, ত্রৈকালিক হরিপূজন, **তুলসী পূজা,** ভক্তিগ্রন্থ পূজা, **সাধু-বৈষ্ণব পূজা,** শঙ্খধ্বনি, বিজ্ঞপ্তি, **আত্মনিবেদন,** স্তব-পাঠ, **দণ্ডবন্নতি,** নৈবেদ্যার্পণ, নবপুষ্প-ফলাদি অর্পণ, প্রিয়বস্ত্র সমর্পণ, আচমন, **আরাত্রিক দর্শন**, শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ, কৃষ্ণাগ্রে গীত-নৃত্যাদি, সঙ্কীর্ত্তন, তুলসী-নির্ম্মাল্যাদি ধারণ, **শ্রীচরণামৃত পান**, পাদ্যের আস্বাদন, ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, **নৈবেদ্যাস্বাদন,** ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান **কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিল চেষ্টা, তুলসী সেবন, সাধু-বৈষ্ণবসেবা, ভাগবত-শাস্ত্রাদির শ্রবণ,** বিশিষ্ট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, সাধুসঙ্গে **জন্মাষ্টমী-দোলোৎসবাদি** মহোৎসবের অনুষ্ঠান, **হরিবাসর সম্মান, চাতুর্মাস্য-ব্রত**—বিশেষতঃ কার্ত্তিক ব্রতের সমাদর, অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন, বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সকল ঋতুতে **মহোপচারে হরি-পূজা,** ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভোগাদি পরিত্যাগ, **ধামবাস, কৃষ্ণস্থানে গমন, পরিক্রমা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন** শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সৎশিষ্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুর পদাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল তাহা গ্রহণ করেন, যাহা প্রতিকূল তাহা বর্জ্জন করেন। তিনি কৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া জানেন। তিনি নিখিল জীবগণকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ প্রদান করেন না। **সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ** হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। ভজনের সহায়ক জানিয়া তিনি বৈষ্ণব-সদাচারসমূহ পালনে কৃতসংকল্প হন। ত্রিকণ্ঠী তুলসী-মালিকা ধারণ, দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি, ত্রিসন্ধ্যা জপ-আহ্নিকাদির অনুষ্ঠান, তুলসী-শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি-আরাত্রিক দর্শন, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালন, বৈষ্ণবসেবা

ও সাধুসঙ্গ তাহার প্রাত্যহিক কৃত্য হইয়া পড়ে। গুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্যে তিনি ভক্তির অনুকূল জানিয়া সদ্‌গ্রন্থাদি আলোচনা, নির্ব্বন্ধ-সহকারে সংখ্যা রক্ষাপূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী হন। "হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা"—বাক্যাবলম্বনে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরু-কৃষ্ণসেবায় রুচিবিশিষ্ট। তিনি ভোগী বা ত্যাগী নহেন, তিনি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী। তিনি ভগবদ্ভজন-ব্যাপারে হতাশা বা নিরাশা-ভাবপোষণ করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ উৎসাহান্নিশ্চয়া-দ্ধৈর্য্যাৎ" বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি অপ্রাকৃত শ্রৌত-পন্থায় বিশ্বাসী, সুতরাং চিৎকর্ণের দ্বারাই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাসৌন্দর্য্য গ্রহণে লালসাযুক্ত। প্রভুর সেবার বিনিময়ে তিনি কিছুই প্রত্যাশা করেন না, গুরুসেবাই তাঁহার জীবন।

"গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া"—গুরুদেবের আজ্ঞা তিনি নির্ব্বিচারে পালন করেন, তাই তিনিই সৎশিষ্য। গুরুদেবের ইচ্ছাপূর্ত্তিই তাঁহার একমাত্র কাম্য। গুরুদেব যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তিনি সর্ব্বদা তদনুরূপ আচরণ করেন। শরণাগতিই গুরুসেবকের একমাত্র ভূষণ। কায়-মন-বাক্য যথাসর্ব্বস্ব তিনি গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া অকিঞ্চন হইয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব গুরুদেবের অশোকাভয়-অমৃতপদে সমর্পণ করিয়া—'গুরুদেবের আমি' হইয়া তিনি পরম নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হন। তিনি নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না—আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রধাবিত হন না। গুরুদেবের সুখকামনা ব্যতীত তিনি যাবতীয় ইতর কামনা-বাসনা-পরিত্যাগ করেন বলিয়া পরম শান্ত। বাস্তব সত্যের পালনকারী বলিয়া তিনি নিরপেক্ষ, কিন্তু দাম্ভিক নহেন। দীনতার ও বৈষ্ণবতার পূর্ণ আদর্শ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। তাই তিনি নিজকে পতিত অধম বলিয়া জানেন। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার' জ্ঞানে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বয়ঃকনিষ্ঠ সকল সতীর্থগণকেই যথাযোগ্য সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবের বৈভব—ইহা সৎশিষ্য প্রকৃতই তাহার হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। শরণাগত শিষ্য গুরুদেবকে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া জানেন। শ্রীগুরু-কৃপায়ই ভগবৎকৃপা লাভ হয়—অন্তরঙ্গ সেবক এই বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা এইরূপ—

"হা হা প্রভু গুরুদেব! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ-পদতলে দেহ ঠাঞি ॥"

সৎশিষ্য জানেন—ভগবদ্দর্শনে বা ভগবদ্ভজনে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ও শ্রীগুরু-কৃপাই মূল। সদ্‌গুরু জগতে দুর্ল্লভ। ভাগ্যক্রমে মন্ত্র-দীক্ষাদি ও সেবা-সুযোগ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে গুরুদেবের কৃপানির্দ্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি কালক্ষেপ না করিয়া উহা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি আরও জানেন—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥ (বিষ্ণুযামল)

শৈব ও শাক্ত কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা উচিত নয়। উঁহাদের নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিলে হরিভক্তি লাভ হয় না। অন্য সাধনে মঙ্গল নাই; ভগবদ্-ভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য যত্ন করেন। তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে সদুপদেশাদি লাভ করেন।

প্রকৃত গুরুসেবক জানেন—গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদূরিত হইলেই তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন। তাই তিনি সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করেন, গুরুদেবকেও তদ্রূপ জানিয়া তাঁহার সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনি "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।"—শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম যথার্থ উপলব্ধি করেন। তিনি গুরুতে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানেন। তিনি গুরুনিন্দা ও গুরুবিদ্বেষে রত হন না; গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

গুরুদাস জানেন,—গুরুদেব নিত্যসেব্য বিগ্রহ ও করুণাময় পতিতপাবন মূর্ত্তি। তাঁহার কৃপালোকই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। গুরু-কৃপা লাভই ভগবৎকৃপা-লাভ এবং তাহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মূল। তাই তিনি লোক দেখানো গুর্ব্বানুগত্য না করিয়া শ্রীগুরুদেবের জগন্মঙ্গলকর নাম, গুণ, মহিমা-কীর্ত্তন ও তাঁহার উপদেশাদি পালন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া জানেন। তিনি গুরুর আচার ও বিচারের সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করেন। তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নিজ-জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন। গুরু ব্যতীত জগতে তাঁহার আপন বলিয়া কেহ নাই, তাই অনুক্ষণ গুরুদেবের মহিমা-কীর্ত্তনে তিনি রুচিবিশিষ্ট।

স্নিগ্ধশিষ্য জানেন—মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাই, ঐকান্তিক গুরুসেবাদ্বারাই উহা লাভ হইয়া থাকে। তাই তিনি গুরুসেবার জন্য প্রাণ

বিসর্জ্জন করিতেও কুন্ঠিত নহেন। তিনি জানেন—গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। নিজে নিজে ভগৎসেবা হয় না। এজন্য গুরুর আনুগত্যেই তিনি কৃষ্ণসেবা করেন। কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে গুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। তিনি সেবার দ্বারাই গুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ সেবা-তৎপরতাই নিকপট শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। তিনি গুরুসেবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট পার্থিব ধন-জন-বৈভবাদি কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নয়। গুরুই তাঁহার হিতকারী বন্ধু, তিনিই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, জীবন, ধন ও যথাসর্ব্বস্ব।

অন্তরঙ্গ ভক্ত জানেন—গুরুদেবই তাঁহার প্রাণধন। গুরুদেব ইহজগতে ও পরজগতে শিষ্যের নিত্যকালের পরমবন্ধু। তিনি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, নিখিল দেব-দেবী তাহার সহায়কারী। তিনি রুষ্ট হইলে শিষ্যের আর কোনও গতি নাই। হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু অসন্তুষ্ট হইলে শিষ্যের আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। তাই তিনি সর্ব্বতোভাবে গুরুর প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। গুরুদেবের নিকট হইতে তিনি ভজনের গূঢ়তম রহস্য ও অতি গোপনীয় তথ্য শ্রবণ ও আলোচনার সুযোগ লাভ করেন।

যে কৃপার দ্বারা উদ্ভাষিত হইয়া শিষ্য পারমার্থিক কল্যাণের শীর্ষস্থান লাভ করেন, গুরুদেবের সেই অপ্রাকৃত স্নেহ ও ঋণ কখনই পরিশোধ করা যায় না—ইহা বিশ্রম্ভ ঐকান্তিক শরণাগত সেবক তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃতই উপলব্ধি করেন। তাই সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের সুখবিধানের জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবে অর্পণ করিয়া তিনি 'গুরুর আমি'—'কৃষ্ণের আমি' হইয়া যান। ইহাই শিষ্যের শিষ্যত্ব। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

"সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটী প্রধান কার্য্য। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময়, পরীক্ষার স্থল; সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনে সহায়। সকলে মিলিয়া মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিভজন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপ-রঘুনাথের পাদপদ্ম-ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"

"ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্য-কৃষ্ণসেবাপর। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, ইহা বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণই কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভগবানের শাব্দিক অবতার। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল-বেদ, অখিল বেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী বা শাস্ত্রসম্রাট্। পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংসী সংহিতা বা সাত্বত-সংহিতা বলা হইত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে শম্যাপ্রাস-আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, সেই সময় হইতে 'ভাগবত'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হয় - শ্রীব্যাসের শম্যাপ্রাস-আশ্রমে। সেখানে শ্রোতা —শুকদেব এবং বক্তা—শ্রীব্যাসদেব। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথম শ্রীব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মা আবার শ্রীনারদকে বলেন ; শ্রীনারদ আবার শ্রীব্যাসকে বলেন। শ্রীব্যাস শ্রীশুককে বলেন। শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন।

মজঃফরপুর-জেলার অন্তর্গত শুকরতলে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। এই শুকরতলে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন হয়—গোমতী-তটস্থ নৈমিষারণ্যে। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীশুকদেব হস্তিনাপুরে গঙ্গাতটে বহু মহর্ষিগণের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎকে যখন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তখন সেই সভায় মহর্ষিগণমধ্যে রোম-হর্ষণপুত্র শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্ঠি-সহস্র ঋষিগণের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভাগবত যে গ্রন্থাকারে দেখিতে পাই, তাহা নৈমিষারণ্যে ভাগবত-কীর্ত্তনের তৃতীয় অধিবেশনের পর গ্রথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এক অত্যদ্ভুত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ আর জগতে নাই। ইহা কথার কথা নহে ;—অতিস্তুতি, মনঃকল্পনা বা গল্পের কথা নহে ; মানুষ যদি সত্য-সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হইবে না। সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা

এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও অনেকেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্-ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কোনপ্রকার হেয়তা নাই। ইহা সুনির্ম্মল, সুপক্ক, কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিল-রসামৃত-সিন্ধু কৃষ্ণ। মুক্তকুলই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত একায়ন-পদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ। একায়ন-পদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র সার্ব্বজনীন গ্রন্থ। ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইলে আর্য্যপুরুষদিগের (জীব-সাধারণের) কোনও ক্ষতি হয় না।"

শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য বস্তু। যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত জানা যায় না। ইহা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই গ্রাহ্য। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"The Bhagabat does not allow its followers to ask anything from God except eternal Love towards Him. The true follower of the Bhagabat is a spiritual man who has already cut his temporary connection with phenomenal nature and has made himself the inhabitant of that Region where God eternally exists and loves. This mighty work is founded upon inspiration and its superstructure is upon reflection. To the common reader it has no charms and is full of difficulty. We are, therfore, obliged to study it deeply through the assistance of such great commentators as Shridhar Swami and the Divine Chaitanya and His contemporary followers."

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানপ্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি ভগবৎকথাময়। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রবণ করিলে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধজীবের শোক-মোহ-ভয়নাশিনী সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রথমে মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃ-শ্লোকীরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে কেবলা ভক্তির কথাই আছে। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তা'তে বেদ-শাস্ত্র হইতে পরম-মহত্ত্ব॥

আমরা দেবী-ভাগবত নামে যে একটী পুস্তকের কথা শুনিতে পাই, তাহা আধুনিক পুঁথি ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পাল্লা দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ অনুকরণে এই পুঁথিটী রচিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে কোন অপস্বার্থপর মৎসর বিদ্বেষী অবৈষ্ণবের দ্বারা রচিত 'দেবী-ভাগবত' নামক পুঁথিটীকে অষ্টাদশ-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাত্বতপুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক পুঁথিকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অষ্টাদশপুরাণের নামোল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে সাত্ত্বিকপুরাণ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী তামসিকপুরাণ বলিয়া কথিত হয়।

কেহ কেহ মৎসরতা-মূলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবের রচিত বলিয়াও কল্পনা করেন। ইহা ভুল ধারণা। শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীব্যাসদেবেরই রচিত, ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবদবতার। ভাগবত-বিরোধী অদৈবকুল ব্যতিরেকভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা প্রচার করিবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় কালে কালে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বোপদেব কেশব কবিরাজের পুত্র ও ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র। ইনি বিক্রমাদিত্যের সভার অমরসিংহেরও পরবর্ত্তী। বোপদেব পাণিন্যাদি ব্যাকরণের নিয়মাধীন বলিয়া স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন, আর তিনি নিজেও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকা

করিতেন না। শ্রীধরস্বামি শ্রীব্যাস-প্রণীত গ্রন্থরাজিরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন ; তিনি সাধারণ অঋষি-প্রণীত পুঁথির টীকা করেন নাই। তিনি ভগবান্ বেদব্যাস রচিত বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতির টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব-রচিত মহাগ্রন্থ না হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়া যাইতেন না।

'ভাগবত' বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতই চিরপ্রসিদ্ধ। ভগবান্ বলিতে যেরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মা-শিব-গণেশ-শক্তি প্রসিদ্ধ নহেন, ভাগবত-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। 'ভাগবত' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই কেহ এই শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া আর কোন গ্রন্থ মনে করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রারম্ভ হইতে ১২শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের উক্তি। আর দেবী-ভাগবতের ৪৫।৪৬টী শ্লোকে মাত্র শ্রীব্যাস শ্রীশুকের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে বাদবাকী সমগ্র পুস্তক শ্রীব্যাস শ্রীজন্মেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন ; আর দেবীভাগবত শ্রীব্যাসদেব শ্রীজন্মেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া সাজান হইয়াছে। শ্রোতৃ-সম্বন্ধেও দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা এক পুরুষ নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি পদে পদে দেবীভাগবতের অনুকরণ-প্রবৃত্তি ধরা পড়িয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, সর্ব্ববেদসার, সর্ব্বঋষি ও আচার্য্যগণ-সেবিত, সর্ব্বশাস্ত্র-সম্রাট্ ; আর দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী আনুকরণিক আধুনিক গ্রন্থ।

দেবীভাগবতে ষষ্ঠী, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা আছে। ভাগবত-ধর্ম্মের কোথাও বা কোনও মহাপুরাণে ঐরূপ অবৈধ উপাসনার উল্লেখ নাই। সুতরাং দেবীভাগবত কখনও বেদসার হইতে পারে না। সর্ব্বদেশের পণ্ডিত ও সভ্যসমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ভারতীয় সর্ব্বভাষায় এবং পাশ্চাত্যদেশীয় বহুভাষায় বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অনুদিত ও প্রচারিত আছে। কিন্তু দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দেবীভাগবত যে একটী জাল পুঁথি, ইহা প্রতি পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে ভবিষ্যতে কোন ভাগবত-ধর্ম্ম-বিরোধী অপস্বার্থপর আনুকরণিকের দ্বারা কল্পিত অপর ভাগবত সৃষ্ট হইতে পারে, ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সুদূরদর্শিতায় পূর্ব্বেই তাহা দর্শন করিয়া পদ্মপুরাণে ভাগবত-মাহাত্ম্যে সকলকে সতর্ক করিয়াছেন,—

"অম্বরীষ শুক-প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।"

শ্রীধরস্বামিপাদও প্রথম শ্লোকের টীকায় সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন,—“অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্”—অর্থাৎ পদ্মপুরাণ-বচনে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রোক্ত ভাগবত উল্লিখিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থকে “ভাগবত” বলিয়া কখনও আশঙ্কা করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুরী

নবীননীরদকান্তি, শ্যামলবরণ।
পরিধানে সূক্ষ্ম চারু সুপীত বসন॥
গলে দোলে বনমালা অতি মনোহর।
শিরে শিখিপুচ্ছচূড়া মোহন সুন্দর॥
ধাতুরত্ন-প্রবালাদির অলঙ্কার পরি’।
বৃন্দাবনে বিহরণে নটবর হরি॥
মাধবের কর্ণযুগে শোভিছে উৎপল।
পড়িতেছে গণ্ডদেশে অলক চঞ্চল॥
অনুচরস্কন্ধে হস্ত করিয়া স্থাপন।
অন্য হাতে লীলাপদ্ম করে ঘূর্ণন॥
মুখপদ্মে মন্দস্মিত—হাস্যবিলসিত।
(কৃষ্ণ) রূপ হেরি’ বিপ্রপত্নী হইলা মোহিত॥
গোপকুল-রমণীর চিত্তবিমোদন।
নব নটবর বেষ করিয়া ধারণ॥
মুখামৃত পূর্ণ করি’ বাঁশরীর রন্ধ্র।
বৃন্দারণ্যে সমুদিত বৃন্দাবন চন্দ্র॥
শিরে তাঁ’র শিখিপুচ্ছমুকুট শোভন।
কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম ভূষণ॥
কনক-কপিশ-পীতবাস পরিহিত।
চারু-বৈজয়ন্তী-মালা কণ্ঠে বিলম্বিত॥
অপরূপ কৃষ্ণরূপ করিয়া দর্শন।
গোপীগণ প্রীতিভরে গায় কীর্ত্তিগণ॥

নিন্দা

দোষের অবর্ত্তমানে কাহারও উপর দোষারোপ করাকে 'নিন্দা' বলে। প্রশংসা বা সম্মানলাভের জন্য বিনা দোষে অপরের নিন্দা করা খল ও ক্রূর প্রকৃতির লোকের স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায়। নিন্দাকারী 'পাপী' বা 'অধার্ম্মিক'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নিন্দুক ব্যক্তি 'ঠোঁট কাটা কাকের' ন্যায় সকল বিষয়ে খুঁত ধরিয়া থাকে। কোন ভাল জিনিসই কখনও তাহার নজরে পড়ে না। অবোধ যেমন গোবধ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, তেমনি অধার্ম্মিক ব্যক্তি অপরের নিন্দা করিয়া শ্রেয়ঃপথ হারাইয়াও উল্লাস প্রকাশ করে। সারমেয়ের লাঙ্গুলে শতবার ঘি মালিশ করিলেও তাহা যেরূপ সোজা হয় না, বক্র থাকিয়াই যায়, তদ্রূপ নিন্দুক ব্যক্তিকে শত উপদেশ প্রদান করিলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, স্বভাব মন্দই থাকিয়া যায়। আমড়া গাছে আমড়াই ফলে, আম কখনও ফলে না।

বিশ্বের দর্শকসূত্রে স্ব-পর-ভেদ অবস্থিত। আত্মস্বার্থে অন্যের প্রকৃতি ও কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিৎ নহে। পার্থিব জগতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাবল্য এবং একের অন্যের উপর আধিপত্য থাকায় উচ্চাবচভাবে অনুপাদেয়তা ও হেয়তা প্রবেশ করিয়াছে। প্রশংসা ও নিন্দাসমূহ— প্রাকৃতগুণোত্থ অর্থাৎ বিশ্বের ধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সমাবেশ নাই বলিয়া তথায় নিন্দাদি হেয়ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। বিশ্বের কর্ম্মসমূহ অনিত্য-অজ্ঞতামিশ্র ও আনন্দবাধযুক্ত, উহা কদাপি আত্মবৃত্তি-শব্দে কথিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ-হেতু অভক্ত-কর্ম্মীর প্রশংসা বা নিন্দার নীতি তাহাকে উচ্চপদাসীন রাখিতে অসমর্থ হইয়া তাহার পতনের কারণ হয়।

ভগবদ্ভক্তগণ জগতে কাহারও নিন্দা করেন না। তাঁহারা স্ব-পর-ভেদ বিচার না করিয়া একত্র মিলিত হইয়া হরিকীর্ত্তন করেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণকালে নিন্দা-রহিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। নিন্দারহিত কৃষ্ণভক্তই সর্ব্বোত্তম আত্মম্ভরিতাবশতঃ নিজের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিতে গিয়া অপরের নিন্দা বা অসম্মান করিতে গেলে নিন্দুক ব্যক্তি অবশ্যই ভাগবত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন। সবার সম্মান রক্ষাই—ভাগবত-ধর্ম্মের নীতি। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১।৩১৩)

পরনিন্দুকের মুখে কখনও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতে পারে না। তাই মহাত্মা

তুলসীদাস বলিয়াছেন,—"যো মুহমে পর্ চুক্‌লি ওগারত, সে মুহমে হরিনাম লিয়া না লিয়া" অর্থাৎ "যে সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, তাহার মুখে প্রভুর নাম-সংকীর্ত্তন করা আর না করা একই কথা।" হরিভজন করিতে গেলে পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।" পরের নিন্দা করিয়া লাভ কিছুই হয় না. পাপের পাহাড় সৃষ্টি করা হয়। তাই মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ কখনও অপরের নিন্দা করেন না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৪৫)
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম—সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১২)

অবৈষ্ণবতা-পরিহারের উপদেশকে 'নিন্দা' বলা যাইবে না, তাহা 'সদুপদেশ' শব্দবাচ্য। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণভক্তিহীনতা নিবারণের জন্য জীবের প্রতি যে সদুপদেশ, তাহার সহিত যাহারা নিন্দুক ব্যক্তির নিন্দাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করে, তাহাদের কোনকালে মঙ্গল হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৪৫ পয়ারের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"মহা-ভাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিরই প্রশংসা করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তির নিন্দা করেন না। যে-সকল কপট দ্বিজিহ্ব শঠ অবৈষ্ণবতা-পরিহারকে 'নিন্দা' বলিয়া লোক প্রতারণা করে, তাহারা পাপে প্রমত্ত। 'জীবে দয়া' বলিয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাতে তাহাদের রুচি নাই। বিষ্ণুভক্তিহীনতা হইতে লোক-সমূহকে মুক্ত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করা পাপ। তাদৃশ পাপিগণ পক্ষান্তরে পাপের প্রশংসা করায় বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া ফেলে। সুতরাং সুকৃতিসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না। তাঁহারা পাপিষ্ঠ নহেন। যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলায়, তাহারা বৈষ্ণবব্রুব। সুতরাং মন্দভাগ্য ও পাপী।" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১২ পয়ারের অনুভাষ্যেও শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"অনিন্দনীয় বৈষ্ণবের প্রতি যে বিদ্বেষ করিয়া দোষের আরোপ করে, তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 'সর্ব্ব মহাগুণ-গণ বৈষ্ণব-শরীরে'—এই কথা বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল পাপমতিজন অবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের সমজ্ঞান করে, তাহাদের কোনদিন সুবিধা হয় না। অবৈষ্ণবা-চারের নিন্দা 'সদুপদেশ' শব্দবাচ্য। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত জীবের যাবতীয় অনুষ্ঠান

নিন্দাই। বিষ্ণুভক্তির ছলনায় পাপিষ্ঠগণ অনেক সময় নিন্দিত কর্ম্ম করে। সেইগুলি পরিহার করিবার উপদেশকে 'নিন্দা' বলা যাইবে না।"

বৈষ্ণবনিন্দা—ভয়ঙ্কর ও সর্ব্ব অশুভের আকর

সাধারণ দস্যুগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে প্রায়শ্চিত্ত কালাবধি ক্লেশভোগ করে, কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দাহেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায়। বৈষ্ণবাপরাধ সকলপ্রকার অপরাধের মধ্যে ভয়ঙ্কর। বৈষ্ণবনিন্দক পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরবে পতিত হয়। শাস্ত্রে ষড়্বিধ পতনের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

"যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণবের দর্শনে আনন্দিত না হয়—এই ছয়জনই অধঃপতিত হয়।" স্বয়ং শিবঠাকুরও যদি বৈষ্ণবনিন্দা করেন, তিনি অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হন। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৫৫-৫৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের শাস্তির কোন সীমা নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাক্য হইতে পাওয়া যায়,—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন ॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥

চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৪।৩৭৫-৩৭৭)

বৈষ্ণব-নিন্দকের মুখে কখনও 'কৃষ্ণনাম' কীর্ত্তিত হইতে পারে না। আবার ভগবান্‌ও তাহার পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ ॥
বিদ্যা-কুল-তপ —সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৬০-৩৬২)

যাহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহারা ভগবন্নামের ফল প্রেমলাভ ত' দূরের কথা, সংসার-বন্ধনই ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় না। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।১৪৮ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,— "সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবার মাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু নামাপরাধী সাধুনিন্দা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করে এবং পরনিন্দা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়। ক্রমে ভগবন্নিন্দা করিয়া ভগবন্নামের ফল প্রেমা লাভ করা দূরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া নামাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পর্য্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয়।" মহাভাগবতগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিলেও, তাঁহাদের পদরেণুসমূহ নিন্দুক ব্যক্তির তেজোনাশ করিয়া তাহার নিন্দার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্য্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥

(ভাঃ ৪।৪।১৩)

"যাঁহারা এই জড়দেহকে 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব

অসতের মহৎ-বিদ্বেষই শোভনীয়, কারণ তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ -মহাপরাধ ও ভক্তির বাধক

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণেঽপি দোষঃ।" (ভাঃ ১০।৭৪।৪০) অর্থাৎ কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারিগণ দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন, তাহারও অপরাধ হয়।" যাহারা সমন্বয়বাদের ছলনায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে, তাহারা অনেক অনেক জন্ম অধঃপাতে পতিত হয়। তাঁহাদের সকল সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।১৪৫)

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করামাত্র নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অসমর্থপক্ষে কর্ণে হস্ত দিয়া নিন্দাযুক্ত স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ॥

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব, সমর্থেন তু নিন্দক জিহ্বা ছেত্তব্যা, তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা)

"ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি সেই স্থান ত্যাগ না করেন, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়। সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থ পক্ষের বিধান মাত্র। সামর্থ্য থাকিলে নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য।" শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্ নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥ (ভাঃ ৪।৪।১৭)

"কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে, যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে

কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত— ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।”

বৈষ্ণব-নিন্দকের পরিত্রাণের উপায়

অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব নিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বন্দনা করিলে তাহার মঙ্গললাভ ঘটে। যেরূপ বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জরজর হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তুতির দ্বারাই দূরীভূত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধী এক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন,—

শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর’ তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর’ তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত-কবিত্ব বিপ্র! কর তুমি গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি, তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দ্য-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥

এ সকল পাপ ঘুচে—এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
চল দ্বিজ, কর' গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব পাপ-বিমোচন॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৪৯-৪৫৯)

শাস্ত্রের অন্যত্র পাওয়া যায়,—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৩৩)

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ??
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৮০)

মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষী—এই তিন শ্রেণীর প্রাপঞ্চিকপরায়ণ ব্যক্তি—বৈষ্ণব-নিন্দাকারী। তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণভক্তের নিন্দাকারী ইহজগতে ত্রিতাপ ভোগ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে মাত্র। বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বর্জ্জিত হইয়া প্রত্যেক জীবকে সম্মানপূর্ব্বক নিরপরাধে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাহার কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি মায়িক নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে পরিত্রাণ পান।—

কাহারে না করে নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
নিন্দায় নাহিক লাভ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান—ভাগবতধর্ম্ম হয়॥ (চৈতন্যভাগবত)

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

"আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না।"

"শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।"

—**শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ**

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মবন্ধমোক্ষায় বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

বাচ্চা শিশু যেমন তেতো ঔষধ খেতে চায় না, কিছু প্রলোভন দেখিয়ে তাকে তেতো ঔষধ খাওয়াতে হয়, তেমন আমরাও ঔষধ খেতে চাচ্ছি না। হাতে কিছু লাড্ডু নিয়ে বাচ্চাকে বলা হচ্ছে তুমি ঔষধটা খেয়ে ফেল, এই লাড্ডুটা দেব। এই লাড্ডুর প্রলোভন দেখিয়ে তাকে তেতো ঔষধ গলাধঃকরণ করানো হল। তদ্রূপ বেদ, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সাধন-ভজনে পারমার্থিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা হচ্ছে। কিন্তু যখন সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তখন সে কি কর্ম্ম করবে, তার উদ্দেশ্যটা কি? –তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে—ভগবৎপ্রীতি-কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। আগে তুমি কর্ম্ম আরম্ভ কর। মাষ্টার মশায় প্রথমমুখেই কোন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতে গেলে বলছেন—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" প্রথমে মুখস্থ করে যাও, পরে তোমার অর্থবোধ হবে। তুমি বড় হলে ক্রমশঃ সবটাই বুঝতে পারবে। শাস্ত্র ঠিক সেইরকম কিছু প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করছেন। তারপরে তুমি কিভাবে কর্ম্ম করবে তার **Process, Procedure** শিক্ষা দিচ্ছেন। গীতা-ভাগবতে সেই কথা বুঝানো আছে। কোন্ কর্ম্ম করব আমরা?—'তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ স্যাৎ।' সেই কর্ম্ম কর তুমি, যে কর্ম্মে ভগবান্ প্রীত হবেন, খুশী হবেন। গীতার মধ্যে সেই কথাই বলা হয়েছে। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় কর্ম্মাচরণ করতে হবে। আমি খাব, আমি থাকব, আমি পরব, আমি বাঁচব—এটা কর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। হে ভগবন্! তুমি খুশী হও, প্রীত হও, সন্তুষ্ট হও, তাহলে সবটা ঠিক আছে। এই ভাবটা শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীবেদব্যাস। – "কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥" সেই পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণের সেবা যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেটা হল ভক্তি। সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানিয়েছেন। শাস্ত্রে বহু কথা রয়েছে। শাস্ত্র কাকে বলা হয়েছে? শাস্ত্র হল শাসনবাণী। কার শাসনবাণী? —স্বয়ং শ্রীভগবানের। কাদের জন্য শাসনবাণী?—অখিল বিশ্বের জীবাত্মার জন্য। তার ভিতরে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আমাদের জন্য। আমাদেরই শিক্ষার জন্য শাস্ত্র প্রকাশিত ও প্রণীত হয়েছে। সমাজ কি করে চলবে, সমাজের লোক

কিভাবে নীতি-আদর্শ পালন করে জীবন-পথে অগ্রসর হবে—সেই শিক্ষা দেওয়া আছে শাস্ত্রে। ভারতবর্ষে বাস করি আমরা। **Indian Constitution**—ভারতীয় সংবিধান মানি আমরা। কেন মানি?—ওটা মানলে পরে আইনের সুযোগ-সুবিধাগুলি পাই আমরা, সেজন্য মানি। শাস্ত্র হল **Spiritual Constitution**—পারমার্থিক সংবিধান। এটা মানলে পরে আমার আত্মকল্যাণ লাভের সুবিধা হবে। আমার পরিচয় প্রদান—অস্তিত্ব প্রমাণের সুযোগ আছে। পূর্ব্বেই আলোচনা হয়েছে,—'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥" আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদও বলেছেন—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"—"কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে? কিবা কাজ করে গেলে পাবে কি সুখ জীবনে??" প্রতিটি মানুষের জীবনে এই প্রশ্ন থাকবে এবং থাকার প্রয়োজন আছে এবং এর সমাধানও আবশ্যক। শাস্ত্রের মধ্যেই এর সদুত্তর রয়েছে।

এই যে কলিযুগ, এটা হল অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগ—বৈবস্বত মন্বন্তরের। "একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।" এক একজন মনুর রাজত্বকাল ৭১ চতুর্যুগ। "চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥" বর্ত্তমানে সপ্তম বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল চলছে। তাঁরই রাজত্বকালের ৭১ চতুর্যুগের মধ্যে ২৮শ চতুর্যুগের অন্তর্গত এই কলিযুগ। শাস্ত্রে এসব ব্যাখ্যা করেছেন। জীবকল্যাণের জন্য সকল ব্যবস্থাই যুগোপযোগী করে দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে। কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে বলছেন,—যুগোপযোগী করে আপনাদের প্রচার করা দরকার। যুগোপযোগী করে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। যুগোপযোগী করে আমরা প্রচার করব কি-প্রকারে? সে ক্ষমতা কি ভগবান্ আমাদের দিয়েছেন? আমি বলব,—শাস্ত্রেই যুগোপযোগী করে সব ব্যবস্থাগুলো দেওয়া আছে।

সত্যযুগের লোক কিভাবে সাধনা করবেন, সেটা ভাগবত-শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। ত্রেতাযুগের, দ্বাপরযুগের, কলিযুগের লোক কিভাবে সাধনা করবেন, সেটাও শাস্ত্রে বলা আছে, বুঝানো আছে। সুতরাং পৃথগ্‌ভাবে যুগোপযোগী করে আমাদের বলবার কিছুই নাই। আমার শ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় পূর্ব্বেই বলেছেন কথাটা—এই কলিকালে অল্পায়ু, অন্নগতপ্রাণ আমরা। সেইজন্য শাস্ত্রে সহজ-সরল করে ব্যবস্থা দিয়েছেন।—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অন্য যুগের ন্যায় কলিকালে তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, যজ্ঞ ইত্যাদি আবাহনের ক্লেশস্বীকারের কথা নাই। তাহলে যুগোপযোগী করেই ত' ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। সনাতন-ধর্ম্মের ধারক-বাহকরূপে প্রথমদিকে যদি হিসাব করা যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বাদ দিয়ে, যিনি বেদবিভাগ করেছেন সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস হলেন সনাতন ধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা। তিনিই সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে বিবৃত করেছেন। তাঁর পরবর্ত্তিকালে অন্যান্য মুনি-ঋষিগণ সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন করেছেন, নিজেদের জীবনে আচরণ করেছেন এবং তাঁদের যে উপলব্ধ সত্য সেটা জগৎকে জানিয়েছেন, পুনরায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা মানে মূল **Authentic** গ্রন্থের উপরে টীকা-ভাষ্য ইত্যাদি রচনা করেছেন।

সৎ সম্প্রদায়ের কথা একটু আগে বলা হয়েছে। 'সম্প্রদায়'-শব্দটা খুব খারাপ নয়। আজকাল 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটা বলে যে একটা **Sectarian thought** আমাদের ভিতরে **grow up** করছে, সেটা খুব খারাপ কথা। সাম্প্রদায়িক-শব্দ বলে একটা **grouping**-এর কথা বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মযাজনকারী ব্যক্তিগণ, আমার মুনিঋষিগণ যে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, সেটা হল অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। তার ভিতরে **Neutrality**—নিরপেক্ষতা পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত আছে, সত্যনিষ্ঠা আছে। 'সম্প্রদায়'-অর্থে সেইটা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা। কলিকালে সেই সনাতন ধর্ম্মের ধারক-বাহক হয়ে চারজন বৈষ্ণব-আচার্য্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। এটা সনাতন শাস্ত্রেই উল্লিখিত হয়েছে। এর অন্য কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার উপায় নাই। যেখানে বলছেন, "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" যদি কোন মন্ত্র জপ করতে হয়, তাহলে চার সম্প্রদায়ের কোন একটীর অধীন ও অনুগত হয়ে করতে হবে। তা না হলে মন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না। তাই বলছেন,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥"

চার সম্প্রদায়ের কথা বলছেন। কি চার সম্প্রদায়ের কথা?—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

শ্রী-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায় ও সনক-সম্প্রদায়—এই চার সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মন্ত্র যদি জপ করতে হয় তাহলে তাকে এই চার সম্প্রদায়ের কোনটীর অন্তর্গত হয়ে করতে হবে। তবে তার মন্ত্রসিদ্ধি হবে। যদি বলা যায়, এটা **Sectarian** কথা, তা হবে না। কারণ **Channel, Process, Procedure** শাস্ত্রে জানিয়েছেন। সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণই এটা মানেন। এ সম্বন্ধে ত' কোন মতভেদ থাকা উচিত নয়।

গতকাল একজন প্রশ্ন করছিলেন, পঞ্চোপাসনা এল কোথা থেকে? আমি বললাম,—সনাতন ধর্মতত্ত্ব হল একেশ্বরবাদ। তাহলে পঞ্চোপাসনা পরবর্ত্তিকালে সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে সৃষ্ট হয়েছে, তার সার্থকতা কি? এ নিয়ে শাস্ত্রে আলোচনা আছে। তত্ত্বদর্শন হল পরমপুরুষ, উপাস্যবস্তু হলেন অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। তিনি শক্তি নহেন, স্ত্রী নহেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ভগবান্ হলেন পরম-উপাস্য। শাস্ত্রে এসব উপদিষ্ট হয়েছে। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'— একথা বলা হয়েছে বেদান্ত দর্শনে। উপাস্যতত্ত্ব হচ্ছেন শক্তিমান্ তত্ত্ব। পুরুষ, পরমপুরুষ, লীলাপুরুষোত্তম—কথাগুলো বুঝানো হয়েছে বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে। পুরুষোত্তমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপনিষদে। গীতা-ভাগবতের মধ্যেও এর ব্যাখ্যা রয়েছে। উপনিষদে কি বলছেন?—

ক্ষরক্ষরাভ্যাম্ পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরংতত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণম্॥

যিনি ক্ষর-অক্ষর-উভয় তত্ত্ব হতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। চৈতন্যাখ্য পরতত্ত্বই সর্ব্বকারণকারণ, মূলাধার।

কে ক্ষর, কে অক্ষর? গীতার মধ্যে আছে,—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-গোষ্ঠী

[শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন (মথুরা), উঃ প্রঃ]

শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে গত ২৭।৫।৯২ তারিখ হইতে ৩।৬।৯২ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজের শুভ অনুকম্পায় অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হরিসঙ্কীর্ত্তন মাধ্যমে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে যমুনায় পূজনাদি স্তব-স্তুতিপাঠ-সহকারে যমুনার কৃপাপ্রার্থনা-পূর্ব্বক শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীল মহারাজসহ ভক্তগণ উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আরতিসহ ছত্রধারণ, চামর-ব্যজনাদির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ

মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নগর-সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীগুরু-পরম্পরার পূজা এবং আরতিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে বিশেষ সুসজ্জিত ব্যাসাসনে স্থাপন করা হয়।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ হইতে বিশেষরূপে বর্ণন করেন তৎপশ্চাৎ শ্রীমান শুভানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতের ধারাবাহিকরূপে ব্যাখ্যা শুভারম্ভ করেন। তিনি প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত যথাবিধি সুন্দররূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজও সর্ব্বক্ষণ ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাঠের বিষয়বস্তু, সিদ্ধান্ত-রহস্যাদি অত্যন্ত সরলতার সহিত বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দিল্লী, মথুরা, ভরতপুর এবং বোম্বাই হইতে বহু ভক্ত এবং বিদ্বজ্জনগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নয়দিন ধরিয়া এই শুভানুষ্ঠানের কার্য্যক্রম ভক্তিময় পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিবসে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা এবং মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐদিন অপরাহ্নে বিশেষ সভানুষ্ঠানে শ্রীবৃন্দাবন এবং মথুরার শ্রীগৌড়ীয় ও বল্লভ-সম্প্রদায়ের বিদ্বদ্ভক্ত-বৈষ্ণবগণ সভাস্থল অলঙ্কৃত করেন। বোম্বাইসহর-নিবাসী শ্রীবদ্রীপ্রসাদ খাণ্ডোয়াল সপরিবার বিশিষ্ট বিদ্বদ্ ভক্তবৃন্দকে বিশেষরূপে সম্মানিত করেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের রসপূর্ণ বিচার অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আলোচনার দ্বারা শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে উল্লাসিত করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং রসস্বরূপ। কেবল রসস্বরূপ তাহাই নহে, 'ভাঃ' অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীর কান্তিদ্বারা সমুদ্ভাসিত, ইহা 'তেজোবারিমৃদাং' অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীর তেজ উর্জ্জাশক্তিদ্বারা প্রকাশিত। সেইজন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'উর্জ্জা' বা তেজ সাধক-সাধিকার হৃদয়ে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের রসসমুদ্রে অবগাহন সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবত রসস্বরূপ বটে। পরন্তু পরম রস-স্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর আশ্রয়গত ভাবের দ্বারা ইহা আরও সম্বর্দ্ধিত। সেইজন্য রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'পিবত' বলা হইয়াছে। শ্রবণের কথা না বলিয়া পানের কথা বলা আছে। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥" (ভাঃ ১।১।৩ —শ্রীমদ্ভাগবত অমৃতদ্রবময় রসস্বরূপ।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহার গুণ-মহিমা গান করিয়াছেন এবং সর্ব্বারাধ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বয়জ্ঞান

পরতত্ত্ব, তিনিই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যে কথা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছেন,—"কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ"— অর্থাৎ সেই মুকুন্দ বিনা ভগবৎ-শব্দবাচ্য আর কে হইতে পারেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার লীলা-মহিমা চরম সীমায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি নিজ প্রিয় ভক্তগণের উপাস্যতত্ত্ব না হইয়া তাঁহাদের উপাসক হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পারবশ্যতার পূর্ণতম লীলা ইহাতে প্রকট হইয়াছে।

ভগবান্ ভক্তের ভক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে গিয়া জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, তপস্বী সকলকে একাধারে পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"অহং ভক্তাপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৩ — স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ ভক্ত-পরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ ভগবানের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদের নিকট পরাধীনের ন্যায় লীলা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটী লীলায় মধ্য দিয়া তাঁহার ভক্তবশ্যতার চমৎকারিতা প্রকাশিত। ভক্তগণের প্রীতির তারতম্য অনুসারে ভগবানের বশ্যতার তারতম্য।

দশমস্কন্ধে দেখা যায়, ব্রজবাসিগণের প্রেম-স্নেহ-প্রণয়াদির দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপভাবে বশীভূত। যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য যে কৃষ্ণ মাতা যশোদা তাঁহাকে দামদ্বারা বন্ধন করিতেছেন। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি নিয়ত যাঁহাকে স্তব-স্তুতি করিতেছেন, মহাকাল যমাদি যাঁহার ভয়ে ভীত, সেই প্রভু মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, মাতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য লালায়িত। পরম ব্রহ্মের এইসব সাধারণ বালকবৎ লীলা দর্শন করিয়া "মুহ্যন্তি সূরয়" দেবতাগণ, এমনকি মুক্তপুরুষগণও মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চপ্রাণস্বরূপ রাসপঞ্চাধ্যায়—সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান। কোন বিশেষ সভায় সভাপতি এবং প্রধান অতিথির প্রতি বিশেষ মান্যতা প্রদর্শন করা হয় তদ্রূপ রাস-মহোৎসবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষ সম্মাননীয়া, মাননীয়া এবং আদরনীয়া। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের করুণাপ্রার্থী হইলেন। গোপীগণ কোনরূপ মান করিয়া উৎসব ত্যাগ না করেন তাই তিনি তাঁহাদের কণ্ঠদেশ স্বয়ং ভুজদ্বারা ধারণ করিয়া কৃপাশীস প্রার্থনা করিতেছেন—"রাসোৎসবেহস্য ভুজ-দণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্ ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীঃ ৪।১১) শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন, "ন পারয়েহং।" শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হইতেছেন চিরকালের জন্য। গোপীগণের স্বসুখ-

বাসনার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের একমাত্র বাসনা কৃষ্ণের সুখ। শ্রীকৃষ্ণ যদি এই বাসনা পূর্ণ করেন তাহাতে তাঁহার নিজের লাভ হয়, কিন্তু গোপীদের কিছু দেওয়া হয় না, আর গোপীগণ 'দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাদি' পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ একনিষ্ঠ, আর শ্রীকৃষ্ণ বহুনিষ্ঠ। তিনি এক ভক্তের জন্য অন্য ভক্তকে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাই গোপীদের অনুরূপ ভজনে অক্ষম ব্রহ্মা, দেবতাদির ন্যায় আয়ু প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধে অক্ষম। অতএব তিনি প্রার্থনা করিতেছেন — আপন সাধুকৃত্যদ্বারা আপনারা আপনি সন্তুষ্ট হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের পরিকর, সাধক, সিদ্ধভক্তরূপে যে-সমস্ত পাত্র-পাত্রীর কথা বলা আছে, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসত্তম সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, কৃষ্ণের সখা মন্ত্রণাদাতা প্রিয় উদ্ধব মহাশয় গোপীগণের প্রেমরূপ উচ্চ শিখরদেশ দর্শন করিয়া বিস্ময়ে লজ্জায় মস্তক অবনত করেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বোৎকর্ষ মাহাত্ম্য বর্ণন করেন,—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮) গোবিন্দে ব্রজগোপীগণের যে মহাভাবাখ্য প্রেম তাহাতে তাঁহাদের জন্ম সার্থক। তাঁহাদের প্রেম-মহিমা কীর্ত্তনমুখে শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন,— 'মুমুক্ষু, মুনিগণ এবং মাদৃশজন এইরূপ প্রেম প্রার্থনা করি।' ভগবানের কথায় রুচিহীন ব্যক্তির নিন্দা করিয়া শ্রীউদ্ধব আরও বলিতেছেন,—'অসংখ্যবার যদি ব্রহ্মজন্ম লাভ হয়, আর গোপীগণের প্রেম-মহিমা এবং ভগবানের রস-কথায় রুচি না হয়, তবে তাহার জন্ম বৃথা।'

শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজে প্রেরিত হন, বিরহাতুর গোপীগণকে সান্ত্বনা এবং সন্দেশ দিবার জন্য; কিন্তু গোপীগণের প্রেমের বিরহ-অবস্থা দর্শন করিয়া বুদ্ধিহীনের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান। বিশেষ করিয়া মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণীর মাদনাখ্য চিত্রজল্পাদি মহাভাব দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত—চমৎকৃত হন। জ্ঞানাভিমানী উদ্ধবের জ্ঞানরূপ গাঠরি ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়। অতি সাবধানে দীনতা এবং আর্ত্তি-সহকারে প্রার্থনা করিলেন, —"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩) শ্রীউদ্ধব মহাশয় আরও বলিলেন,—"বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।২৭) বিরহদশায় ঈদৃশ ভগবৎপ্রেম-সুখ প্রদর্শন-দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।"

অতএব বিচারপূর্ব্বক দেখিলে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহিমা সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-মথুরা-দ্বারকা-ইন্দ্রপ্রস্থাদি স্থানে যে-সমস্ত ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের সকলেরই চরম অন্তিম লালসা—"বয়ম্ শ্রীমদ্ পাদরজঃ কাময়ে *** বোঢুং গদাভৃত॥"

আমরা সকলেই সেই শ্রীমতী রাধিকার চরণধূলি প্রার্থনা করি—যাঁহার কুঙ্কুম, আল্‌তা স্বয়ং শ্যামসুন্দর নিজ বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ধারণ করিয়া রসিকশেখর হইলেন এবং 'গন্থতে অনয়া বংশীনা'—যিনি বংশীধারী হইলেন।

প্রেমের পরাকাষ্ঠাময়ী পরম করুণাময়ী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী লীলাপুরুষোত্তম শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত নিরন্তর জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং আমাদের প্রতি কৃপাশীস বর্ষণ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—**শ্রীযুক্তা উমারাণী দেবী**

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উত্তরবঙ্গীয় প্রচারকেন্দ্রের অন্যতম শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে এবং শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে গত ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৯৯ (ইং ৯।৮।৯২), রবিবার হইতে ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৯৯ (ইং ১৩।৮।৯২), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্ব্ব হইতে ঝুলনযাত্রা মহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। "পূর্ব্বাচল ভারত দর্পণ"-নামক হিন্দী দৈনিক পত্রিকার ৮।৮।৯২, ১২।৮।৯২ ও ১৩।৮।৯২ তারিখের সংখ্যায় এই উৎসবের সংবাদ ও বিবরণ প্রচারিত হয়।

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসবের পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচারিগণ মঠের প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে বিভিন্ন স্টলে ভগবল্লীলার প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীগুলি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে এমনভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল যে প্রদর্শনী দর্শন করিতে প্রত্যহ বহু জনসমাগম হইত।

২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৯২), রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরজীউকে হিন্দোলায় আরোহণ করান। তৎপরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়

প্রদর্শনীর আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক সভার শুভ উদ্বোধন করেন। এই পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট সনাতন-ধর্ম্মের দার্শনিক বিষয়ের বিভিন্ন দিক্ লইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের সেক্রেটারী Dr. P. K. Chatterjee (Neurologist), শিলিগুড়ি কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রলয়কুমার মজুমদার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ঘোষ মহোদয় উক্ত ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথি-হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারী (হিন্দীভাষী) প্রমুখ বক্তৃগণ বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত কংস বণিক (প্রধান শিক্ষক, Silver Bell English Medium School), শিলিগুড়ির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীনন্দদুলাল দাঁ ও শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী (সেক্রেটারী, মাল্লাগুড়ি সুপার মার্কেট) মহোদয় প্রায় প্রত্যহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বক্তৃতান্তে প্রত্যহ স্থানীয় হিন্দী ও বাংলা ভাষাভাষী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন ধর্ম্মমূলক শিক্ষণীয় নাটক, নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দও 'শ্রীসাক্ষিগোপাল' এবং 'শ্রীনীলমাধব' নাটক অভিনয় করিয়া দর্শক-বৃন্দকে আনন্দদান করেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় তত্ত্বোপদেশদ্বারা শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে শ্রীল গুরু-মহারাজ কৃতি বালক-বালিকাগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পঞ্চদিবসব্যাপী এই মহোৎসবে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য-সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসায়। শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারীজী এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (মঠরক্ষক), শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীরমেশকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমনোহরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ব্রজবাসীর (পূর্ব্বনাম শ্রীঅহিভূষণ বোস, শিক্ষক, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল) প্রভৃতির সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

এই শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

—**নিজস্ব সংবাদ**

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২৪শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

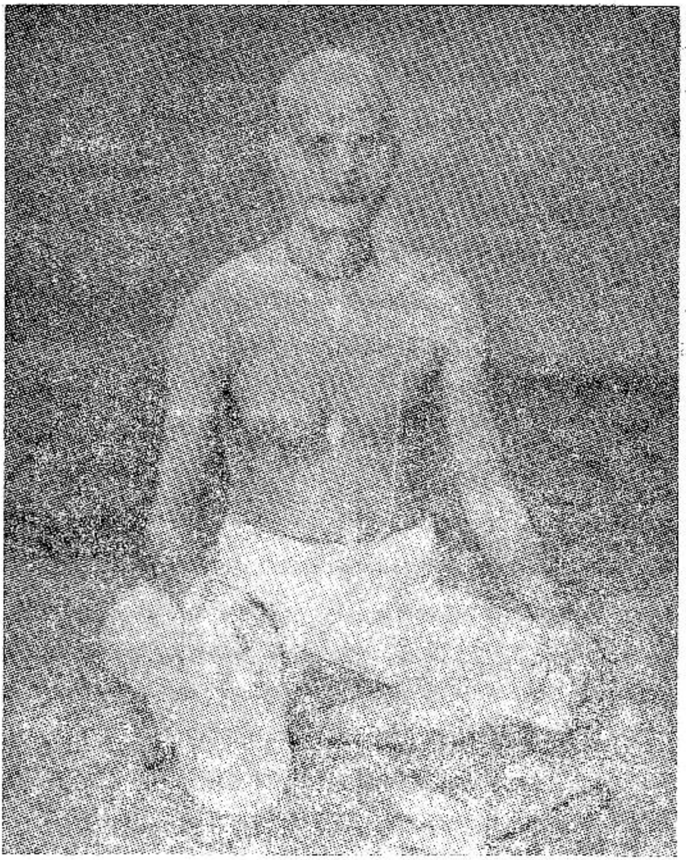

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৫ পদ্মনাভ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ২৪শে আশ্বিন '৯৯ (১১।১০।৯২) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীসগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৪শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপা-প্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২৪শে আশ্বিন (ইং ১১।১০।৯২), রবিবার —

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে —৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরন করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ) —এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকা ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৪শ বর্ষ | ৬ দামোদর, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ আশ্বিন, শনিবার, ১৩৯৯, ইং ১৭/১০/৯২ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

গোবিন্দাস্যোত্তংসিত-বংশী-কণিতোদ্য-
ল্লাসোৎকণ্ঠা মত্ত-ময়ূরব্রজ-বীত ।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গ-তরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অধর-শোভিত মুরলী-ধ্বনি শ্রবণে নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণদ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালাদ্বারা তোমার অঙ্গে অভিনব হরিত-তৃণ-লতা অঙ্কুরিত হইয়াছে; হে শৈলরাজ গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ১ ॥

যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিত-ধীভির্ব্রজদেবী-
বৃন্দৈর্বর্য্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্যম্ ।
চিত্রৈর্যুঞ্জন্ স দ্যুতিপুঞ্জৈরখিলাশাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদিত উৎকর্ষ-প্রযুক্ত বিস্ময়াপন্ন গোপীগণ যাঁহাকে **'হরিদাস-বর্য্য'** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণের চন্দ্রকান্তাদি মণিগণের কান্তিদ্বারা যাঁহার তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥ ২ ॥

বিন্দন্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্ ।
বৈদূর্য্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৩ ॥

তুমি মন্দির-তুল্য কন্দরসমূহ, চন্দ্রবন্ধু কুমুদ-মৃণালাদির ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্বাদু কন্দমূল এবং বৈদূর্য্যতুল্য স্বচ্ছ নির্ঝ'র-বারিধারাদ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছ ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অভীষ্ট পূরণ কর ॥ ৩ ॥

শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতি-মেধ্যৈঃ
প্রেম্ণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো ।
নিত্যাক্রন্দৎ কন্দর-বেণুধ্বনি-হর্ষাৎ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৪ ॥

জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের ভূষণ-ব্যাপারে বিশুদ্ধ প্রেমপ্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা তোমার সানু-দেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দবশতঃ তোমার কন্দরসকল সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাসনা সফল কর ॥ ৪ ॥

প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা ।
সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুর-ধর্ম্মা সুরভীণাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৫ ॥

তোমার গণ্ডশৈলশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর উপবেশনবশতঃ সাতিশয় শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো-গণের পালন-জন্য তাহাদের বন্ধু হইয়াছ ; সুতরাং তোমার পালন-ধর্ম্ম বিশেষভাবে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; হে শৈলপতে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥ ৫ ॥

নির্দ্ধুন্বানঃ সংহৃতি-হেতুং ঘনবৃন্দং
জিত্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিতবাধম্ ।
স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৬ ॥

সংহার-নিমিত্ত জগদ্বিপ্লবকারী জলদ-সমূহের প্রেরক ও সর্ব্বত্র বিজয়ী জম্ভারাতি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক তুমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ পর্ব্বতসমূহের শত্রু বিনাশ করিয়াছ ; হে ইন্দ্রবিজয়িন্ গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজ-দণ্ডোপরি ভর্ত্তু-
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৭ ॥

তুমি কৃষ্ণের ভুজদণ্ডোপরি ছত্ররূপে অবস্থান করিয়া স্বকীয় 'গিরিরাজ'—এই নামের সার্থকতা করিয়াছ এবং তোমার যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর ॥ ৭ ॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলা-বান্ধব-কুঞ্জে
ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণ-হারৈঃ প্রযতাঙ্গ ।
রাসক্রীড়া-মণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৮ ॥

তুমি গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী, তোমার অঙ্গ নিকুঞ্জ-নিপতিত শ্রীরাধিকার কঙ্কণ ও মাল্যদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, এবং তোমার উপত্যকা-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় মণ্ডিত ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ কর ॥ ৮ ॥

অদ্রিশ্রেণী-শেখর পদ্যাষ্টকমেতৎ
কৃষ্ণাম্ভোদপ্রেষ্ঠ পঠেদযস্তব দেহী ।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমমন্দং
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥ ৯ ॥

হে গিরিরাজ ! হে গোবর্দ্ধন ! যিনি তোমার এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর তাঁহার নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর]

৬৫। শ্রীভক্তিবিনোদের সময় শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপ আদৃত হইয়াছিল ?

"কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম ধর্ম্ম পুনরায় বিপ্লুত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন, বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য (?) প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। একদিকে 'এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব ; আবার বাউল-সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্দ্দশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।"

— ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতের কিরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতের একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরবন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থার প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের এরূপ শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্মসংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্রন্থ হইয়া নিজ-নিজ

ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।" —'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৬৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর কাহারা শুদ্ধভক্তির উৎসাদন চেষ্টা করিয়াছিল ?

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় স্মার্ত্ত-কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, তৎপক্ষে সহায়তা করিবার ছলে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। **শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে 'ব্রাহ্মণ'** করিবার চেষ্টা, **শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'শূদ্র'** বা **'ব্রাহ্মণ' বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস,** ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপন নিতান্ত **অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ**। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এই সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৬৮। অবতারের অপ্রকট-লীলার পর বঞ্চনার উদয়ে ভজন-প্রয়াসীর কর্ত্তব্য কি ?

"অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল **বঞ্চনা** জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন প্রয়াসীর সতর্ক হওয়াও ভজনাঙ্গ।" —আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬৯। কলির দাস কে ?

"কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৭০। অনেকেই বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন কেন ?

"কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৭১। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে কি কোন প্রকার প্রকৃতি-সঙ্গের সমর্থন আছে ?

"ছোট হরিদাস স্বয়ং প্রকৃতি হইয়া পুরুষভাবে অপর প্রকৃতির সম্ভাষণ-অপরাধে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ধূর্ত্ত লোকেরা "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ"—এই পদ্যের দুষ্ট অর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পন্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ

কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।" —'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৫।৬

শ্রীগৌরসুন্দর ও তন্মহিমা

১। অন্যান্য লোক-শিক্ষক হইতে শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্নসহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন—এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্ত্য-গুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম-মধু পান করিতে থাকুন।"

— তঃ সূঃ ৪৯ সূঃ

২। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে, না শ্রীচৈতন্য অগ্রে ?

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন,—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। কৃষ্ণ ও গৌর কি পৃথক্ তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে ?

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ।" —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। গৌরাবতার প্রচ্ছন্ন কেন ?

"কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদির দ্বারা পরম দুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়।" — রঃ ভাঃ ৪।৮

৫। অর্চ্চন ও ভজনমার্গে যথাক্রমে গৌরাঙ্গের যুগল কি কি ?

"গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অন্য প্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৬। শ্রীগৌর কি 'নাগর' নহেন ?

"প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া **তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।"** —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৭। গৌরানুগ না হইয়া কৃষ্ণভজন ও গৌরানুগ হইয়া কৃষ্ণভজনে পার্থক্য কি?

"গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥" —নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৮। শ্রীগৌরানুগ না হইলে যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন সুষ্ঠু না হয়, তবে কি পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভজন হয় নাই?

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-দেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি **তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"** —'গৌরকৃষ্ণ অভেদ', সঃ তোঃ ১১।৬

৯। কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর অথবা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন উৎপাত কেন?

"দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। **কৃষ্ণ-লীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায়** সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলার ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। **কৃষ্ণত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না।** গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণস্মরণ

করিব না'—এ কথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।"

— 'গৌর-কৃষ্ণ অভেদ', সঃ তোঃ ১১।৬

শ্রীগৌরশক্তি ও অপ্রাকৃত রস-বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি কিরূপ ?

"লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য-প্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ১৪।৬৪

২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি তত্ত্ব ?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন না করিলে ক্ষতি কি ?

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত (গৌরভক্ত) বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না।" — 'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৪

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যাঁহারা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের লক্ষণ কিরূপ ?

"যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত দলাদলি। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের যেরূপ সরস্বতীর সহিত দলাদলি, ভক্তিশূন্য বৈষ্ণবনামাভিমানী ব্যক্তিদিগেরও সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৪।৪

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

এই মনুষ্য-জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্ল্লভ; কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথাকার্য্যে সময় নষ্ট না করে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত,—

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

অনেক জন্ম পর এই মানব-জন্ম লাভ হয়েছে, আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্ল্লভ। —শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ। এইজন্য অনিত্য হলেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করবেন।

চরম মঙ্গললাভ করতে হলে সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করতে হবে—যে গুরুদেব আমাকে প্রেয়ের কথা না বলে যাতে করে আমার নিত্যশ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তারই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা বলবার গুরুর অভাব জগতে নেই—রোগী আমি, আমার রুচি যে দিকে সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলে কথাই দুনিয়া-শুদ্ধ সব লোক বলছে, কিন্তু যিনি আমাকে ওভাবে হিংসা করতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরমবান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অনভিপ্সু আমাকে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার ঠোঁট দুটী ফাঁক করে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল করে ছাড়েন। ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরু-দেবের কাছে শরণাগত - তাঁর কাছে যা কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হতে বলেছেন,—তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। অতএব জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সেইরূপ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করবেন।

যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা করবে না, সেই মুহূর্ত্তে ভোগ এসে গ্রাস করবে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা করবার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁর ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্র-বুদ্ধিহেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁর প্রতি পেছন দিয়ে দিই, তাহলে পতিতই থাকলাম্—ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হয়ে অন্ধকূপেই পড়ে রইলাম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হতে ওঠাতে আসেন। যাঁরা তার কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁরাই মঙ্গল লাভ করতে পারেন—পরাশান্তির ধামে যেতে পারেন।

প্রমাণ ও প্রমেয়

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মই পরম মুখ্যা বৃত্তিকে নিখিল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে শ্রুতির প্রমাণ-দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে আম্নায়বাক্যই 'প্রমাণ', সেই প্রমাণের দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী প্রমেয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রমেয় — (১) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, (৩) তিনি অখিল রসামৃত-সমুদ্র, (৪) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশতত্ত্ব, (৫) তটস্থ গঠনবশতঃ জীব-সকল বদ্ধদশায় প্রকৃতিকর্ত্তৃক কবলিত, (৬) তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, (৮) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন ও ৯) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

আম্নায়-বাক্যের মূল প্রমাণত্ব

আম্নায়-বাক্যই যে মূল প্রমাণ এবং ব্রহ্ম-সম্প্রদায় (যাহা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে জগতে প্রকাশিত) হইতেই যে সনাতনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

(মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদাথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥

(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে পরম মুখ্যবৃত্তিযোগে শ্রুতিপ্রমাণ—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

(শ্রীগোপালোপনিষদ, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র)

"কৃষ্ণায় দেবকীনন্দায়" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৭ সংখ্যাধৃত সামোপনিষদ্ বাক্য)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ-নিহিতং গুহায়াম্। পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণাবিপশ্চিতা ॥" (তৈত্তিরীয় ২।১)

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" (বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়)

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন (২।২।৯),—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। এতস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ইত্যাদি।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নি-রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমন একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই প্রতিবিম্ব বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্বস্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণুস্থানীয়। (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করতে করতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

"শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৭ পৃষ্ঠার পর]

জীবের স্থূলদেহের জন্মদাতা 'পিতা' হইতে সূক্ষ্মদেহের জনক সংস্কারপ্রদাতা 'আচার্য্য' শ্রেষ্ঠ, এবং আচার্য্য হইতে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রীগুরুদেব' শ্রেষ্ঠ। পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড এবং গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। শৌক্র, সাবিত্র্য-জন্মের পর তৃতীয় দৈক্ষ্য-জন্মে তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব সদ্গুরুর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যিনি (সম্বন্ধজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানরূপ) জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। যাঁহার কৃপায় মূকও বাচালত্ব লাভ করে এবং পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, সেই দীনতারণ গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি। যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কারী, যাঁহার অপার করুণায় নামশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র, সপার্ষদ শচীনন্দন, ধামসহ শ্রীরাধা-মাধবের সেবা-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই মাধবাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত হইতেছি।

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, **কৃষ্ণপ্রাপ্তি** হয় যাঁহা হ'তে॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, **দিব্যজ্ঞান** হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, **অবিদ্যা বিনাশ** যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

(ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম)

যাহা প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, অনুমানের দ্বারা যাহা লাভ হয় না, গুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে সেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের সন্ধান দান করেন। তিনি শিষ্যকে নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূল সংসার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করাইয়া বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবজ্‌জ্ঞান—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

গুরুদেব অনিত্য বস্তু নহেন। তিনি নিত্যসেবা-বিগ্রহ, করুণাময় পতিত-পাবন-মূর্ত্তি। গুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি নিত্যবস্তু। গুরুদেব নিত্য, তাঁহার সেবক

নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য—"নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।" তিনি আশ্রিতজন-বৎসল। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবককে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

গুরুদেব শিষ্যের প্রতি অপার করুণাময়, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ—সর্ব্বমূলাধার ভগবানকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বসদ্গুণ-বিশিষ্ট, নিখিল জীবের কল্যাণকামী, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, শিষ্যের সকলপ্রকার সংশয়ছেদনে সমর্থ এবং সতত ভগবৎসেবানিষ্ঠ ; এইজন্য তিনিই প্রকৃত 'গুরু' পদবাচ্য।

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয়-সচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫)

শ্রীগুরু পাঁচ প্রকার,—বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু, শ্রবণ-গুরু, ভজন-গুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু—যিনি ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে সদ্গুরু-পাদপদ্মে পৌছাইয়া দেন। শ্রবণ-গুরু অনেক স্থলে ভজন-শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও আগমশাস্ত্র-কুশল বৈষ্ণব-গুরুই উপযুক্ত মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু। দীক্ষা-গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বিষ্ণু-সেবাশিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা গুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবানুভূতি প্রদান করেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব।

"কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করেন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষা-গুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব ; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজন-শিক্ষাগুরু দুই প্রকার—মহান্তগুরু ও চৈত্যগুরু। চৈত্যগুরু ভজনানুকূল বিবেক প্রদান করেন।"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'সাক্ষাৎ হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা ঐরূপ হইয়াও ভগবানের একান্ত প্রিয় সেবক, সেই শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব না হইলেও তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ। গুরু-নিত্যানন্দ ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও শ্রীচৈতন্যের দাস্যাভিমানী। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয় না। গুরুদেব ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তিনি কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সেবক। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি ভগবান্ হইতেও বড় বলিয়া পূজ্য।—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।"

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শিষ্যের চরম কল্যাণ বিধান করেন। তাহাতে ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক-ভগবান্। সেব্যের সেবা-প্রকাশই তাঁহার ধর্ম্ম। তাই তিনি ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। ভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবান্ বলিতেছেন—আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবে না—করিলে অনাদর করা হইবে। গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আচার ও প্রচারমুখে বৈষ্ণবাচার্য্য জগতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সেব্যবস্তুর সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু। অনন্যভক্তিই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। তিনি সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ। শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

গুরুদেব শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা জানাইয়া বিষয়ী শিষ্যকে সংসার হইতে উদ্ধার করত শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন—একদেহ, একতনু। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্ বা বিষয়-ভগবান্ এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্। ভগবানের কৃপায় গুরুকে জানা যায়, আবার গুরু-কৃপায় ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। শাস্ত্র বলেন,—যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ। গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুর গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। তাই গুরুদেব ভগবান্ হইয়াও পরমভক্ত—সেবা-বিগ্রহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রেরিত নিজজন। বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা-শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণ যেরূপ আনন্দিত হন, তাঁহার নিজের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কৃষ্ণ তত সন্তুষ্ট হন না। আবার কৃষ্ণসেবা-দ্বারা গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, নিজসেবায় ততটা হন না। বিশ্বম্ভর ভগবানকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। তিনি নিরন্তর ভগবৎস্মৃতিতে বিভাবিত। তিনি ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদনে সতত লোলুপ।

নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিলেই তিনি স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট স্বীয় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া নিজকে বিলাইয়া দেন। সেব্যের সেবা-সুখ-দর্শনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিযুক্ত। তাঁহার স্ব-সুখবাঞ্ছা নাই, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত। তিনি শুদ্ধ ব্রজবাসী, প্রেমময়তনু, সমদর্শী ও অদোষদরশী। সেবামোদে তিনি কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। ভগবানও তজ্জন্য গুরুদেবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন—তাঁহার সুখেই ভগবানের সুখ, তাঁহার সেবাতেই ভগবান্ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তাই গুরু-কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব। ভগবানের কৃপা না হইলে গুরুপদাশ্রয় সম্ভব হয় না, আবার গুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎ-পাদপদ্ম-লাভও অসম্ভব। এজন্য শরণাগত ভক্ত উভয়েরই নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

"তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি, পা'ব তব পদছায়া॥

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি', ধাই তব পাছে পাছে॥"

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

আমার প্রভুর মহিমা (২)

পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা আমি প্রপূজ্যচরণ গুরুবর্গের শ্রীমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। বর্ত্তমানে আরও কিছু নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হরিভক্তিবিরোধী মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে একটী ঘটনা নিবেদন করিতেছি।—

শ্রীল গুরুদেব এক সময়ে তদীয় সতীর্থ শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ-প্রভুর বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার বনগ্রাম লাইনে ঠাকুরনগর স্টেশনের নিকট আনন্দপাড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। উক্ত মহোৎসবে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরু-মহারাজ যখন ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন, তখন উক্ত সভায় আগত জনৈক অদ্বৈতবাদী শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—এই মতবাদ উঠাইয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিলেন যে —"জীবাত্মা চিৎকণ এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস। সুতরাং অণুচিৎ জীব কখনও বিভুচিৎ ব্রহ্মের সমান হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।' অর্থাৎ জীবাত্মা আমার অংশ। অংশ কখনও পূর্ণের সমান হইতে পারে না। 'A part can never be equal to the whole।' রেণু কখনও ভূধর হইতে পারে না। বিন্দুকে কেহ সিন্ধু বলে না। যাহারা জীবকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাদের মুখ অপবিত্র হইয়াছে। তাহাদের মুখ গোবর জল দিয়ে ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ বাগ্মীতাপূর্ণ ওজঃস্বিনী ভাষণ শ্রবণ করিয়া উক্ত অদ্বৈতবাদী ক্রোধান্বিত হইয়া সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া কিছুটা দূরে চলিয়া গেলেন। তখন সভার উদ্যোক্তা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি চলিয়া যাইতেছেন কেন? আপনি আসুন, শ্রীল মহারাজের সম্পূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করুন। তাহার পর আপনার যাহা বলার আছে তাহা বলিবেন।" তখন তাঁহার অনুরোধে উক্ত ভদ্রলোক সভায় আসিয়া পুনঃ উপবেশন করিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে বলিলেন,—আপনার কি সিদ্ধান্ত? সবই ব্রহ্ম ত'? তদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিলেন,—'নিশ্চয়ই'। তখন শ্রীল গুরুদেব বলিলেন,—"তাহা হইলে আমিও ত' ব্রহ্ম?" উক্ত অদ্বৈতবাদী বলিলেন —হ্যাঁ। তাহা হইলে আমি যদি ব্রহ্ম হই, তবে আপনি ব্রহ্মের কথায় চটিতেছেন কেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে —আপনার সব বস্তুতে ব্রহ্ম-দর্শন হয় নাই। যাহারা ব্রহ্ম-দ্রষ্টা তাহারা ত' ব্রহ্মের কথায় চটে না। এইরূপ অভিনব অকাট্য যুক্তি শ্রবণ করিয়া উক্ত অদ্বৈতবাদীর মাথা হেঁট হইয়া গেল এবং অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রশংসায় ও জয়ধ্বনিতে সমূহ সভাস্থল মুখরিত হইল। মহিলাগণ পরমানন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম গুরু-নিষ্ঠার জলন্ত আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের মূল

প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যে-সময়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির বাণী প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ভক্তিবিরুদ্ধ শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসা, শ্রীভাগবত-ব্যবসা ও শ্রীনাম-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ওজঃস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন। তাহাতে নবদ্বীপ-সহরের তথাকথিত জাতি-গোস্বামিগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একবার যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে অগণিত ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতে করিতে নবদ্বীপ শহরে উপস্থিত হন, তখন পূর্ব্বোক্ত জাতি-গোস্বামীর দল পরিক্রমাপার্টিকে আক্রমণ করেন। তাহারা বাড়ীর ছাদ হইতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের উপর ইট-পাটকেল, গরমজল নিক্ষেপ করিতে থাকেন। তখন বৈষ্ণবগণ ও সাধারণ যাত্রিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। বিদ্বেষিগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে লইয়া জনৈক গৃহস্থ ভক্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিবেশ একটু শান্ত হইলে শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"প্রভো! আপনার এই সন্ন্যাস-বেষে এখন বাহিরে যাওয়া চলিবে না। কারণ চতুর্দ্দিকে এখন শত্রু। সে-কারণে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করুন ও আপনার গৈরিক বসন আমায় প্রদান করুন। নচেৎ আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব না।" তখন শ্রীল প্রভুপাদ আপনার স্বীয় বিশ্রম্ভ ও অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বাক্য অনুমোদন করিলেন এবং বেষ পরিবর্ত্তন করিলেন। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী (শ্রীল গুরুদেবের ব্রহ্মচারী অবস্থার নাম) রূপে সাজাইয়া এবং স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণপূর্ব্বক সেই শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া অতি সন্তর্পণে বুদ্ধিমত্তার সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া আসিলেন। সেই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুর মঠবাসী গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাদের দর্শনে উল্লসিত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের জয়গানে পঞ্চমুখ হইলেন। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে বলিতে লাগিলেন,—আপনি শ্রীল প্রভুপাদকে রক্ষা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের যে মহোপকার সাধন করিলেন, তাহা অতুলনীয়। আমরা আপনার নিকট তজ্জন্য চিরঋণ পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তবিৎ পরম ভাগবতাচার্য্য শ্রীশ্রীল রামানুজ-সেবক শ্রীকুরেশের ন্যায় প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদকে রক্ষা করত শ্রীগুরুনিষ্ঠার এক দ্বিতীয় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন যে,—সর্ব্বভূতান্তর্যামী আমি গুরু

শুশ্রূষার দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারা তাদৃশ সন্তোষ লাভ করি না। অতএব মন-প্রাণ দিয়া শ্রীগুরুসেবা তথা তদীয় মনোঽভীষ্ট পূরণ করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সরলতা ও কপটতা

ভগবদ্‌বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না। ঔপাধিক অহংমম-ভাববিশিষ্ট ভগবদ্‌বিমুখ জনগণের কাপট্যই একমাত্র অবলম্বন। কপটতার আশ্রয়ে তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়, উহাই অসরলতা। প্রাকৃত সাহজিকগণ—কপটী, তাহারা কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবাবিমুখতা—আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কপটতা আশ্রয়কারীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।" আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিত। ভগবৎসেবা-নিরত জনগণই সর্ব্বতো-ভাবে সহজপথের পথিক। কপট ব্যক্তিগণের কখনও বৈষ্ণবতা থাকিতে পারে না। তাহারা 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ' পদবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"সরলতার অপর নাম—বৈষ্ণবতা। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল, তাই তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।"

মুখে ও মনে ভেদ থাকার নামই 'কপটতা'। প্রকৃতপ্রস্তাবে কাপট্যসিদ্ধি ও ভগবৎসেবা এক নহে। হরিভজন ও কপটতা—বহির্দৃষ্টিতে দুধ ও চুণগোলা জলের ন্যায় এক বলিয়া মনে হইলেও এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কপটিগণ বাহিরে সরলতার ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে কপটতা-রূপ কালসর্পকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন-পোষণ করে। তাহারা ভগবানের মায়ার দ্বারা সর্ব্বদাই বঞ্চিত হয়। যিনি কামিনী, কাঞ্চন বা সম্মানলাভের জন্য বিশ্বস্ত ভক্ত বা ধার্ম্মিকের মত বাহ্যে আচরণ করিয়া অন্তরে কপটতাপূর্ব্বক

ভগবানের সেবার ছলনায় সর্ব্বস্ব বাটপাড়ি করেন, তিনি বিশ্বাসঘাতকার জন্য ভগবানের বিমুখমোহিনী মায়ার দ্বারা কঠোর শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগকাণ্ডকে কৃষ্ণভক্তির সহিত সমান বলিয়া মনে করেন, তাহারাও কপটী ও পাষণ্ডী ; তাহারাও মায়াদেবীর শাস্তির হস্ত হইতে রেহাই পাইতে পারেন না। বৈষ্ণবের বঞ্চনা ও কৃপাকে একজাতীয় বিচার করা—কপটিগণের স্বভাব।

ধর্ম্মকাপট্য একটী ভয়ানক অপরাধ। যাহারা বাহ্যে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন অর্থাৎ তিলক, মালা, কৌপীনাদি ধারণপূর্ব্বক হরিভজনের অভিনয় করিয়া কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন, তাহারা বিড়ালতপস্বী অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী। তাহারা সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা বলিবার ভাণ দেখাইয়া গোপনে কনক-কামিনী সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন। তাহাদের দ্বারা জগতে কেবল অধর্ম্মের পথই বিস্তৃত হয়। কাপট্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের পথে অগ্রসর না হইলে কোনকালে ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথাই চলিয়া যাইবে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত'-গ্রন্থের মধ্যে কপট-ভজনকারিগণকে সাবধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা ভজা, তিলকমাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার, গোরা ধরে চুরি॥
অধঃপতন হবে ভাই! কৈলে কুটীনাটী।
নাম অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি॥

* * *

গৃহী হউক্ ত্যাগী হউক্ ভক্তে ভেদ নাই।
ভেদ কৈলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥
মূলকথা, কুটীনাটী ব্যবহার যার।
বৈষ্ণবকুলেতে সেই মহাকুলাঙ্গার॥
সরলভাবেতে গঠি' নিজ ব্যবহার।
জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার॥
কুটীনাটী কপটতা শাঠ্য কুটীলতা।
না ছাড়িয়া হরি ভজে, দিন গেল বৃথা॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আদর্শে কপটতার কোন স্থান নাই। তাই তিনি স্বীয় পার্ষদ ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে কঠোর শাস্তি প্রদানপূর্ব্বক কপটিগণের শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কাপট্য-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করা যায় বলিয়া মনে করেন, তাহা সর্ব্বৈবভাবে মিথ্যা। মূর্খ মৌমাছি যেরূপ ছিপিযুক্ত বোতলের উপরে বসিয়া ভিতরে সংরক্ষিত মধু পান করিতেছে ধারণা করিয়া ভুল করে; তদ্রূপ কপটিগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভের চেষ্টা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ মাত্র করে। ভগবানের প্রকৃত সেবা ও সেবার অভিনয়—দুইটী পৃথক্ বস্তু। বিষয়িগণ হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ধন, জন প্রভৃতি রক্ষা করিতে না পারিলে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে,—"হে কৃষ্ণ! ধন-জনাদি তোমারই সম্পত্তি। জন্ম বা মৃত্যু সবই তোমারই ইচ্ছা।" প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে শরণাগতির কোন কথা থাকিতে পারে না। ইহা "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বাক্যের ন্যায় কপটতা মাত্র। কপট ব্যক্তির সেবা ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না।

যাহারা সংসারের অভাব-অসুবিধা দূর করিবার পর হরিভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কপটতাপূর্ণ জানিতে হইবে। অভাব, অসুবিধা প্রভৃতি দূর হইলে হরিভজন করিবার ইচ্ছা, হরিভজন না করিবারই কপটতাপূর্ণ সঙ্কল্প বিশেষ। সংসারের অভাব-অসুবিধাগুলি কোনকালেই সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইবে না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে হরিভজনও কোনকালে আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে না। অনেকে আবার, সামাজিক চক্ষুলজ্জার ভয়ে হরিভজন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহারা মহাজনগণের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া বেদবহির্ভূত নব্যমত প্রচারপূর্ব্বক নিজদের নরকের দ্বার পরিষ্কার করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু' গীতিকাব্যে লিখিয়াছেন,—

মন! তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ-স্বতন্ত্রতা॥

সম্প্রদায়ে দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্ব-মতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি করি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্ব-পথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা, দীক্ষা, মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥

সকলকে সরল হইতেই হইবে। কপটতা ও সরলতা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস। সরল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু কপটতা থাকে না। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ দুর্ব্বলতা ও কপটতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"কপটতা একটা আলাদা জিনিস, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিস। কপটতা ও দুর্ব্বলতা এক জিনিস নহে। কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়, কপটীর মঙ্গল হয় না। কপটব্যক্তি অভক্ত। সরল দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু কপট নহে। যে কপট, তার মুখে এক কথা—মনে অন্য চিন্তা। দুর্ব্বল ব্যক্তি নিজের অসুবিধার জন্য লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত, কিন্তু কপটলোক সদা নিজের বাহাদুরী নিয়েই মত্ত।"

"আচার্য্যকে ঠকাবো—বৈষ্ণবের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তিরূপ কালসর্পকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ-কলা দিয়ে পুষবো—লোককে জানতে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা। তাদের কোনকালেই মঙ্গল হবে না। আমরা যদি ভক্তের বেষ নিয়ে অন্যকার্য্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি—সংসার করাটাকেই

বড় কাজ মনে করে—তাতেই মজে থাকি অথবা ত্রিদণ্ড নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতা-হরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি, তাহলে নিজের গলায় নিজেই ছুরি দিলাম—হরি-ভজনের নামে আর কিছু করলাম। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে—অনর্থ থাকে, তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—ভক্ত সাজিয়া ভোগেই মত্ত থাকি, তাহলে অসুবিধা রয়েই গেল।”

সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠিত, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। নিষ্কপটতা থাকলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল, কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ‘মনঃশিক্ষার’ টীকাতে ত্রিবিধ সাধকের কপটতাগুলির তালিকা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিবিধ সাধকের কপটতাগুলি নিম্নরূপ :—

(১) স্বনিষ্ঠিতের কপটতা—ভগবত্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোককে পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ করা ও ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করা।

(২) পরিনিষ্ঠিতের কপটতা—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ও ‘আমি বিষ্ণুভক্ত, আমি অধিক বুঝিয়াছি, আমি অনাসক্ত’—এইরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা করা।

(৩) নিরপেক্ষের কপটতা—আত্মম্ভরিতা, নিজধৃত লিঙ্গের অহংকারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারী লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনের ছলে অর্থাদি সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ, বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধিপালনাসক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা ও ‘আমি নির্ম্মল বৈরাগী’, ‘আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি’, ‘আমি ভক্তিতত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি’—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করা।

জীব যখন নিষ্কপটভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি মঙ্গললাভ করিতে পারেন। যিনি নিজের লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার খতিয়ান না করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বক্ষণ অকপটে সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইতে পারেন; কৃষ্ণ তাঁহাকেই প্রকৃত সুখের সন্ধান প্রদান করেন। সেবার প্রতি অকপট উন্মুখতা না থাকিলে অথবা হৃদয়ে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। গুরু-বৈষ্ণব অপেক্ষা ‘বড়’ হইবার অভিলাষ—‘ভক্তি’ নহে, উহা অভক্তি ও কপটতারই অভিব্যক্তি। গুরু-বৈষ্ণবগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর সকল বিষয়কেই ঘৃণা ও ক্ষুদ্রবোধ করেন; তাঁহারা কখনও তাহাতে বিন্দুমাত্রও আসক্ত হন না। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-

প্রভাবে নিশ্চয়রূপে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব মহাবল লাভ করিয়া নির্ভয়ে কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-বিরচিত 'প্রেমবিবর্ত্তের' নিম্নোক্ত বচনসমূহ স্মরণপূর্ব্বক নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিলে প্রত্যেক জীব অতি অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেম লাভের অধিকারী হইবেন, ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি নাই,—

"যদি ভজিবে গোরা, সরল কর নিজ মন।
কুটীনাটী ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা, কেমনে হৃদয় ঢাকি॥"

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

মহাভাবের উন্মীলনে

ভাবের পরবর্ত্তী ধাপ হল মহাভাব। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিবিড় সম্পর্কের এ একটী অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। আখের রস মিষ্টি—তবুও আখের রসকে আগুনে জ্বালিয়ে ঘন করতে করতে এক সময় চিনিতে পরিণত হয়—ঠিক তেমনই ভাব মহাভাবেরই মতো রসঘন সুমিষ্ট এক উপাদান; তবুও ভাব যখন সীমার ঊর্দ্ধে মহামিলনের প্রাক্‌মুহূর্ত্তে মোহাবিষ্ট এক মাদকতার সৃষ্টি করে—তখনই তা মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব যেন এমনই—চিরন্তন কোন ভক্ত সেই যে একবার মিলনের মদির মুহূর্ত্তে চিরন্তন সেই ভগবানের অনাদি রূপ-রহস্য নয়ন-গোচর, হৃদয়গোচর করেছিলেন,—তারপর সেই মাধব-রতির দাহ থেকে আরতির দীপশিখা জ্বেলে অনন্ত-অনন্ত কাল প্রাণদেবতার পূজার্চ্চনা করে চলেছেন। তার যেন আর শেষ নাই—শেষ হবে না—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' প্রাণ-রাধিকা—প্রাণ-আরাধিকা যেন প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে থাকবেনই, আর সে দৃষ্টির মধ্যে থাকবে এক নিবিড় রসের আলম্বন, অপরূপ সৌন্দর্য্যের কামনা, পরম তৃপ্তির নিবিড়তা ও গহণ তৃষ্ণার বিধুরতা। ভাব ও মহাভাবের সন্ধিক্ষণের মত্ততায় ভক্ত যেন বলে ওঠেন,—

"কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।"

ভক্ত না বুঝলেও, তাঁর নিজেরই অজান্তে বলে ফেলেন,—

'দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।'

অসীমকে সীমার মধ্যে এনে ভক্ত তিলে তিলে তাঁকে গড়ে তোলেন। নিজের অস্তিত্ব কেমন করেই তাঁর অস্তিত্বে মিশে যায়! এক ক্ষণমুহূর্ত্ত হয়ে দাঁড়ায় এক যুগ। কৃষ্ণৈকপ্রাণা ভক্ত তাঁর হৃদয়বল্লভ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সরে যাওয়াকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেন না। হেসে তাই বলে যান সরল বিশ্বাসে,—

"তোমরা যে বল—'শ্যাম মধুপুরে যাইবেন'
সে কথা ত' কভু শুনি নাই॥"

'সে কথা ত' কভু শুনি নাই'—বাঃ! কি করে শুনবেন? পরমপুরুষ ত' শুধু বাইরেই নয়—তিনি ত' ভক্তেরই 'হিয়ার মাঝারে,' ভক্ত তাই সকল অবিশ্বাস —সব সন্দেহকে দূর করে দৃঢ়-কণ্ঠে বলে যান,—

'এ বুক চি'রয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত' শ্যাম মধুপুরে যাবে॥'

অতএব তিনি পরম নিশ্চিন্ত। কিন্তু গুজব একদিন মহাসত্যে সত্যিই পরিণত হল। প্রিয়তম সত্যিই যাবেন! যাবেন সে কোন্ দূরদেশে? ক্রূররূপী অক্রূর মহামতি এসে কালই শ্যামরায়কে নিয়ে যাবেন? সমস্ত দ্বন্দ্বকে মাথায় রেখে ভক্ত আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করে চলেছেন,—

"যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥"

এ রাত যেন আর না পোহায়। যোগিনীকে সাধ্য-সাধনা করে তাঁকে দিয়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রকে আকাশে আটকে রাখবার চরম প্রয়াস করে যান ভক্ত। এত কষ্ট করে তাঁর ফুল তুলবার আর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি দুঃখ করে বলেন, —

'কিয়ে সখি চম্পকদাম বনায়সি
করইতে রভসবিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥'

ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্যিই চলে যান, তবে আর কি প্রয়োজন? শেষ পর্য্যন্ত সেই পরমপ্রিয়তম চলেই গেলেন। ভগবানের বিরহে ভক্তের বুক

ফেটে যাচ্ছে। তিনি যদি জানতে পারতেন যে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসবে, তবে তিনি—

'পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া।'

জীবন-যৌবন দিয়ে যাঁকে এত করে আপন ভেবেছিলেন, তিনি তার কোন মর্য্যাদা দিলেন না! হায় রে অন্ধ বাসনা! এখনই যদি বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে পরে আর কৃষ্ণপ্রেমে কী লাভ? নিদারুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে বলেন,—

'অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব
　　কি করব বারিদ মোহে।
এ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
　　কি করব সো পিয়া-লেহে॥'

এই কান্না—এই বিরহ-ব্যাকুলতা ভক্তের আপনজনদের—পাড়া-প্রতিবেশীদেরও ব্যথা দেয়। তাঁরা ভরসা দেন,—পরমপুরুষ নিশ্চয়ই শীঘ্র ব্রজে ফিরে আসবেন। কিন্তু ভক্ত সে প্রবোধে শান্ত হতে পারেন না। তিনি যে এখনও কৃষ্ণবিরহ সত্ত্বেও বেঁচে রয়েছেন, এও তাঁর পক্ষে লজ্জার বিষয়,—

'শুন সখি! কি বোলব তোয়।
নির্লজ প্রাণ সহজে রহু মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক জীবইতে লাজ রহু মোর॥'

ভাব ক্রমশঃ চলে মহাভাবের পথে। মহাভাবের উন্মীলনে ভক্ত এবার একটু অন্যরকম হয়ে যান। বিরহের শতবিষজালায় দংশিত হতে হতে কেমন করেই যেন মিলনের মদির মুহূর্ত্তকে কল্পনা করে নেন ভক্ত। 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলালে ঘরে'—এই শতবর্ষের ব্যবধান যাঁর চিত্তে এমন দংশন সৃষ্টি করেছিল, মহাভাবের উন্মীলনে তাই যেন আজ অমৃত। যা কখনওই হওয়ার নয়, তাকেই ভক্ত কল্পনা করে মিলনোৎসবের জন্য প্রস্তুত হন। মহাভাবের উন্মীলনের আনন্দ মুহূর্ত্তে বিচ্ছেদের অন্তিমতম বেদনাকে প্রকাশ করে বলে ওঠেন,—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত' ভাল॥'

মহাভাবের উন্মীলনে ভক্ত কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না, এমনই এই মহাভাব! হৃদয়ের প্রতিটী কণা যার মত্ততায় মত্ত, ব্যথিত হৃদয়ের কারুণ্যে যা একেবারেই মধুর-মধুরতর হয়ে ওঠে, তা হল সেই মহাভাব।

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাবে

পরম পবিত্র দিন
সেই উনিশে আশ্বিন
স্থ-রবিবাসরে।
তের পচাত্তর সনে
সারা গৌড়ীয় গগনে
প্রেম-অশ্রু ঝরে॥
পরম আরাধ্যতম
ভক্তিপ্রজ্ঞান মম
আচার্য্যভাস্কর।
দেবানন্দ মঠমাঝে
অসীম ভক্তিতে 'রাজে
গৌরগুণধর॥
শারদীয়া পূর্ণিমায়
চন্দ্রগ্রহণ আভায়
হ'য়ে পরিস্নাত।
দামোদর-ব্রতমুখে
সায়ংকালীন স্থখে
ইষ্টনামে রত॥
'বেদান্ত সমিতি' শ্রেষ্ঠ
শ্রীল প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ
গুরুগত প্রাণ।
'ভজন-কুটীরে' একি
গুরুর আলেখ্য দেখি'
রাখে অবদান॥

দৃশ্যটি অতি মধুর
মহারসে ভরপুর
আত্মনিবেদন।
স্ফুট ও অস্ফুট স্বরে
যেন আলোকিত স্তরে
হ'তেছে কথন॥
শ্রীল কেশব আদেশে
চলে সেবার আবেশে
শ্রীহরিকীর্ত্তন।
শিষ্য, ভক্ত, ব্রহ্মচারী
সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সারি
গাহে অনুক্ষণ॥
শ্রীল 'কৃতিরত্ন' শেষে
মহা আনন্দেতে ভেসে
নিত্যধামে যায়।
কলিহত জীবকুল
হারাইয়া মহামূল
কাঁদিয়া বেড়ায়॥
আবার এসো হে ফিরে
মর্ত্যভূমে স-শরীরে
মহাক্ষণে আজ।
জ্ঞানের আলোক দিতে
জগতের মূলচিতে
"গুরু-মহারাজ"॥

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,** সেবাসুহৃদ্
সাংবাদিক পি. টি আই.

শিক্ষা—সেকাল বনাম একাল

কোন একটী দেশ বা জাতি কতটা উন্নত, সেটা নির্ভর করে সেই দেশ কতটা শিক্ষায় এবং কি শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের একটী অস্পষ্ট ধারণা মাত্র আছে। তাই 'শিক্ষা'-শব্দটীকে সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই যত গোল বাধে। প্রথমতঃ শিক্ষা জিনিসটি কি বা শিক্ষা কাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত? তৃতীয়তঃ শিক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি কি?

'শিক্ষা'-শব্দটী ক্রিয়া হিসাবে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। আবার বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও বিশেষণরূপেও দেখা যায়। যেমন—'সে নৃত্য শিক্ষা করিতেছে', আবার 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড', এবং 'সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত।' কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞা কি? মহর্ষি কণ্বপাদের মতে—একজন মানুষকে তার অনুভূতি ও তার আত্মার তুষ্টি-সাধনের জন্য বৃহত্তরভাবে প্রকাশ ঘটানোর নামই 'শিক্ষা'।

শিক্ষার লক্ষ্য বা বিষয়বস্তু কি?—এ সম্বন্ধে আধুনিককালে বিভিন্ন শিক্ষা-বিদ্‌দের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। দেশ, কাল, জীবিকা, পরিবেশ, প্রকৃতি প্রভৃতি সবকিছুর উপর নির্ভর করিয়া একটী দেশের শিক্ষা গড়িয়া ওঠে। ভারতীয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌গণ ঠিক ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল—মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হিসাবে গড়িয়া তোলা। ভারতীয় ধর্মবিৎ দার্শনিক শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মানুভূতি বা আত্মসাক্ষাৎকারই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শিক্ষাবিদ্ ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিশনের সভাপতি-হিসাবে যে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে,—

"Education according to Indian tradition is not merely a means to learning a living, nor it is only a nursery of thought or a school for a citizenship. It is initiation into the life of spirit, a training of human souls in the persuit of truth and the practice of virtue."

শিক্ষার দার্শনিক আলোচনাপ্রসূত মতবাদগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা

যায়, কোন মতবাদই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। **ভাববাদ** মানুষের উন্নততর জীবন, আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সামাজিক জীবন, বাস্তব ইতিহাস প্রভৃতি ভাববাদী-দর্শনে উপেক্ষিত। **স্বভাববাদ** শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি ও সম্ভাবনার বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু কোন্ আদর্শে প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটিবে এ ব্যাপারে স্বভাববাদ নীরব। **জড়বাদ** প্রাকৃতিক শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনিয়া ব্যক্তি-জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা যায়, সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষাকে নিয়োজিত করিতে চায়। ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রভৃতি বিষয় জড়বাদে কোন স্বীকৃতি পায় নাই। **প্রয়োগবাদ** শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সভ্যতা ও সমাজ-প্রগতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়াছে, কিন্তু শিক্ষা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনধর্ম্মী হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বা আত্ম অভিব্যক্তির বিশেষ কোন মূল্য প্রয়োগবাদে স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—আত্মার বন্ধনদশা হইতে মোক্ষলাভ। এর জন্যই সমকালীন মনুষ্যগণ জ্ঞানের অনুশীলন করিতেন এবং বাস্তবে তাহা প্রয়োগ করিতেন। সংসার-জীবন হইল—আত্মার বন্ধনদশা। দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভের অর্থ হইল—মোক্ষলাভ। ঋষিগণ মোক্ষলাভের পথনির্দ্দেশ দিয়াছেন—প্রাচীন ভারতের গ্রন্থগুলিতে। যদিও এই মোক্ষের পিছনের দুঃখবাদের মিশ্রণ আছে। আসল জ্ঞান হইল—আত্মজ্ঞান। মানসিক উপলব্ধি ছাড়া এই জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। এরজন্য প্রয়োজন দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ। এজন্য বৈদিক যুগের ছাত্রবৃন্দ শ্রম ও যোগসাধনাদ্বারা শরীরটিকে সুস্থ রাখিতেন।

সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রগণ গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণ উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। তপোবনে গুরু এবং শিষ্যের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। নিজের পরিবারের মানুষ হিসাবেই গুরু শিষ্যকে গ্রহণ করিতেন পরিবারের একজন সদস্যের মতই। আহার, নিদ্রা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি করণীয় সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোন আর্থিক সম্পর্ক ছিল না। গুরুর শ্রম, প্রচেষ্টা ও আশীর্ব্বাদে শিষ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতেন। দৈনন্দিন কাজে গুরুগৃহে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করিতে হইত। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ভিক্ষা করিতে হইত। শিষ্যের চরিত্র গঠনে, সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুর দায়িত্ব ছিল ব্যাপক অর্থাৎ এককথায় বৈদিক শিক্ষায় শিষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হইত।

সেকালের তপোবনের শিক্ষার ভিত্তি ছিল—ধর্ম্ম; ফলে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আর্য্যঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আর্য্যঋষিগণ গ্রহণ করিলেও সেকালের লৌকিক শিক্ষাকেও অবহেলা করা হয় নাই। লৌকিক শিক্ষায় মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ভারতীয় শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগ হইতে আজ আমরা বহুকাল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আজ বস্তুতান্ত্রিক জগতে সফলতা লাভের শিক্ষাই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। আদর্শ ও লক্ষ্যের এই পালা-বদলে তপোবনের শিক্ষাকে নিরর্থক মনে করিয়া মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোপান আশ্রয়ে উপভোগ্যকর জীবন প্রতিষ্ঠায় আজ বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া আমাদের জীবনের শান্তি আসে নাই। আমরা শুধু বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির দ্বারাই জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই যদি শান্তি আসিত, তাহা হইলে জড় বিজ্ঞানকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করিয়া পশ্চিমী দুনিয়ায় আজ এত অস্থিরতা দেখা দিত না। কল্যাণের পথ,—যাহা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে বাঁচিবার সন্ধান দিতে পারে, তাহার সন্ধান জড় বিজ্ঞান দিতে পারে নাই। আর্য্যঋষিরাই সে-যুগে ইহার সন্ধান দিয়াছিলেন। সে যুগের আর্য্যঋষিবর্গ সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিক্ষার আদর্শ লক্ষ্যকে রূপায়ণের জন্য নূতন পথের সন্ধান করিয়াছিলেন। আজিকার শিক্ষাব্যবস্থায় তুলনামূলক-ভাবে সে সত্যকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

আজ আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি, ফলতঃ প্রাচীন যাহা কিছু সমস্তই আমরা অচল, অনাবশ্যক বলিয়া অবহেলা করিয়া সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছি। নিজদের অক্ষমতাই হউক, আর অজ্ঞতাবশতঃই হউক আমরা একবার ভাবিবারও সুযোগ বা সময় পাই না যে, আমরা কি মণি-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতেছি। তাই আজ আমাদের শিক্ষা লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্য-বিহীন অনাথ শিশুর ন্যায় ধূলি-কর্দ্দমে অনাদরে, অবহেলায় নিষ্প্রাণ হইতে বসিয়াছে। আমরা আধুনিক বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু আধুনিক কালের প্রকৃত সময়সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। কেহ বলেন,—রবীন্দ্রোত্তর কাল হইতে, আবার কেহ বলেন,—রবীন্দ্র সমসাময়িক কাল হইতেই আধুনিক কালের শুরু—এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে আধুনিককাল যখনই শুরু হউক না কেন, বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছুই নাই, যাহাদ্বারা আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত

হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষার লক্ষ্য হইল—যেন-তেন-প্রকারেণ একটী সার্টিফিকেট জোগাড় করা। আবার সার্টিফিকেটের উদ্দেশ্য হইল—ছলে-বলে-কৌশলে একটী চাকরি জোগাড় করা।

হায়! বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সভ্যমানুষ, তোমরা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ, তোমরা কি শিখিতেছ? আর পাশ করিবার পর সে শিক্ষা তোমাদের কি কাজে লাগিবে? হায়! আজ আর সেই তপোবন নাই। গঙ্গার ধারে ধারে, দেউলে-চাতালে, রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবত হাতে সেই পাঠক ঠাকুরও আজ আর নাই। দিবাবসানের শেষে অনুজ্জ্বল আভা দূর-দিগন্তরেখায় থাকিতে থাকিতে দেবালয়মুখী শ্রোতাদের কাতারে কাতারে ভীড়ও আজ নাই। তখন আশ্রম-মন্দিরে পুরাণাদির বিভিন্ন আলোচনার অবসর ছিল। বাবুদের অন্দর-মহলে ধর্ম্মালোচনার আসর বসিত। মজলিস বা আসর আজও আছে, কিন্তু অন্য রূপে, অন্য পথে। আজ নাই সেই শান্তিলাভের মিলন-মন্দির, আর নাই সেই হৃদয়-নির্ম্মলকারী পরিবেশ। তাহার স্থলে আজ সেখানে গজাইয়া উঠিয়াছে কৃত্রিম পার্ক। যেখানে মানুষ একদিন শান্ত-সমাহিতচিত্তে আত্মানুশীলন, আত্মানুসন্ধান ও আত্মসচেতনতা লাভ করিত, আজ সেখানে শুধু অস্থির চিত্তচাঞ্চল্যে কায়িক, মানসিক, বাচিক ভোগবাসনায় মানব-সমাজ প্রতিনিয়ত আত্মধ্বংসের পথে বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে শিক্ষার সঙ্গে দলীয় রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ রাজনীতি হইতে শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ আর সংরক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যক্তিস্বার্থে নিজ গোষ্ঠীর কাজে লাগানো হইতেছে। রাজনৈতিক দল অর্থে জনগণের ক্ষমতাসীন একটী খণ্ড অংশ বা গোষ্ঠী। সেই একটী অস্থায়ী গোষ্ঠী তাঁহাদের অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য কত ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদের বিশেষতঃ ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব যে প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের শিক্ষা, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

তবুও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্য্যায়ে কোন কোন শাখায় এই সমস্ত শিক্ষা লইয়া গবেষণা করা হয়। সেখানে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' কিছু গোস্বামী গ্রন্থাবলী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল সনাতন-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। রাজনীতির ঘৃণ্য, কুৎসিত, কালো হাতের ছোঁয়া বয়সাভাবেই হউক, আর যোগ্যতাভাবেই হউক, সেখানে এখনও প্রকাশ্যভাবে দাপাদাপি শুরু করিতে পারে নাই। তবে প্রবল চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে গবেষণার নামে এগুলির উপর নঞর্থক টিকটী চাপাইয়া এগুলিকে সত্বর উৎখাত করা যায়। নচেৎ উদ্দেশ্যমূলক

ভোগসর্ব্বস্ব জড়ীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষকে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে চরম সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে না।

নবীন, নূতন, আধুনিকের অর্থ এই নয়—যা কিছু প্রাচীন সব ধ্বংস করা। প্রাচীনের দ্বারা সৃষ্ট, প্রাচীনের মধ্যে লালিত-পালিত এবং প্রাচীনেরই পূর্ণতর বিকাশিত ও প্রকাশিত রূপই হইল প্রকৃত নবীনের পরিচয়। প্রাচীনকে অস্বীকার করার অর্থ নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। তবে প্রাচীন মাত্রই অনুসরণীয়, এরূপ নহে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ— সনাতন সত্যদ্রষ্টা মুনিগণ যাহা তাঁহাদের অনন্যসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার দ্বারা দর্শন ও অনুভব করিয়া আমাদের কল্যাণার্থে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের নবীন শিক্ষার সৌধ গড়িয়া উঠিলে তাহাই আমাদের অবশ্য কল্যাণকর হইবে, ইহার অন্যথা নাই।

তজ্জন্যই পরম কারুণিক, প্রেমময়, মঙ্গলময়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া আমাদের মত হতভাগ্য জীবগণকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষার ধারা অদ্যাবধি শুষ্ক হয় নাই। সেই সনাতন শিক্ষার ক্ষীণ স্রোতস্বিনী আজও একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-ধারায় অপ্রতিহত রহিয়াছে।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর]

ক্ষর থেকে যিনি অতীত, অক্ষর থেকে যিনি উৎকৃষ্ট, তিনিই পুরুষোত্তম। "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষরঃ উচ্যতে।" অতএব যিনি জীবাত্মা,পরমাত্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ, তিনি হলেন ভগবান্ পুরুষোত্তম—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। পূর্ণ তত্ত্বদর্শন আলোচনা করতে গেলে তার তিনটে ধারণা—**Aspect** আমরা শাস্ত্রে লক্ষ্য করি,—বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। ব্রহ্ম কাকে বলছেন?—সেই পূর্ণতত্ত্ববস্তুর প্রভা-আভা—**Lusture** হল ব্রহ্ম। পরমাত্মা কাকে বলছেন?—পূর্ণ তত্ত্বদর্শনের অংশ পরমাত্মা। কিন্তু মূলতত্ত্ববস্তু হচ্ছেন ভগবান্। ভগবান্-শব্দের দ্বারা তত্ত্ব-বস্তুর পূর্ণপ্রকাশ বুঝানো হয়েছে। যদি ব্রহ্ম-শব্দকে **Positive** ধরি, তাহলে

Comperative শব্দ হবেন পরমাত্মা ; আর **Superlative degree** হবেন ভগবান্। তাহলে এসব শব্দ কেন বলতে যাচ্ছি ? ব্রহ্ম-শব্দের আগে কিছু উপসর্গ লাগিয়ে দিলে মানে অন্যরকম হয়ে যায়। ব্রহ্মকে **Positive** শব্দ কেন বলছি ? এর আগে একটা 'পর' উপসর্গ লাগিয়ে দিলে **Superlative degree** পরব্রহ্ম হয়ে গেল। 'পরব্রহ্ম' শব্দের ব্যবহার শাস্ত্রে আছে। 'ভগবান্'-শব্দটা কেন **Superlative degree** ?—কারণ ওর আগে কোন উপসর্গ দিলে বিশেষ অর্থ হয় না। ঐরূপ ব্যবহারও নাই। অতিভগবান্, মহাভগবান্ শব্দ আপনারা পেয়েছেন কি কোথাও ?

তত্ত্ববস্তুর পূর্ণপ্রকাশকে বলে শ্রীভগবান্। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাতে চেয়েছেন ভগবান্ আছেন—এটা **Positive Truth**—বাস্তবসত্য কথা। অস্তি-শব্দ **Positive**। **Negativity** প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা বলি—নাস্তি। কিন্তু ভগবানকে মেনে নিয়েই 'নাস্তি'-শব্দ বলা যায়। তাঁকে অস্বীকার করে কখনও নাস্তি-শব্দ বলা যায় না। যুক্তি এটা কখনও বলে না। সেই ভগবান্ আকারবান্, তিনি নিরাকার নহেন ; তিনি সাকার, তাঁর আকার আছে। 'নিরাকার'-শব্দের বিভিন্ন অর্থও সেখানে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিরাকার কাকে বলব ? জাগতিক কোন আকার তাঁর নাই, পরন্তু তিনি অপ্রাকৃত আকারবান্। তিনি যে কোন আকার গ্রহণ করতে পারেন, তাতে তাঁর ভগবত্তার হানি হয় না। জল নিরাকার—**Shapeless, Colourless, Tasteless** প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। জলকে যে পাত্রে রাখা যাচ্ছে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করছে। সুতরাং জল নিরাকার। যদি ভগবানকে এমন বিশেষণ দিই, হতে পারে ওটা। নিরাকারত্বের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরাৎপরতত্ত্ব সেই ভগবান্ যে-কোন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হতে পারেন। যেমন সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ মৎস্যকুলে, কূর্ম্মকুলে, বরাহকুলে আবির্ভূত হলেন। আমরা সব মাছগুলোকে, সব কচ্ছপগুলোকে, সব বরাহগুলোকে প্রণাম করি কি ?—না, প্রণাম করি না।

অবতার-গ্রহণকারী যে ভগবান্ তাঁকে প্রণাম করি। এতৎসত্ত্বেও সেই ভগবানের একটা নিজস্ব আকার আছে। তিনি সচ্চিদানন্দাকার—শাস্ত্র তাঁর প্রাকৃত গুণগত কোন আকার বিচার করলেন না। সত্যই তাঁর নিজস্ব আকার আছে। সেই আকারের কথা বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে বর্ণিত আছে—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং শ্যামসুন্দরম্', 'দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্', 'পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ', 'গূঢ়ং তৎ মনুষ্যলিঙ্গম্'। তাহলে শ্রীভগবানের আকার আছে। কি আকার ? —'অতুলং শ্যামসুন্দরম্'। সেই ভগবানকে কি দেখতে পাওয়া যায় ?

—হ্যাঁ, দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ সব আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যে আছে—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" সেই যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, সেখানে ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছেন। তাহলে ভগবানের শ্রীচরণ আছে দেখা যায়। যাঁর চরণ আছে, তাঁর হাত ত' আছে, চোখ, কান, নাক, মুখও আছে। ভগবানের এক নাম হৃষীকেশ। হৃষীক্ মানে ইন্দ্রিয়, হৃষীকেশ মানে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান্। সেই ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের কাছ থেকে আমরা ইন্দ্রিয়—Organগুলো পেয়েছি। সমস্ত বৃত্তি—কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো সব পেয়েছি। এইজন্য ভগবানকে বলছেন—শ্রীহৃষীকেশ। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরওয়ালা।

ভক্তি কাকে বলছেন ?—'হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' "হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, ইহ ভক্তি পরম কারণ।"- শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রের কথা। 'হৃষীকে গোবিন্দসেবা'—হে ভগবান্! তোমার থেকে আমি যে ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছি, এগুলো সব তোমার সেবাতেই নিযুক্ত করছি। এর নাম হল—শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, সেবা। তাহলে সেই যে পরমতত্ত্ব ভগবান্ তাঁর আকার আছে, দেখা যায়। আর ভগবানের যে আকার আছে এটা জাগতিক কবি-সাহিত্যকগণও স্বীকার করেন। ব্রহ্মবাদী কবি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।" তাহলে বুঝা যায়—ভগবানের শ্রীচরণ আছে। শ্রীচরণে কিছু ধুলি লেগে থাকে, কবি সেই ধূলায় ধূসরিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

ব্রহ্মাজী শ্রীগোবিন্দ স্তব করেছেন। তিনি বলছেন, সেই ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায়। কে তিনি ? তাকে কিভাবে দর্শন করা যায় ? প্রেমের কাজলমাখা চোখে সেই ভগবান্ দর্শনের বিষয়ীভূত হন। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।" তাহলে তাঁকে বাস্তবরূপে দেখা যায়। কি তাঁর রূপ ? 'যং শ্যামসুন্দরম্"—শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি তাঁর, কিন্তু অচিন্ত্য; সেই নিত্যরূপেই তিনি ভক্তকে দর্শন দেন। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, এর দ্বারা তাঁকে জানতে, বুঝতে পারা যায় না। তবে সেবোন্মুখ বৃত্তি—বিশ্রম্ভ সেবার দ্বারা সেই ভগবানের দর্শন লাভ করা যায়। ভক্তের প্রতি অহৈতুকী করুনাপরবশ হয়ে তিনি human conception এর মধ্যে আসেন। তাঁর কৃপার একটা ক্ষেত্র আছে; স্থান, কাল, পাত্রভেদ আছে। সুতরাং শ্রীভগবানের নিজস্ব আকার আছে, এটা প্রমাণিত।

সেই প্রেমময় ভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ; তিনি **Supreme Lord, Almighty Lord**। শ্রীভগবানের যত রকম শক্তি আছে সকল শক্তির প্রধান—তিন শক্তির কথা বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে আলোচনা রয়েছে। ভগবানের খাসকামরার যে শক্তি তাঁর নাম স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি, হ্লাদিনী শক্তি বা পরাশক্তি। দ্বিতীয় জীবশক্তি, তৃতীয় মায়াশক্তি। শাস্ত্রাদিতে এই তিনশক্তি নিয়ে সর্ব্বত্র আলোচনা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি চিৎসাকার, তিনি চিৎসবিশেষ। নাস্তিক্যভাব নিয়ে চলছেন যাঁরা—নির্ব্বিশেষবাদী যাঁরা, তাঁরা বলছেন, সেই ভগবান্ নির্ব্বিশেষ, নিগুর্ণ, নিঃশক্তিক। কিন্তু সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তত্ত্ব তিনি।

অপ্রাকৃত সগুণ, নির্গুণের একটা পৃথক্ ব্যাখ্যাও আছে। উপনিষদে বুঝিয়েছেন সেটা।—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

সেই মহান্ পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করছেন বেদে, উপনিষদে। 'অপাণিপাদঃ' —সাধারণ হাত-পা তাঁর নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত-পদবিশিষ্ট সেই ভগবান্। তিনি ভক্তের ভক্তিমাখা উপাহৃত দ্রব্য গ্রহণ করেন, ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে হাজার হাজার মাইল দূরে গমনাগমন করেন, ভক্তের জন্য তিনি ক্ষীর চুরি করে রাখতে পারেন—এ স্নেহ-বাৎসল্য তাঁর আছে। ভক্তবৎসল, বাঞ্ছাকল্পতরু সেই ভগবান্। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ' —সাধারণ চোখ তাঁর নাই, কিন্তু বিশেষ চক্ষু তাঁর আছে, তা দিয়ে জগতের সবকিছু সব সময় দেখছেন। আমরা অনেকে ধার করা চোখ লাগাচ্ছি। কারণ **Eye sight** কম, তাই উপচক্ষু একটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। কিন্তু ভগবানকে ওরকম কোন ধার করা চোখ ব্যবহার করতে হয় না। 'স শৃণোত্যকর্ণঃ'—কান তাঁর আছে, সাধারণ নয়, বিশেষ কান। সেই কান দিয়ে তিনি জগতের সমস্ত খবর নিচ্ছেন। 'ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'—সেই পরাৎপর তত্ত্ব ভগবানকে আমরা জেনে উঠতে পারছি না, বুঝে উঠতে পারছি না, সেইটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। শাস্ত্র সেই দুঃখের কথাই ত' বুঝিয়েছেন। সুতরাং সেই যে পরতত্ত্ব ভগবান্ তিনি স্নেহময়, প্রেমময়। মায়া ও অবিদ্যা বলে যে জিনিসটা আছে, সেইটাই আমাদের তাঁর দিকে অগ্রসর হতে সর্ব্বদা বাধার সৃষ্টি করছে। আমাদের যে প্রাকৃত অহমিকা—**Egoism,** সেটাই সব শেষ করে দিচ্ছে।

চার রকমের বিপত্তি আছে বদ্ধাবস্থায় আমাদের—জন্মের অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, শিক্ষার গৌরব ও রূপ-গৌরব। এই চারটী ছাড়া আবার চারটী দোষ আছে আমাদের—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা। 'ভ্রম' মানে বস্তুতে

অবস্তু জ্ঞান এবং অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। অন্ধকার রাত্রে হেঁটে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, 'সাপ, সাপ' বলে চিৎকার করে উঠলাম। আলো জ্বেলে দেখা গেল ওটা সাপ নয়, দড়ি পড়ে আছে রাস্তায়। আবার এর উল্টোটাও হচ্ছে। সাপের মাথায় পা তুলে দিলাম, মনে করলাম একটা রশি পড়ে আছে; কিন্তু সাপ কামড়ে দিল। এই ভুল ব্যাপারটা সব সময় ঘটছে আমাদের। 'প্রমাদ'—অনবধান বা অন্যমনস্ক ভাব—**Inattentiveness**। এটা আছে আমাদের সকলেরই। 'করণাপাটব'—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। সীমিত ক্ষমতাযুক্ত যে ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছি আমরা এগুলো বহু দোষ-ত্রুটীপূর্ণ। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমরা খুব বাহাদুরি করছি! 'বিপ্রলিপ্সা' মানে স্ব-পর-বঞ্চনেচ্ছা। আমি সব জানি, বুঝি—এ অহঙ্কারটা পূর্ণমাত্রায় একজন অতি বৃদ্ধের, যুবকের, বালকেরও আছে। সকলের নিকট আমি ভাল—সাধু সাজতে চাচ্ছি। হে ভগবান্! কি করে আমি তোমাকে স্মরণ করব, কিভাবে তোমার কাছে এগোব!—সাধক-সাধিকা এরূপ প্রার্থনা করছেন। সেখানে ভগবানের কৃপাসম্বল রয়েছে। সাধনা ও কৃপা—দুটো কথা। সাধন বড়, না কৃপা বড়? সাধনের প্রয়োজন আছে। ক্লেশকর প্রচেষ্টা না দেখলে ভগবান্ কাকেও কৃপা করছেন না, দয়া করছেন না। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কৃপাই বড়। ভগবান্ যদি কৃপা না করেন, আমি শতচেষ্টা করলেও সেটা সফল হবে না। "যাহা নাহি বেদে, তাহা নাহি পৃথিবীতে। যাহা নাহি ভাগবতে, তাহা নাহি পৃথিবীতে।" মানুষের যত বুদ্ধিবৃত্তি—**Talent** আছে, **Intelectualism** আছে, সব শেষ হয়ে যাবে ভাগবতের কথা বুঝতে গেলে। সব তাত্ত্বিক বিচারটা এর মধ্যে ভরে দেওয়া আছে চরমরূপে।

গতকাল একজন প্রশ্ন করছিলেন যে,—শাস্ত্রের বাহিরে আমরা কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারি কি না? আমি উত্তর দিলাম,—শাস্ত্রের বাহিরে কোন জ্ঞান থাকতে পারে না। যত রকম জ্ঞানের চিন্তাধারা আছে, সবকিছুই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের ভিতরে অনুস্যূত। **Positive** এবং **Negative side** এ যত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা আসতে পারে, সবগুলো শাস্ত্রের ভিতরে বুঝানো আছে। আমরা কথার সঙ্গে, আমার চিন্তাধারার সঙ্গে যদি কোন শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শনের মিল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে—ওটা ভুল **Theory**? ওটা যাচাই করে নিতে বললেন।

খাঁটী সোনা আমার দরকার। বাজারে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে নিচ্ছি আমি খাঁটী সোনা। তাহলেও আমার সঙ্গে একটী কষ্টিপাথর থাকবে, আমি কষে দেখব ওটা ২২ ক্যারেট, না ২৬ ক্যারেট সোনা। যদি আমি খাঁটী সোনা না

চিনি—না জানি, তাহলে নিশ্চয়ই একজন জহুরীকে আমার সঙ্গে নিতে হবে। সেই জহুরীর হাতেও থাকবে একটা কষ্টিপাথর। তিনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন, —হ্যাঁ এটা নিতে পার। এটা এই দাম, এত ক্যারেট সোনা, তোমাকে ঠক্‌তে হবে না। জিনিসটা কি? বাস্তবদর্শন বুঝতে গেলে এই যে কষ্টিপাথর, একে বলে—তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত। যার নাম **Universal Truth, Axiomatic Truth**। এটাকে মেনে নিতে হচ্ছে। যখন আমি ভাল-মন্দের বিচার হারিয়ে ফেলব, সেক্ষেত্রে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

শাস্ত্রীয় যে **Judgement**—বিচার, সেটা তুমি মেনে নাও। তাহলে তুমি সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে পারবে। যদি ওটা ছেড়ে দিই আমরা, তাহলে কি হবে? সে বিষয়ে বলছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যারা শাস্ত্রের এই **Theory- Universal Truth, Axiomatic Truth** মানবেন না—অস্বীকার করবেন, তাদের ইহকালেও কোন শান্তি নাই, পরকালেও শান্তি নাই। সুখ-শান্তি কোনটাই মিলছে না তাদের। সুতরাং তত্ত্ববিভ্রম যখন হবে তখন শাস্ত্রেরই শরণ—আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, বাস্তবসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের **Judgement** এ আমরা যথাযথ বিচার পেয়ে যাবে। তখন সত্য-মিথ্যার নির্ণয় যথার্থ করতে পারব।

(ক্রমশঃ)

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করতে করতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

"শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।"

—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

স্তব্ধ হয় নাই পৃথিবীর গতি। অনন্ত কাল-প্রবাহ অবলম্বনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে গতিস্রোত তার আবর্ত্তমুখে কত শত সৌরজগৎ, কত শত সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আবার মিলাইয়া গিয়াছে। সীমাহীন মহাব্যোমে কত শত জ্যোতিপুঞ্জের একবার উদয় হইতেছে, আবার তাহা লয়ও পাইতেছে। জগতের বুকে কত শত দেশ, কত রাজ্য, রাজধানী, জাতি, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির উদ্ভব হইতেছে, আবার অন্তর্দ্ধানও ঘটিতেছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই অবিরাম প্রবাহ অবিরত ছুটিয়া চলিতেছে। কাল যে নিরন্তর প্রবাহমান। এহেন কালের মস্তকে পদপ্রহার করিয়া প্রত্যেক বৎসরই আগমন করে—'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী'।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)

লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী-তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ও আনুগত্যে বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনাসহকারে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বপ্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী গত ৩রা ভাদ্র, ১৩৯৯ (ইং ২০।৮।৯২) বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি-শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন।

এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিভিন্ন রঙ্গীন পতাকা লইয়া একই পোষাক পরিহিত যুবকগণ স্কুটারে যাত্রা করেন। তৎপরে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট বালক-বালিকারা পতাকাহস্তে চলিতে থাকেন। এঁদের পশ্চাদ্‌ভাগে সুসজ্জিত মোটর গাড়ীতে শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্য এবং ছোট বালক-বালিকাদিগকে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, সুদর্শনচক্রধারী কৃষ্ণ, বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, মাখন-চুরি, কংস-বধ, বজরঙ্গবলী" প্রভৃতি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করিয়া চলন্ত গাড়ীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কয়েকটী গাড়ীতে কীর্ত্তনদল মহামন্ত্র ও ব্রজের বিভিন্ন ভজন-কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত পদব্রজেও বহু কীর্ত্তনদল ছিলেন। ব্যাণ্ডসহযোগে এই শোভাযাত্রা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনদল যখন শহরের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছিলেন তখন বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার উপর হইতে উৎসুক জনসাধারণ পুষ্প ও ফল-মূলাদি বর্ষণ করিতেছিলেন। এই প্রাণাকর্ষী ও নয়ন-মনোহারী শোভাযাত্রা

দর্শন করিয়া শিলিগুড়িবাসিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন এবং সকল শ্রেণীর জনসাধারণ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

কিন্তু শেষে প্রকৃতিদেবীর ইচ্ছায় বারিবর্ষণ আরম্ভ হইলেও সেই বারিধারার মধ্যে ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নগর-পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। নগর-পরিক্রমান্তে পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী সকলকে খেচরান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে অর্থাৎ ৪ঠা ভাদ্র, (ইং ২১।৮।৯২) শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিকান্তে সারাদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হয়। বিকাল ৪ ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে হিন্দীভাষী মহিলাগণ ব্রজভাষায় বিভিন্ন ভজন-কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মঠবাসী ব্রহ্মচারিবৃন্দ মহাজন-পদাবলী ও ব্রজের বিভিন্ন ভজন-কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তী" সম্পর্কে শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ভজন-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ১২টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাবমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, আরতি ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। তৎপরে উপস্থিত সকল ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

নন্দোৎসব-দিবসে (৫ই ভাদ্র, ইং ২২।৮।৯২) সকাল হইতে হিন্দীভাষী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ছোট বালক-বালিকাগণের মধ্যে লজেন্স, ফলমূলাদি, খেলনা প্রভৃতি বিতরণ করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে আগন্তুক দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে ভক্তগণ মুহুর্মুহু শ্রীগুরুবর্গের ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের সার্ব্বিক উন্নতি কামনা করেন।

তিনদিনব্যাপী এই মহোৎসবের সংবাদ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ', 'সংবাদ সকাল', 'পূর্ব্বাচল ভারত দর্পণ' ও 'জনপথ সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সকল অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ভি. ডি. ও. ফিল্মে ধরা হয়। নন্দোৎসব-দিবসে রাত্রে উক্ত ছবি প্রদর্শন করানো হয়। এই মহোৎসবে স্থানীয় সকল জনসাধারণ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সহযোগিতা করিলেও শ্রীরমেশ চাচানজী-পরিচালিত 'শ্রীপঞ্চমুখী বালাজী ভজন মণ্ডল' (মাড়োয়ারী সংস্থা) শোভাযাত্রায় বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ তথা শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুনীল পাল চৌধুরী মহাশয়ের সেবাপ্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়)

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ২০।৮।৯২ তারিখে সুদৃশ্য তোরণদ্বারের সহিত শ্রীমঠকে বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। ২১।৮।৯২ তারিখ অর্থাৎ শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে এক বিশেষ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন-সহযোগে শহরের বিশেষ বিশেষ রাজপথগুলি পরিক্রমা করেন। উক্ত তিথিতে সারাদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ করা হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এক মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম্ম"। উক্ত ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ যতি মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, Prof. T. K. Das—Tura Govt. College, Prof. Sirish Misra—Don Bosco College, Shri R.N. Pandey—Headmaster, Tura Hindi High School প্রমুখ বক্তৃমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি-মহারাজ দার্শনিক বিচারমূলক বক্তব্যদ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয় সুললিতকণ্ঠে রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। উক্ত দিবসে রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারীকর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা "Janmastami—its Significance" তুরার Radio Centre হইতে relay করা হয়।

২২।৮।৯২ অর্থাৎ শ্রীনন্দোৎসবের দিন দ্বিপ্রহরে ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় সন্ধ্যা ৭ টায় মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার বাণী"। উক্ত সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ যতি মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, Prof. Girish Kumar—Don Bosco College, Prof. K. P. Chowdhury—Tura Govt. College প্রমুখ বক্তৃমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির আসনে অলঙ্কৃত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

২৩।৮।৯২ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English Medium School) ছাত্র-ছাত্রীগণ একটী Cultural Function-এ নৃত্য-গীত, আবৃত্তি-নাটক প্রভৃতি পরিবেশনদ্বারা দর্শকিগণকে প্রচুর আনন্দদান করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ যতি মহারাজ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জন্মাষ্টমীর একটী বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—"মূর্ত্তি-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শনী।" এই উৎসব সুসম্পাদনে শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্বেতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবটকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রশান্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

শ্রীসমিতির কলিকাতাস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠপ্রাঙ্গন ও শ্রীমন্দির বিচিত্র রঙ্গীন বস্ত্র, কাগজ, বৈদ্যুতিক বাতি ও ফুলমালা-দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের মধ্যে ৮টী স্টলে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনীগুলি দর্শন করিতে বহু জনসমাগম হইত।

জন্মাষ্টমী-দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণ সারাদিন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বরূপ বাবাজী মহারাজ (শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ মথুরা) পাঠমুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রাত্রি ১২টায় শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেকান্তে ভোগরাগ ও আরাতি সম্পন্ন হয়। তদনন্তর উপস্থিত উপবাসী সকল ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদ বিতরন করা হয়।

নন্দোৎসব-দিবসে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। এই মহোৎসব বৃহদাকারে কারবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাবের জন্য কর্তৃপক্ষগণ তাহা করিতে পারেন নাই। শ্রীমঠের সেবকগন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বলাবাহুল্য, এই জন্মাষ্টমী-মহোৎসব শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও সকল শাখামঠ-সমূহে বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ

৬ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৯৯, ইং ১৬/১১/৯২

৯ম সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীমদীশ্বরী-কুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী দৈত্যকে বিনাশ করিলে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর পরিহাসগর্ভ বাক্যে [অর্থাৎ—তুমি ব্রজরাজনন্দন হইয়া বৃষাসুর বধ করায় তোমার গো-হত্যা-জনিত পাপ হইয়াছে; রাজকৃত পাপ প্রজাসকলকেও স্পর্শ করে, অতএব

আমাদের যে পাপ হইয়াছে তজ্জন্য আমাদিগকেও সর্ব্বতীর্থের জলে অভিষেক-দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে।] নিজের সমস্ত সখীগণের সহস্তানীত জলে পরিপূর্ণ হইয়া যে রাধাকুণ্ড শ্রীনন্দনন্দনকর্ত্তৃক আমোদপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই অতি রমণীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
ত্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

যে রাধাকুণ্ড, স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়-ক্ষেত্রে চন্দ্রা-রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের বাঞ্ছাতিশয়দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রেমকল্পতরু উৎপাদন করেন, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

অন্যের কথা কি বলিব, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণও মানিনী শ্রীরাধার বিস্তৃত প্রসাদ-জনিত কটাক্ষ লাভের আশায় স্নান-সেবানুসন্ধান-হেতু সযত্নে যে রাধাকুণ্ডের অনুসরণ করেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥

ব্রজের মধুর রসাশ্রিত কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় যাহা ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেমভাজন, এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকর্ত্তৃকই শ্রীরাধার নামদ্বারা প্রচারিত অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ড' এই নামে প্রকাশিত, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সূনোঃ।

সদপি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

এ জগতে বিবেকাদিশূন্য ব্যক্তিও যে রাধাকুণ্ডের সেবানুগ্রহে তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াস্পদরূপ প্রেম-কল্পলতিকা হইয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্পসমৃদ্ধি-লাভে প্রশংসনীয় হন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্লৃপ্ত-নামান উচ্চৈ-
র্নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধার নিজ-পরিজনবর্গ অর্থাৎ শ্রীললিতাদি সখীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নাম-বিশিষ্ট, [অর্থাৎ—পূর্ব্বতটে চিত্রা-সুখদ-কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদ-কুঞ্জ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত] এবং সখীগণের বিভাগক্রমে পরিজনবর্গকর্ত্তৃক আশ্রিত, ভ্রমর-গুঞ্জনরম্য, সকলের বাঞ্ছনীয়, মধুররসের উদ্দীপক যাহার তটস্থিত নিকুঞ্জ-সমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

তট-ভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি-হৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা ।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

যাঁহার তট-প্রদেশস্থ উত্তম-বেদিকার উপরিভাগে ঈশ্বরী শ্রীরাধিকাদেবী প্রাণ-সখীগণের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্বন্ধীয় অতি মধুর বার্তাসমূহ পরস্পর বাক্-চাতুর্য্য-সহকারে প্রকাশ করিতেছেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে ।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

উত্তম কমল-সৌরভযুক্ত মনোহর সলিল-পূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল প্রমত্ত হইয়া প্রেমমত্ত সখীগণের সহিত অতিরঙ্গে প্রত্যহ বিহার করিতেছেন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু-কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি-দাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ-শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

যিনি শ্রীরাধার নিয়ত-উল্লাসদায়ী দাস্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার এই মনোহর কুণ্ডাষ্টক নির্ম্মলচিত্তে সর্ব্বতোভাবে পাঠ করেন, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া পরম-হর্ষযুক্তা প্রেয়সী শ্রীরাধাকে সেই সাধকের এই শরীরে অবস্থিতিকালেই দর্শন লাভ করাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর]

৫। শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীগৌর-গদাধরে শ্রীরাধা-মাধব-দর্শন কিরূপ ?

"হা হা মোর গৌরকিশোর !
কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুম বনে,
দেখা দেখিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ, কুঞ্জের ভিতরে,
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন বরণ, চাঁচর-চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি' ॥
দেখিতে দেখিতে, **শ্রীরাধামাধব,**
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,
গলেতে মোহন মালা ॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী, সদয় হইয়া,
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুহে নিবেদিবে, দুহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি' ॥"

—'প্রার্থনাময়ী লালস', কঃ কঃ

৬। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীস্বরূপ ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু'র স্বরূপ ও সেবা কি ?

"স্বরূপগোস্বামী—ললিতাদেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৪১

৭। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরের কি অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ?

"স্বরূপ গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গান-বিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর' নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর' নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১০।১১৬

৮। মধুর রসের ঐকান্তিক নামাশ্রিতগণের গুরুপাদপদ্ম কে ?

"হরি হে !

"শ্রীরূপ গোঁসাঞি,　　　শ্রীগুরু-রূপেতে,
　　শিক্ষা দিল মোর কানে।
জান মোর কথা,　　　নামের কাঙ্গাল,
　　রতি পাবে নাম-গানে॥"

—'ভজনলালসা' ৯, শঃ

৯। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীরূপ কি তত্ত্ব ?

"শ্রীরূপ মঞ্জরী,　　　সঙ্গে যাব কবে,
　　রসসেবা-শিক্ষা তরে।
তদনুগা হ'য়ে,　　　রাধাকুণ্ড-তটে,
　　রহিব হর্ষিতান্তরে॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ', গীঃ

১০। শ্রীগৌরলীলার ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকরগণ পরস্পর কোন্ লোকে অবস্থান করেন ?

"মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণ-পীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয় পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে

তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।" —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। শ্রীমহাপ্রভু কিরূপভাবে নিজ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।" —'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১২। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কোন্ পার্ষদের উপর কি সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছেন ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন। * * শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন; শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৩। শ্রীগৌরভক্তগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-রসের বৈশিষ্ট্য কি অবগত আছেন ?

"ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীনারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্য-মূলক কৃষ্ণদাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন।"

—'শ্রীঅর্থপঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আত্মবস্তুজ্ঞানে—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীনারায়ণ তাঁর বৈভব-বিগ্রহ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বৈভব-প্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে হয় নাই। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এ'সব না জেনে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভুল করি—তখন সংসারে মিত্রতা, শত্রুতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অসতে 'সৎ' ভ্রম হয়।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ সম্পূর্ণ চেতনময়। অচিৎপর বস্তু—অচেতন, ভগবদ্বস্তু—সৎ। ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে স্বয়ং ব্রহ্ম মনে করি। তখন সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত প্রভৃতি কুতর্ক হৃদ্দেশ অধিকার করে, তখন চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম চিন্ময়—আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনতার ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্মিতায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়-বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আনন্দের পূর্ণতা নেই। এখানে সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে পরিচালিত হ'য়ে মনে করি—অহংগ্রহ-উপাসনায় বা পঞ্চাঞ্জলির কৈবল্যলাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। আনন্দ-প্রয়াস আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণদর্শনেই কৃষ্ণসেবা নিত্য ও প্রয়োজনীয় ব'লে ধারণা হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানাবিচারে আবদ্ধ থেকে ভোগবাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয়দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্য বস্তু নহে। যে-দিন চিদানন্দ নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর তৈলধারার ন্যায় উপস্থিত হ'বে, সে দিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধন হ'বে।

বর্ত্তমান কাল কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কুতর্কাদি, বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধা ভক্তির বিচার জানা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণ—ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—

আনন্দময় অধিষ্ঠান উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মজীবী নানা-প্রকারে ভগবদ্‌বস্তু না জে'নে অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে। ইন্দ্রিয়জ দর্শনে ভোক্তা-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জে'নে মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসে হয় না—চেতনে হয়। পরমাণু-বাদে ভগবানের সেবা হ'তে পারে না।

সবিশেষ-বিচারে পরতত্ত্ব বস্তু নারায়ণে ও স্বয়ং বস্তুতে পার্থক্য আছে। সান্ত-প্রতিম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রই পরতত্ত্ব বস্তু। বলদেব বৈভবপ্রকাশ পরমাত্মবস্তু। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে বুঝ্‌বো—কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, আনন্দময় বস্তু। সেখানে মর্য্যাদার অন্তরায় নেই। মর্য্যাদার পূজ্য-পূজক-বিচারে সম্যক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সেবকের নিত্য সেব্যবস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁ'র সেবা ক'রতে হ'বে, মনের কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য ব'লে যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই। "কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড়-প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের করুণা লক্ষ্য ক'রে থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হ'লেও তাঁহারা ভগবানের করুণা ব্যতীত আর কিছু দেখেন না। ঐ অবস্থায়ও তাঁ'দের রোগনির্ম্মুক্তির জন্য প্রার্থনা নাই, ঐ অবস্থায়ও তাঁ'রা সেবাই প্রার্থনা ক'রে থাকেন; কোন অবস্থায়ও তাঁ'রা সেবা-ব্যতীত থা'কতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবানকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন। আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'রতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারগণকে পাই। সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'রতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান যা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন; সৌন্দর্য্য না থা'কলে—যোগ্যতা না থা'কলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ালুচিত্ত বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা ক'র্‌তে হ'বে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা হয়, তা'হ'লে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হ'লে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় না; তা'তে তা'দের বদ্ধদশার ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট

শ্রবণ ক'রলে এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা—ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থেকে আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রা'খবে।

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কান দিয়ে শুনতে পারেন। নমস্কার ক'র্‌বার তিনটী অবলম্বন—কায়, মন, বাক্য। আনুগত্য ধর্ম্ম শু'ন্‌বার কাণ দিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শু'ন্‌তে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সেইসব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুন্‌তে হ'বে। নিত্যকাল স্থায়ী কথা শ্রবণ ক'রতে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধু বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন – যে কথা অপরিবর্ত্তনশীল। আমরা যে পার্থিব জ্ঞানলাভ করি পরে উহার অসম্পূর্ণতার সমাধান করি। উত্তরোত্তর বেশি অভিজ্ঞান লাভ কর্‌বো—বরাবরই মনে করি কিন্তু সকল সময়েই মনে করি যে, পরে ও যা' শুন্‌বো, তাও অসম্পূর্ণ হ'বে—পরে আবার তা' ওলট্‌পালট্ কর্‌বো—তদ্দ্বারা আশা পূর্ণ হবে না—অভিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হ'য়েও কিন্তু কখনই পূর্ণতা সাধিত হ'বে না।

যে সমুদয় কথাতে মানবজাতি উন্নত হবেন আশা ক'র্‌ছেন, সেগুলো পূর্ণতার দিকে যা'চ্ছে না—অভাবের দিকেই যা'চ্ছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অবলম্বনে সত্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় বুদ্ধি অবলম্বন করে অদ্যাবস্থিত অবস্থা থেকে অব্যাহতি পা'ব না। ইন্দ্রিয়ানুশীলন চেষ্টাদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তা' ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মতন। অদ্বয়বস্তুর কথা—যা' সাধুগণ বলেন, তা' সেরূপ নয়। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের কথা গ্রহণের চেষ্টাদ্বারা সুবিধা হয় না। এরূপ যে জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি শব্দ সাহায্যে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে রকম মূর্খই থাকি না কেন, যদি মনোযোগের সহিত একমাত্র সত্যের কথা শু'ন্‌বার সুযোগ হয়, তা'হলে আরোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি – রাবণের সিঁড়ি বাঁধার চেষ্টা ছাড়্‌তে পারি।

'হে ভগবান্, তোমাকে জয় করা যায় না – সমগ্রজ্ঞান আমাদের লাভ হয় না; আরোহ-চেষ্টাদ্বারা আমরা আংশিক জ্ঞান লাভ করি। তোমাকেও জয় ক'রে অদ্বয়জ্ঞান তাঁ'র করায়ত্ত হয় – যে ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে মনোযোগের সহিত তোমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন।' এই পদ্ধতিদ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের সমুদয় অসম্পূর্ণতা অতিক্রম ক'রতে পারি। ব্রহ্মা এই কথা ব'লেছিলেন।

যদি আমরা 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সত্য কথা ব'ল্‌লে কেহ ভিক্ষা না দেয়, সেরূপ পাপিগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যারা কিছুতেই সত্য কথা নিবে না, সেরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'র্‌তে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হলে তা' গ্রহণ কর্‌তে যা'ব কেন?

প্রমাণ ও প্রমেয়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯১ পৃষ্ঠার পর]

ঈশাবাস্য বলেন (১৫শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শুদ্ধভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনদ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৫।১৪-১৫)—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয়দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মরূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা।

অন্বয়ক্রমে ছান্দোগ্য (৮।১।২, ৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্রে) বলিয়াছেন, —

তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। স ব্রূয়ান্নস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ইতি। এব আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি।

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্পসন্নিভ একটী অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতার সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২য় শ্লোক)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে-সকল চিৎকণজীব তথায় আছেন বা গমন করেন, তাঁহারা পাপপুণ্যশূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক,

ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প; এইরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয় সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এস্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

বেদাহমেতাং পুরুষং মহান্তং আদিতবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮; ১৬)

এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই।

ভগবান্ নিরিন্দ্রিয় নহেন

শ্রীভগবানের হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর (৪।২০) মন্ত্রে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

ইঁহার রূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চক্ষুর দ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন (৬।৭),—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং
দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

তুমি ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৫ পৃষ্ঠার পর]

শিষ্যব্রুবের পরিণাম ও দুর্দ্দশা।

শ্রদ্ধার সহিত সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে ভগবদর্চ্চন ও ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করত শিষ্য গুরুকৃপায় ভগবৎসাক্ষাৎকার—ভগবৎপ্রেম লাভের অধিকারী হন। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, ভগবৎ-প্রেমপ্রদাতা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও যদি শিষ্যের ভজন-বিষয়ে ক্রমোন্নতি ও অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারই উহার প্রধান কারণ। এ অবস্থায় শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে। সাধু-গুরু-উপদিষ্ট মত ও শাস্ত্রীয়বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত হরিভক্তির নূতন পন্থা আবিষ্কার করে! গুরূপদিষ্ট শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া বিধিমার্গ পরিত্যাগ করত অন্যায়ভাবে সিদ্ধ ও মুক্তাভিমানে রাগমার্গে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং অনর্থগ্রস্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধীর সঙ্গের দ্বারা সে অর্চ্চন-বিষয়ে সেবাপরাধ, ভজন-বিষয়ে নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে। নামাপরাধফলে শ্রীল গুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রেমভক্তিদ শ্রীনাম-গ্রহণে তাহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ কমিয়া যায় এবং নামের আনুসঙ্গিক ফললাভে ও বঞ্চিত হয়।—

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি 'অপরাধ' তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৬, ২৮-৩০)

শিষ্যব্রুবের লক্ষণ :—অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার-রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া

অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ-সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তি শিষ্যপদ হইতে ভ্রষ্ট।

সাক্ষাৎ গুরুসেবা সম্বন্ধে অসৎ শিষ্যের ব্যবহার:—গুরুসমীপে পদ-প্রসারণ, গুরুর অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, আস্ফালন, গুরুর সম্মুখে উচ্চবাক্য প্রয়োগ, যেখানে-সেখানে গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন-বচন-ক্রিয়ার অনুকরণ, গুরুর বাক্য-আসন-যান-পাদুকা-বস্ত্র-ছায়া লঙ্ঘন, গুরু-সমীপে পৃথক্ পূজা, 'আমি যাহা, গুরুও তাহা'—এরূপ অহংভাব, গুরুদেবকে আদেশকরণ, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন, গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া বস্তু গ্রহণ, গুরুদেবের দ্রব্য ভোজন, গুরুদেবের আগমনে অভ্যর্থনা না করা ও গমনে তদনুগমন না করা, গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, তাঁহার শয্যায় উপবেশন, গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলা, গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ, গুরুনিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গই গুরু-চরণে অপরাধী-শিষ্যের কৃত্য হইয়া পড়ে।

(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুন-লীলা—এ সকলকে বিষ্ণু হইতে পৃথক্ জ্ঞান এবং শিবাদি অন্য দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর এরূপ জ্ঞান, (৩) শ্রীনামদাতা গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম মহিমাসূচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) শ্রীনামের মহিমা 'কেবল স্তবমাত্র' এরূপ চিন্তা, (৬) শ্রীনামকে কল্পিত জ্ঞান, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীনামকে জড় পুণ্য ও শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানে শ্রীনাম-অনুশীলন—পতিত সেবক এই **দশবিধ নামাপরাধের** আবাহন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা-বঞ্চিত হয়।

(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও দর্শনার্থীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) ধাম-সেবাছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ উপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্যতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাসের ছলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ জ্ঞান, (৯) ধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—অসৎ শিষ্য এই **দশবিধ ধামাপরাধ** সঞ্চয় করিয়া ধামবাসের অযোগ্য হয়।

(১) যান—শিবিকাদিযোগে এবং পাদুকা পরিধান করিয়া ভগবদ্গৃহে গমন, (২) ভগবৎ-প্রীত্যর্থে শ্রীভগবানের জন্ম-যাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, (৬) পাদ প্রসারণ, (৭) পর্য্যঙ্ক-বন্ধনপূর্ব্বক হস্তদ্বয়দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন-পূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চ-ভাষণ, (১২) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, ১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, (১৮) পরনিন্দা, (১৯) পরস্তুতি, (২০) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, (২১) অপান বায়ু পরিত্যাগ, (২২) অন্যকে অভিবাদন, (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৪) তাম্বুল চর্ব্বণ, (২৫) উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, (২৬) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি, (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে ও অল্পব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি, (২৮) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, (২৯) কালোচিত ফল-শস্যাদি দ্রব্য ভগবানকে অপ্রদান, (৩০) দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট ভগবানকে প্রদান, (৩১) দেবতা নিন্দা, (৩২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৩৩) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, (৩৪) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, (৩৫) কুক্কুরদ্রষ্ট দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন, (৩৬) পূজাকালে অসদালাপ, (৩৭) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৩৮) অযোগ্যপুষ্পে পূজা, (৩৯) স্ত্রী সম্ভোগান্তে পূজা, (৪০) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪১) শব স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪২) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা, (৪৩) মৃত দর্শনান্তে পূজা, (৪৪) ক্রোধ-শোকাভিভূত হইয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ, সেবা ও পূজা, (৪৫) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা, (৪৬) গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, (৪৭) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৪৮) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা, (৪৯) বাসী বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৫০) পূজাকালে নিষ্ঠিবন ত্যাগ, (৫১) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, (৫২) তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ, (৫৩) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৪) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৫৫) অবৈষ্ণব পাচিত অন্ন শ্রীভগবানকে নিবেদন, (৫৬) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৭) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা, (৫৮) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৫৯) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন, (৬০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬১) ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্ব্বক রাজসিক-তামসিক অসৎশাস্ত্রে সমাদর, (৬২) মৃত্তিকাহীন

শৌচ, ৬৩ দাঁড়াইয়া আচমন, ৬৪) সমর্থপক্ষে স্নান বর্জ্জন, (৬৫) দেবার্চ্চনে শৈথিল্য, ৬৬) দেবতার অনভ্যর্থন, (৬৭) বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন, (৬৮) মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন, (৬৯) ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা, (৭০) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন, (৭১) দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, (৭২) চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি, (৭৩) আয়স্ ধূপপাত্র ব্যবহার, (৭৪) অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা, (৭৫) চঞ্চল চিত্তে অর্চ্চন, (৭৬) একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, (৭৭) পর্য্যুসিত অন্ন নিবেদন, (৭৮) পূজায় মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণ-কাল স্বীকার, (৭৯) অসময়ে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, (৮০) অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ প্রভৃতি **সেবাপরাধ** এবং ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন, ২। শোকাভিভূত হওয়া, ৩। তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি, ৪। মদ্যপান ও মৎস্য-মাংস ভোজন, ৫। মাদক ঔষধ সেবন, ৬। মসুরীসহ অন্নগ্রহণ, ৭। পেঁয়াজ, রশুন, গাজর ভোজন, ৮। সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রার্থ প্রকাশ, ৯। অবৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ, ১০। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান, ১১। দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত গ্রহণ, ১২। শুক্ল-কৃষ্ণত্রয়োদশীতে ভেদবুদ্ধি. ১৩। একাদশীতে নিদ্রা, ১৪। সমর্থপক্ষে অনুকল্প স্বীকার, ১৫। একাদশীতে শ্রাদ্ধ, ১৬। দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, ১৭। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তুদ্বারা শ্রাদ্ধ. ১৮। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী, ১৯। অবৈষ্ণব ও রাক্ষস শ্রাদ্ধ ২০। মন্ত্রের অসংখ্য জপ—ইত্যাদি **নিষিদ্ধাচারের** অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়া দাম্ভিক, দেহারামী কুকর্ম্মী, অশান্ত, পরনিন্দক, পতিত শিষ্যব্রুব হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা ও ভগবদ্ভক্তি লাভে অসমর্থ হয়।

অসৎ শিষ্য সততই অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ও সংশয়াত্মা; শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতাবিষয়ে —তাঁহার পতিত ও পাতকীতারণের ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং ভগবৎপ্রা প্ত করাইবার সামর্থ্য বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহার সন্দেহ। তাই সে গুরুপাদাশ্রয়ের ভাণ করে মাত্র। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুরুকে চিনিয়া লইতে পারিবে—মনে করে এবং অন্যাভিলাষের সহিত গুরুসেবার ছলনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহে। গুরুদেবের সম্মুখে সে নিজেই নিজের প্রশংসা কীর্ত্তন করে। গুরুদেবের মঙ্গলময়ী বাণীর প্রতিবাদ ও আদেশের অবমাননা করিয়া নরকগতি লাভ করে। 'আমি অধিক বুঝি, গুরুদেব আমায় আর অধিক কি উপদেশ দিবেন ?'—এইরূপ অহঙ্কার ও অপরাধবশতঃ সে অধঃপতিত হয়।

শিষ্যব্রুব গুরুদেবকে তাহার ন্যায় কর্ম্মফলাধীন মর্ত্ত্য-জীববিশেষ ও শোক-মোহাদির বশীভূত মনে করিয়া তাহার নিজের অকল্যাণ বরণ করে এবং সেই শিষ্য-ব্রুবের শ্রীনামকীর্ত্তন, ভূয়সী সেবাচেষ্টা, ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও

শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সকলই বিফল হয়। গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধীজনের সঙ্গই তাহার রুচিকর হয় এবং সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও নিন্দায় সে পঞ্চমুখ হয়। গুরুদেব একগুঁয়ে, অদূরদর্শী অবুঝ, 'একচোখো' ও অবিচারক—তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব আছে বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করে। বৈষ্ণবসেবাশিক্ষা-ব্যাপারে তাঁহার অন্তর্নিহিত সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কটাক্ষ করে, গুরুদেবের গতি, স্বর, চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, চাল-চলনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

তথাকথিত শিষ্যাভিমানী গুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কারে স্ফীত হয়। গুরুদাসকে গুরু হইতে পৃথক্ ভাবিয়া বা সেবকের দোষ গুরুতে আরোপ করিয়া প্রকৃত গুরুদাসগণের নিন্দা করত গুরুনিন্দায় পতিত হয় এবং ক্রমশঃ ভজন-ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন হইয়া সে গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিহীন এবং ক্রমশঃ ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়ে। সে নিজে অন্যায় করিয়া বিচারপ্রার্থী হয় এবং আপন সহস্র দোষ ঢাকিবার জন্য পরছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্তি লাভ করে। "যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)—ইহা জানিয়াও সে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ একান্ত সেবকের মধ্যে "একে মানি' আরে না মানি"—"একে নিন্দি', আরে বন্দি" এইরূপ 'অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় অবলম্বন করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়।

গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত নিজচেষ্টায় বহুগ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা সকলতত্ত্ব বুঝিয়া লইবে মনে করে। বৈষ্ণবাভিমানী হইয়া সে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি বিধানের পরিবর্ত্তে উহা নিজেই আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পায়। তৌর্য্যত্রিকের আশ্রয় লইয়া সে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির আড়ম্বরে উন্মত্ত হয়। দাম্ভিকতা আশ্রয় করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাদিষ্ট না হইয়া স্বেচ্ছায় শাস্ত্রব্যাখ্যার অজুহাতে বৈষ্ণবগণের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করে। বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশের অপেক্ষা না রাখিয়া সে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, গ্রন্থাদি আলোচনা ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য জাহির করে। 'অন্তরনিষ্ঠা কর' বাক্যের সুযোগ লইয়া সুবিধাবাদী বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া উত্তমাধিকারীর আসন গ্রহণে ব্যস্ত হয়। দাম্ভিক শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবের সম্মুখে মিথ্যাভাষণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, সতীর্থগণের সহিত কলহ, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। দেহারামী শিষ্য গুরুবৈষ্ণবের সেবার যোগ্য নিজ প্রিয়বস্তু তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে। সে শাস্ত্রীয় বিধি ও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবিগ্রহার্চ্চন ও হরিসেবার বাহাদুরী দেখায় এবং নিজে বড় অর্চ্চক ও সেবক অভিমানে প্রমত্ত হয়। শিষ্যব্রুব দুর্ভাগ্য-বশতঃ গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি লাভ না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন

করে এবং বৈষ্ণবের দোষানুসন্ধানে রত হইয়া 'মক্ষিকার ব্রণানুসন্ধানের' স্বভাববশতঃ অবশেষে গুরুপাদপদ্মাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়।

সুবিধাবাদী শিষ্যব্রুব 'আমি গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হইব, মঠের পয়সায় প্রাকৃত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিব, আমার কোন প্রকার অভাব থাকিবে না, সুখে-শান্তিতে আমার দিন কাটিবে'—প্রভৃতি অবান্তর ফল কামনা করিয়া গুরু-ভগবানের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্যরূপ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা না দেখিয়া সে অন্যের নিকট ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করে এবং স্বশ্রী-কাতর হইয়া শ্রীগুরুদেবের বৈভব—সতীর্থ-মঠ-মন্দির ধর্ম্মপ্রচারাদির সমালোচনাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ সঙ্ঘ-মিশনের শতমুখী প্রশংসা করে। সে কর্ম্মার কাণাকড়ি আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মজড় হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কর্ম্মের বহ্বাড়ম্বর না দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নিকট নিজের কর্ম্মের বাহাদুরী খ্যাপন করে ও তাঁহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠাকামী অসৎশিষ্য গুরুদেবের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠাপর তোষামোদী মনযোগান কথার পরিবর্ত্তে পারমার্থিক কল্যাণকর কঠোর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করত গুরুনিন্দায় অগ্রসর হয় এবং হরিভজন হইতে ছুটী লইয়া মায়ার সংসারে প্রবেশের যত্ন করে। তখন তাহার এইরূপ বুদ্ধি হয়—মঠ-মন্দিরাদি-গুরুগৃহে থাকিয়া যদি কেবল অপরাধেরই সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে অপরাধের আর ভয় থাকিবে না! অনর্থগ্রস্ত বিষয়াসক্তচিত্ত শিষ্যব্রুব বসিয়া থাকে—জগতে কি আর সদ্গুরু আছেন! সদ্গুরু এখন আর পাওয়া যায় না! দেখনা, গুরুর অযোগ্যতার দরুন (?) আমার এতকাল ধরিয়াও হরিভজন (?) হইল না! কতকাল মঠে বাস করিলাম, কত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, ভগবানে প্রীতি ও সংসারক্ষয় ত' দূরের কথা! সেই একই কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ!—"দেহ কিছু নয়—মন কিছু নয়—আত্মাই সব! কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ কিছু নয়—ভক্তিই সব!" এইরূপ অবৈধ গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক বিচারে কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? "ফোঁটা-দীক্ষা-মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই এবে আমার বিরাগ।" হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্যাভিমানী এইরূপে দম্ভাহঙ্কারবশে হরিভজন হইতে বিরত হইয়া তাহার সর্ব্বনিকৃষ্টতম অধোগতি—নরকের দ্বারস্বরূপ সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া চরম-দুর্দ্দশা বরণ করে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

প্রাকৃত কর্মী ও শুদ্ধ ভক্তের পার্থক্য বিচার

এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা কয়েকটী কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া ও আপনাকে অযথা ভোক্তৃতত্ত্বে আরোপ করিয়া অহংকর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বক আমরা কয়েকটী ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকাকাল পর্য্যন্ত আমাদের ঐ সকল পরিশোধ-কার্য্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। দেব, ঋষি ভূত, পিতৃও নৃগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পাল্য হইয়া পড়ে। এই ঋণ পরিশোধার্থে আমাদের তখন, পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হোমাদি দৈব যজ্ঞ-যোগে দেব-ঋণ পরিশোধিত হয়, অধ্যয়নাধ্যাপনাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞদ্বারা ঋষিঋণ, পশু-পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ ভৌত বলি নামক ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পোষণ এবং অন্নাদি ও উদকদ্বারা পিতৃলোকে তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞদ্বারা পিতৃঋণ এবং অতিথিসেবা, স্বদেশ সেবা, তড়াগ-খনন প্রভৃতি মনুষ্যযজ্ঞদ্বারা নৃঋণ পরিশোধিত হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্; হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্।। ----- দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ। ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন জীবতি।।"—(মনু ৩।৭০, ৭২)। 'অহং কর্ত্তা' এইজ্ঞান যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন এই পঞ্চঋণ পরিশোধ আমাদের কর্ত্তব্য. তাহার অকরণে প্রত্যবায় ঘটে। যে ব্যক্তি উপার্জ্জনাদিদ্বারা বা অন্যোপায়ে আত্মোদর-ভরণে ও স্ত্রী-সেবায় ব্যস্ত, সে যদি নিঃসহায় মাতাকে ভরণ-পোষণ না করে, সে পাপী ; সে যদি নরগণকে বিপন্মুক্ত হইবার সহায়তা না করে, তবে কর্ত্তব্য-হেলনজনিত তাহার দুষ্কৃত সঞ্চিত হয়। যাঁহাদের আমি ভোক্তা অভিমান থাকায় ভগবচ্চরণাপত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহারা নিজে কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে গাহিয়াছেন, —"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।" কার্য্যসমূহ ভগবন্নিয়মে কৃত হইল না বুঝিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অহংকর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে 'কর্ম্মী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহারা পঞ্চঋণে আবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যপালনের দায়ী হইয়া পড়েন। নৃঋণ পরিশোধের জন্য এইরূপ লোকে

আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

এই যে-সব কর্ম্মীর কর্ত্তব্য. এইগুলি জীবের কতদিন থাকে, এই বিচার করিয়া যখন ধীরচেতাঃ দেখিতে পান যে, ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কেবল যতদিন দেহ, ততদিন থাকিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সব যাইবে। আজ যে বাসনা-বশে এক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করা আবশ্যক মনে হয়, কল্য হয় ত' সে বাসনার লোপ পাইবে, অন্য বাসনা তাহার স্থান অধিকার করিবে. তখন তদুপযোগী আধিকারিক দেবতার প্রীণনে ব্যস্ত হইতে হইবে। আবার ঋষিগণের মত একমাত্র নহে,—যতগুলি ঋষি "ততগুলি মত"। সুতরাং অধ্যয়নাদি সকলের একরূপ নহে, এক-জনেরও সর্ব্বাবস্থায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থাভেদে ভূতযজ্ঞ বিভিন্ন প্রণালীর হইতে পারে। এ জন্মের পিত্রাদি পরজন্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আজ ইহারা আমার স্বদেশবাসী; কাল উঁহারা স্বদেশবাসী হইবেন, আজ ইঁহাদের জন্য যত্ন করিতেছি, কাল উঁহাদিগের প্রতি বিরোধ করিতে হইবে। ইহাদের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই কর্ত্তব্যগুলি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্মীর হিসাবে আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মীরা যাহাকে "আমাদের কর্ত্তব্য" বলেন, তাহা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং কর্ম্মীর ধারণাতে আমাদের কর্ত্তব্যের নিত্যত্ব নাই।

যাঁহারা সংসারকে দুঃখাত্মক দেখিয়া তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, মুক্তিই যাঁহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মুক্তিলাভের জন্য আমাদের যেগুলি কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়, মুক্ত জীবের পক্ষে সেগুলি কর্ত্তব্য-স্থানীয় নহে। বদ্ধ অবস্থায় দেব-দেবীর উপাসনাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে, যত ফল্গু বৈরাগ্য আশ্রিত হইবে, ততই সেই উপাসনা নিরর্থক হইবে। লক্ষ্য, ইহাদ্বারা নির্ম্মলীকৃত চিত্তকে উপাসনা-ধ্বংসাত্মক অদ্বৈত-সিদ্ধিতে আরোপ করিতে হইবে। এখানেও দেখা যায়, কর্ত্তব্যের তারতম্য-প্রকারভেদ লক্ষিত হয়, নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের কিছু দৃষ্ট হয় নাই।

শুদ্ধ ভক্তের বিচার কিন্তু অন্যরূপ। তিনি তাঁহার স্বরূপ বিভ্রমের হাত হইতে ছুটি করিয়া নিত্যস্বরূপ ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন। তাঁহার প্রাথমিক অবস্থা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, তাহা শ্রীভগবৎসেবা, আর উন্নত অবস্থায় সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া শ্রীভগবানেই সেবা করিতেছেন। উপায় শ্রীভগবৎসেবা,

আবার উপেয়ও শ্রীভগবৎসেবা। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইবার নহে। তাঁহার কর্ত্তব্য নিত্য ভগবদ্দাস্য। জীবের নির্ম্মল অবস্থাতেও ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া অন্য কর্ত্তব্যে কখনও ব্যাপৃত হন না। ভগবৎসেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভক্তসেবা ভগবৎসেবারই অন্তর্গত, কেন না, ভক্তসেবা ব্যতিরেকে ভগবৎসেবা মঞ্জুরই হয় না। সুতরাং ভক্তসেবার সহিত ভগবৎসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া যে-সকল অবান্তর কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্যরূপে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে করযোড়ে বিদায় দিয়া সাধু-গুরু-পদাশ্রয়ে নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ শুদ্ধভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, এই বিচার যে কালক্রমে জীবের হৃদয়ঙ্গত হইবে, তাহা কে ভরসা দিবে? শুদ্ধভক্তি-পথে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের উক্তিমত শ্রবণ-কীর্ত্তন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলে আমাদের কোন সুবিধা নাই।

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

নির্ভীক কে?

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব আমরা দৈবীমায়া-বিমোহিত হইয়া নিত্যস্বরূপের বিস্মরণ-হেতু 'স্থূল-সূক্ষ্ম দেহই আমাদের সত্তা'—এইপ্রকার উপলব্ধিতেই সকল কার্য্য করিয়া থাকি। অনেক সময় অনেকে বেদ-বেদান্তাদি আলোচনায় প্রভূত পরমায়ু নষ্ট ও বহু ক্লেশ স্বীকার করত কিংবা তদ্রূপ কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াও এবং মুখে ও মনে 'আমি দেহ মন নহি, আমি দেহ মন নহি, আমি আত্মা' —এইকথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া ও চিন্তা করিয়াও কার্য্যকালে দেহাত্মবাদিতারই পরিচয় দিয়া থাকে। বর্ত্তমান জগতে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও তথাকথিত ধার্ম্মিক এক কথায়, সকলপ্রকার মানবীয় চেষ্টা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে দেহাত্মবোধমূলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় শান্তির পরিবর্ত্তে মহা অশান্তির দাবানলই সর্ব্বত্র প্রবর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে। এই দেহাত্মবোধরূপ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের উপায়ও বর্ত্তমান জগতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কারণ ইহজগতে কর্ম্মফলবাধ্য জীব শতকরা শতজনই ঐ সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত তাহাতে আবার এক পাগল আর এক পাগলকে "পাগলামী করিস্ না" বলিয়া উপদেশ করার ন্যায়, এক রোগী আর এক রোগীকে চিকিৎসা করিতে গিয়া সাধারণ

জনসমাজে উদারতা ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিলেও প্রকৃত বিচারে উদারতার নামে ঔদরীকতা বা উদরভেদের এবং নিঃস্বার্থপরতার নামে শোচনীয় অপস্বার্থপরতারই পরিচয় প্রদান করে। কোন ব্যক্তি বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে ভীত হয়, কারণ তাহাকেও ঐ সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে—এই ভয়। এখানে স্বার্থপরতা বা দেহাত্মবোধই স্পষ্ট বা স্থূলাকারে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়, ঐ প্রকার বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত গ্রামের মধ্যে গিয়া নিঃস্বার্থভাবে (?) সর্ব্বপ্রকারে পরিচর্য্যাদি করিতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে দেহাত্মবোধ কোথায় থাকিল? নিজের দেহে আসক্তি থাকিলে কি কেহ ঐপ্রকার স্থানে গিয়া অন্যের উপকার করিতে পারে? কিন্তু একটু বিচার করিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, আপাত-দৃষ্টিতে দেহের প্রতি ঐপ্রকার অনাসক্তি দেখা গেলেও এবং তাঁহারা ভীরু ব্যক্তিগণের মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও অধোক্ষজ-তত্ত্বকোবিদ্‌গণ তদ্রূপকার্য্যে চেতনের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়, উহা যে দেহাত্মবোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা সহজেই ধরিয়া ফেলেন। কারণ যে-স্থানে আত্মার কোন উপলব্ধি নাই—সম্বন্ধ নাই, এমন কি, সে বিষয় কেহ বলিলেও প্রতীতি হয় না, তথায় দেহাসক্তি ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? অবশ্য পূর্ব্বোক্ত নির্ভীক ব্যক্তি দেহের চিন্তা করিতে করিতে ঐ চিন্তা প্রসারিত করায় অপর দেহ দেখিলে বিশেষতঃ ঠিক তাহার নিজের দেহের ন্যায় অর্থাৎ মনুষ্যদেহ দেখিলে এবং তাহা ভোগে অপটু দেখিলে তাহার বড়ই দুঃখ বোধ হয়। সেইজন্য আপাততঃ নিজের ভোগ ত্যাগ করিয়া বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক, এমন কি, নিজের দেহকে বিপন্ন করিয়াও তাহারই ন্যায় অপর বহু দেহ অবাধে বিষয় ভোগ করুক—এই বাঞ্ছা করে; কারণ ইহাতেই তাহার মনের শান্তি। অনেক স্থলে বহু লোকের প্রশংসাবাদও তদ্রূপ কার্য্যে ব্রতী করায়।

এইপ্রকারে মানব বহু ইতর কার্য্যে ধাবিত হওয়ায় বাস্তব সত্যবস্তু তাহার নিকট কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র যাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির উদয় হইয়াছে, ঐ প্রকারের শতকোটি বিভিন্ন বাধাও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। যাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ কোন মহাভাগবতের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে অর্থাৎ যদি কোন জীবকে কোন মহাভাগবতশিরোমণি স্বেচ্ছায় কৃপা করেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হয়। ঐপ্রকার মহাভাগবতের কৃপায়ই জীবের বহু বহু জন্মের কুসংস্কার, কু-অভ্যাস, কদাচার প্রভৃতি সমূলে

উৎপাটিত হইয়া যায়। একমাত্র নির্ভীক হইবার উপায় আমরা 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে'র প্রথমে ভজন-কর্ত্তব্যতা-প্রসঙ্গে সদ্বৈষ্ণবরাজ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আলোচনা করিতে পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

যেহেতু মায়া হইতে স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি, স্বরূপের অস্ফূরণহেতুই দেহাত্মবোধ, দেহাত্মবোধেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তাহা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি, সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই মায়াধীশ্বরেরই ভজন করেন। সেই মায়াধীশ সর্ব্বাবতারী যাঁহার নিত্য প্রেমবাধ্য, সেই জগদ্গুরুবরকে—শ্রীশ্রীআচার্য্যবরকে যিনি একমাত্র দেবতা, ঈশ্বর, জীবনের জীবন, প্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়াছেন তাঁহার কোটি সমুদ্র হইতেও গভীর স্নেহ-বাৎসল্য যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বাস্তবিক নির্ভয় হইয়াছেন। কারণ নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণই নির্ভীক। আর যাঁহারা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার', বলিয়া সমর্পিতাত্মা হইয়াছেন, "অশোক-অভয়-অমৃত-আধার তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়॥"—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত নির্ভীক। যাহারা আমার ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, কেবল মুখে কৃপাপ্রার্থনার অভিনয় করে এবং অন্তরে নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া চলে, 'যদি তাঁহাদের শক্তিই থাকে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তুই থাকে, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের আশ্রিত (?) হইয়া অন্যাভিলাষ ও কাম-ক্রোধাদি ছাড়িতে পারিতেছি না কেন?' ইত্যাদি ভাবিয়া সন্দেহাত্মা হইয়া ভোগসাগরে গা ভাসাইয়া দিয়া অনন্তকালের জন্য নরকের দিকে অভিযান করিতে থাকে, আবার কখনও বা অশরণাগত মনের সহিত পরামর্শ করিয়া আলো যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন অন্ধকার তাড়াইতে চেষ্টা করা যাক্ বলিয়া বৃথা প্রয়াস করিতে থাকে; এইরূপ চিত্তবৃত্তি থাকিলে মঙ্গল হওয়া বড়ই কঠিন। গুরুদেবতাত্মা হইলে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব সেবক-বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণই, তিনি কৃষ্ণপ্রেমময়, তাঁহার বজ্রাদপি কঠোরতা ও কুসুম হইতেও কোমলত্ব—উভয়ই মাদৃশ ভীতজনগণের ভয় দূর করিয়া নিত্য অশোক-অভয়-অমৃতরাজ্যে লইয়া যাওয়ার জন্যই—যখন এই বিচারে আমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, তখনই আমাদের আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা। তখন বুঝিতে পারিব পিতা যেরূপ অজ্ঞান শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল জানেন বলিয়া তাহার মঙ্গলের জন্যই এবং অন্তরে অত্যন্ত স্নেহযুক্ত বলিয়াই কখনও আদেশ, কখনও ভর্ৎসনা, কখনও বা বেত্রদ্বারা প্রহার

প্রভৃতি করিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু শ্রীআচার্য্যপাদও দেহাত্মবোধ, বিষয়গ্রন্থি প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া অকিঞ্চন করিবার জন্যই বিভিন্ন প্রকারে নিষ্কপট অনুগত জনকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনিই জানেন আমাদের কি-প্রকারে নিত্য কল্যাণ হইবে সেইজন্য যদিও তিনি নিত্যমুক্ত, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন করেন, তথাপি স্বয়ং অবতীর্ণ অপ্রাকৃত সেবা-বিগ্রহ ও তদীয় বস্তুর সেবা করিয়া অর্থাৎ শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে প্রীতি, আসক্তি ও তাঁহার তত্ত্ব বর্ণন, শ্রীনামকীর্ত্তনে যত্নাগ্রহ, শ্রীবিগ্রহের সুখের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা এবং অপরাধাদি পরিত্যাগের শিক্ষাদান, শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন, শ্রীধাম-পরিক্রমা, মহতের সেবা, শ্রীতুলসীর সেবা, শ্রীচরণামৃত গ্রহণ প্রভৃতি স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করেন। মহাপুরুষের সেবা ব্যতীত আত্ম-মঙ্গললাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপোতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥" (ভাঃ ১১।২৬।৩১)

অগ্নির আশ্রয়কারীর যেরূপ অনায়াসে অন্ধকার দূর, হিংস্রজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে ভয় ও শীতাদি নিবারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মসমর্পণ করিয়া মহাভাগবত গণের সেবায় সংরত জীবের কর্ম্ম-জড়স্বরূপ শীত, সংসারের মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান ধ্বংস এবং সংসার-ভয় হইতে চির নিষ্কৃতি অনায়াসে অর্থাৎ গৌণফলরূপে লাভ হইয়া থাকে।

"প্রেমভক্তি যাঁহা হইতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে ॥"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

অতএব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী—সেবা-প্রার্থীই তাঁহার সেবা লাভ করিয়া প্রকৃত নির্ভীক হইতে পারেন। শ্রীশ্রীআচার্য্য-কেশরীর শ্রীমুখোচ্চারিত শব্দব্রহ্ম সেবোন্মুখ শরণাগত কর্ণে পান করিবার মহা-সৌভাগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত কেহই অনিত্য দেহাভিনিবেশপ্রসূত ভয় হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যসেবানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রকৃত নির্ভীক হইতে পারে না।

—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা

"ঘোড়ায় ঘাস কাটা"র ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবগণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় বৃথা জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিবার মধ্যে কোন অর্থবহ যুক্তি থাকিতে পারে না। ভগবৎসেবা-বিমুখতার ফলেই তাহাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি এরূপ প্রবল হয় যে, তাহারা সর্ব্বদাই আপনাদিগকে ঐ বস্তুত্রয়ের বাধ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের সেবার নিমিত্ত চিরকাল আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করিয়া নিজের মূর্খামির পরিচয় প্রদান করে, তদ্রূপ দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণ অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তুত্রয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করে। সামান্য ও দুঃখজনক ঐ বস্তুত্রয়ের অন্বেষণ করিতে গিয়া জীবকে অপরাধমূলক কর্ম্ম করিতে হয় এবং তৎফলে রাজা অথবা সরকারী কর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নরক-সদৃশ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে অশেষ যাতনা পাইতে হয়। বানরগণ যেমন বৃক্ষে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্যাধের বন্ধনে পতিত হইয়া আত্মবিমোচনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তেমনই মায়াবদ্ধ জীবগণ ঐহিক সুখের হেতুভূত অসদ্বস্তুত্রয়ে আসক্তি প্রকাশ করিয়া সংসার-বন্ধন মোচন করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে।

জড়সুখ ভোগ করিতে গেলে পশ্চাতে কপালে অনেক ভয়াবহ দুঃখ আসিয়া জুটিবে— এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেহেতু মানবের জীবনে সুখ ও দুঃখ ক্রমান্বয়ে আসিয়া থাকে। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে ক্ষণস্থায়ী ও মরীচিকাসহ তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জল অন্বেষণের মত মরীচিকার পিছনে দৌড়াইয়া প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় হতভাগ্য জীবগণ কনকাদি অনিত্যবস্তুতে নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিতে গিয়া চিরকালের জন্য মঙ্গলের পথ হারাইয়া ফেলে। মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়া কোন শ্রেয়ঃসাধকের কর্ত্তব্য নহে। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ "মনঃশিক্ষা"তে বলিয়াছেন,—

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব॥

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। বস্তুত্রয়ের একটীর কথা আলোচনা করিলে প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুইটীর কথা আসিয়া যায়। কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই দুইটী অনর্থ পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও কনকই প্রকৃতপক্ষে

অনর্থের মূল। কারণ কনক হইতেই জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-সম্পর্কিত মদ, কামিনী সংগ্রহেচ্ছারূপ কাম ও হিংসামূলোদ্ভূতা জড়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। তৎফলে মাৎসর্য্য-চণ্ডালী হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া জীবকে শুদ্ধভক্তগণের বিরুদ্ধাচরণ করাইয়া অধঃপতিত করে।

কনকের অসদ্ব্যবহারই অধঃপতনের কারণ, সদ্ব্যবহারে পরমার্থ-ধন লাভ

'কনক' বলিতে সাধারণভাবে আমরা 'অর্থকেই বুঝিয়া থাকি। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়তার জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাহা 'অর্থ' বলিয়া নির্ণীত হয়। 'অর্থ' হইলেই চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী-সম্ভোগ, অক্ষক্রীড়া ও মাদকদ্রব্য-সেবন—এই পঞ্চদশ অশুভ বাসনার উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতীকস্বরূপে বিনিময়োপযোগী স্বর্ণ-রজতাদি মুদ্রাসমূহকেও 'অর্থ' বলা হয়। কথায় বলে,—"অর্থাতুরাণাং ন গুরুর্ন বন্ধুঃ" অর্থাৎ 'অর্থগৃধ্নু লোকের গুরু বা বন্ধু কেহই নাই।' অর্থলোভে অপরের অনুজ্ঞায় ব্যবসায়ী ঘাতক নরহত্যা করিতেও পিছপা হয় না। এমন কি, অর্থলোভী অর্থের জন্য নিজের মাতা-পিতা-ভ্রাতা-আত্মীয়-স্বজনকেও বধ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অর্থের জন্য 'বধূহত্যা' আজকাল ত' সংবাদপত্রের শিরোণাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা করেন, পিতা রুষ্ট হন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য ক্রোধ প্রকাশ করে, পুত্র অবাধ্য হয়, পত্নী বিরূপ হন এবং বন্ধু-বান্ধবগণ পাছে কিছু প্রার্থনা করে—এই ভয়ে আলাপ করেন না। সংসারে অর্থের জন্যই যত অনর্থ ঘটিয়া থাকে। "Money is the root of all evil." অর্থাসক্তিদ্বারা শত্রুভাবাপন্ন হইয়াও জীবসকল পূর্ব্ববাসনাবশতঃ পরস্ত্রীর বিবাহাদি সম্বন্ধে বদ্ধ হয়; আবার কখনও বা শত্রুতা-নিবন্ধন পরস্পরের ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। *গতায়ুব্যক্তির চিকিৎসা যেমন নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ অর্থাতুর ব্যক্তির মঙ্গল-*লাভের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

ধনদ্বারা নশ্বর শরীরের সমৃদ্ধিকল্পে যত্ন করিতে যে-সকল মানবকে দেখা যায়, তাহারা অতিবিক্রমশালী ধ্বংস বা ক্ষয় নামক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। যে ধন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহা 'ধন' পদবাচ্য নহে, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'অধন'। 'অধন'কে ধন জ্ঞান করিয়া উহা নশ্বর গৃহসেবায় নিযুক্ত করিলে পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয় না। মৃত্যুর সহিত সকলপ্রকার অধনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বদ্ধ-জীবগণ নিজেদের ইষ্টবোধে বিমুখ হইয়া সচ্চিদানন্দবস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করেন না,

কিন্তু ভগবৎপাদপদ্ম তাহাদের আরাধ্য বস্তু হইলেই তাহারা অভীষ্টলাভ করিতে পারেন। ভগবৎপাদপদ্ম ব্যতীত আর সকল অধিষ্ঠানই অনিত্য। ইন্দ্রিয় সুখোপযোগী ধন ও ধনদাতা, কাম ও কামদাতা প্রভৃতি সকলই কালপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মফলপ্রদ জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানেরই বা কস কি ? 'কড়ি দিয়ে কানা গরু ক্রয়ে'র ন্যায় ধনের অসদ্ব্যবহার করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অথচ গৃহব্রতগণ পরমমঙ্গল হরিকথা শ্রবণ না করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয় ও জড়দেহ সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ব্রুবগণের তোষণেই একান্ত মগ্ন এবং নিজ জীবনের কর্ত্তব্য বা পরমার্থানুশীলনে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া গৃহব্রতগণ অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে এক ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—

"হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ—এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥"

কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সদুপায়ের দ্বারা নিজমনোমত ভোগ্যবস্তু লাভ করিতে না পারিলে অসদুপায়ে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাসনা করেন না। কারণ তিনি জানেন,—"ভোগ্যবস্তুর মালিক শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেই সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। নতুবা নিজের ভোগের নিমিত্ত অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলে লোকের নিকট অবমাননাদি প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং পরকালের পথও ঝর্‌ঝরে হইয়া যাইবে।" অর্থসমূহের যথোচিত ব্যবহার না করিলে কলির কবলে পতিত হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—"স্বর্ণ মধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা—এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বিরাজিত, অধিকন্তু শত্রুতা-নামক একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে। যেস্থানে বদ্ধজীব ভোক্তৃ-অভিমানে অর্থাদির ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানেই ঐসকল অনর্থ উৎপাদিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট শুদ্ধভক্ত হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন, সে-স্থানে অর্থের যথোচিত ব্যবহার হইয়া থাকে।—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

সুতরাং যাহারা মাধবের সেবা না করিয়া অর্থ নিজের সেবায় বা মাধবের সেবার নাম করিয়া 'শালগ্রামদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া'র ন্যায় নিজের ভোগে অর্থ লাগাইয়া থাকে, তাহারা কলির কবলে পতিত।" ধন কাহাকেও প্রাণদান করিতে পারে না। সকলকেই ধন ত্যাগ করিয়া সংসারের মায়া কাটাইয়া একদিন না একদিন পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অর্থদ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে, তবেই জীবের জীবন-ধারণের সার্থকতা। তাই বৈষ্ণব-কবি শুদ্ধভক্তি-ধারার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

ধনে যদি প্রাণ দিত,　　ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ,　　দেহ গেলে নাহি গেহ,
অতএব কি করিবে ধন?
যদি থাকে বহু ধন,　　নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ,　　রাধাকৃষ্ণ আরাধন,
কর, সদা হয়ে সদাচার॥

কামিনী-ভোগবাঞ্ছাই সর্ব্বনাশের মূল; তাহাকে কৃষ্ণসেবিকারূপে দর্শনে ভবব্যাধি-নিবারণ

যাহারা জড়ভোগে উন্মত্ত এবং ভগবৎসেবাবিস্মৃত হইয়া কামিনী-কিঙ্কর হয়, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত গর্হণযোগ্য। হস্তী যেরূপ হস্তিনীর সঙ্গসুখের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিকারীর নির্ম্মিত জালে আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ কামুক মানবও কামিনীর সহিত ক্রীড়ায় আসক্তচিত্ত হইয়া মায়াজালে আবদ্ধ হয়। পুরুষগণ স্ত্রৈণভাবাপন্ন হইয়া যোষিতের উপাসনায় প্রমত্ত হয়। যোষিদ্‌গণ নিজসুখ-চেষ্টায় ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া পতির নিকট হইতে নশ্বর সুখ অনুসন্ধান করে। বদ্ধজীবের অষ্টপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ কোনপ্রকারে বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ স্ত্রীসঙ্গ হইতেই পুরুষের হিতাহিত বিবেকবুদ্ধি সব কিছু নষ্ট হইয়া যায়। কোনপ্রকার ছলনায় স্ত্রী-দর্শন, এমনকি মানসেও স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন করিতে সর্ব্বশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। ভোগ্যরূপে কামিনী-দর্শন ও ভগবৎসেবিকারূপে কামিনী-দর্শন—এক নহে। দর্শনের তারতম্য রহিয়াছে। ভগবৎসেবিকারূপে কামিনীকে দর্শন করিলে অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা থাকে না। গৃহস্থ ও ত্যাগী উভয়ের কর্ত্তব্যই হইতেছে—কামিনীকে ভগবৎসেবিকারূপে দর্শন করা, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গললাভের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীভাগবতের (ভাঃ ১১।১৭।৩৩) বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"ভোগবুদ্ধিবশতঃ স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, বিশেষরূপে আলাপন, ক্রীড়া ও পরিহাসেচ্ছায় প্রমত্ত হইলে ব্রহ্মচারীর অমঙ্গল ঘটে। যোষিৎ-সঙ্গী মানবের ও মানবেতর প্রাণিমধ্যে যোষিৎ ও তৎসঙ্গীর ক্রিয়া ও ক্রীড়াদি আলোচনা করিয়া তাদৃশী মূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। অগৃহস্থ বলিলে ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুকে বুঝায়। গৃহস্থ অসংযত হইলেই 'গৃহব্রত' হইয়া পড়েন, গৃহস্থের অসংযত হইবার অনেক সময় যোগ্যতা থাকে। অবৈধ গৃহস্থই 'গৃহব্রত' সংজ্ঞায় কথিত। গৃহস্থেতর আশ্রমে স্ত্রী-দর্শনাদি ও প্রাণিগণের ব্যবহারিক ক্রিয়া দর্শনাদির বিধি ও উপযোগিতা নাই।" (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পতিতপাবন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

প্রস্তাবনা

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে আদৌ অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব প্রকটিত করিয়া জীব ও ঈশ্বরের নিত্যসিদ্ধ প্রেম-সম্বন্ধ-যুক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন। ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মে নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি কলিকালে সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত-দ্বারা চারি সম্প্রদায়ের (শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক) আচার্য্যদিগের সিদ্ধান্তের অভাবসমূহ পরিপূরণ করেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও বৈষ্ণবাচার্য্য-লীলাভিনয় করিয়া সমস্ত জগৎকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ ভাবধারা ও অপ্রাকৃত চিন্তা-পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন,—

'পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম॥

অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত সম্মিলিতভাবে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থরাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুদ্বয় যাঁহার **অঙ্গ** ; শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ ঐ অঙ্গের **উপাঙ্গ** ; অবিদ্যানাশক শ্রীহরিনাম যাঁহার অস্ত্র, শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দরায় প্রমুখ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত কলিযুগপাবনাবতারী, 'কৃষ্ণ' এই নাম গণনবিধি শিক্ষাদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের মাধ্যমে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সুমেধা বলিয়া প্রশংসিত। ভক্তিবেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত এইভাবে শ্রীভগবানের আপন হৃদয়ের প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারক, গৌর-কৃষ্ণে (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং) তথা বৈষ্ণবের জয়গান করিয়াছেন।

শ্রুতিও শ্রীভগবানের প্রিয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বিষ্ণুপূজা-বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতিতে—বেদে একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই আছে। সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রাচীনতম ঋক্‌সংহিতা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আদি, মধ্য ও অন্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নাদি দশোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তিত রহিয়াছে। পাঠক নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কর্ম্ম-সন্ন্যাসাদি যুগবিরুদ্ধ পদ্ধতির সাধন ও মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধাদি 'কলৌ পঞ্চবিবর্জয়েৎ' শ্লোকে বর্ণিত বিষয়গুলি বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদির বহুমানন না করিয়া এবং ভুক্তি-মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া ; বর্ণ-আশ্রম নির্ব্বিশেষে সমস্ত জীবের আত্মকল্যাণ, ভক্তি-ধর্ম্মে অনুরক্তি এবং চরমে শ্রীভগবানের প্রেমসেবা প্রদানের ইচ্ছায় শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপালভট্ট ও দাসরঘুনাথ—এই ষড়্‌গোস্বামী শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির নির্দ্দেশ, আদেশ ও পদ্ধতি অবলম্বনে সদাচারসম্পন্ন, কীর্ত্তনপরায়ণ শুদ্ধবৈষ্ণব চরিত্রের চিত্র অঙ্কন করেন। অতঃপর সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংসার-জীবনে তাহারই রূপায়ণ-মানসে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' বাক্যের নামপর ও শুদ্ধভক্তি-পোষক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া 'বন' রূপ 'মঠ' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 'মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ।' অর্থাৎ গ্রাম্যকথা ও গ্রাম্যবার্ত্তা-বিরক্ত মুনিগণ এখানে কৃষ্ণ-শিক্ষা ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দে সদা মত্ত। এই প্রকারে অদ্যাপি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিতবর্গের চরণান্তিকে বসিয়া বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ শ্রীরূপ-রঘুনাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদধারায় শ্রীভগবান্, নাম, সংকীর্ত্তন, সদ্‌গুরু, বৈষ্ণব, তাঁহাদের প্রিয় বাক্যাদি, ধাম, মহাপ্রসাদ, শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাপ্রসাদ ও শ্রীবিগ্রহ সেবা-পূজনাদি প্রকট করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহাই শাস্ত্রসম্মত। সহস্র সহস্র জীব প্রাদেশিকতা

ও ছল-ধর্ম্মাদির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের ভজন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন।

যোগ্যতার অভাবে কলিহত জীবের দুর্গতি বর্ণনে বরাহ পুরাণ বলেন,—'কলি-প্রবৃত্তির দশসহস্র বর্ষকাল বিষ্ণু-উপাসনা জগতে প্রবল থাকিবে।' তদর্দ্ধপরিমিত-কাল অর্থাৎ পাঁচ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপাদোদকের মহিমা জগতে আদরণীয় হইবে। সাধারণ গ্রামবাসীর প্রাকৃত ধারণামূলে যে-সকল উপাস্য কল্পিত হয়, তত্তদ্ গ্রাম্যদেবতাকে ভগবদ্বোধে পূজা আরও এক সহস্রবর্ষের অধিককাল চলিবে। বিষ্ণুপাদোদকে সাধারণ নীরবুদ্ধি পঞ্চসহস্র কল্যব্দ পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। আর দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুকে অপর দেবকুলের সহিত সমান জ্ঞান, অমঙ্গল পথের পথিকগণ ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্র বলেন,—এত শত শত দোষ থাকিলেও কলির একটী মহৎ গুণ আছে এই যে,—'গৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণে' জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচারকগণের সঙ্কীর্ণ বিচার হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভাবেই কলিজীবের নানা মতবাদ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপী অনুগ্রহ।

বৈষ্ণব

চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসে আস্থা স্থাপনকারী একান্ত ভজন মাত্রই বাস্তব-জ্ঞানের কথায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ বিশুদ্ধ-আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনারূপ নির্ম্মল-ভক্তিপোষক 'জ্ঞান' অনুশীলনে প্রযত্নশীল। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে (Sense satisfection) পরিতৃপ্ত হন না। অভিজ্ঞতার আদর না করিয়া শাস্ত্রোক্ত সুযুক্তিসিদ্ধান্তদ্বারা পরিমার্জ্জিত রুচি ও মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবানের দৃষ্টিতে সকল কিছু দর্শন ও বিচার প্রণালী শিক্ষা করিয়া ভগবানের আত্যন্তিক সুখ বিধান করেন। এই প্রকারে বিশেষভাবে ভগবানের সেবা করা যায়। তাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাই বৈষ্ণব। যথা —

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। তথাকথিত অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে যে-সকল মত, পথ, বা ধর্ম্ম হয় বা হইয়া থাকে বা হইবে, উহা জাগতিক অভিজ্ঞতার আধিক্য ও স্বল্পতার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত অথবা পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন, পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শনের কাছে তিন হাজার বৎসরের সভ্যতা ও

সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ, আবার দশ হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শন তদপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত। অতঃপর পরবর্ত্তিকালে আরও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবদর্শন এই প্রকার পরিবর্ত্তনের যোগ্য নহে। ইহা কখনও জড় অভিজ্ঞতাবাদীর পরিবর্ত্তন-যোগ্য জ্ঞানের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের বিষয় হয় না, ইহাই অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সর্ব্বশ্রুতিসার, সকল বেদান্তসার শ্রীভাগবত-শাস্ত্র বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তন করেন। ইহা পরমহংসগণেরও প্রিয়।—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং।
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে॥
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং।
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমল পুরাণই বৈষ্ণবগণের প্রিয়। ইহা পরমহংসগণের প্রিয় অমল জ্ঞানের সহিত যে বিরাগ, ভক্তি ইত্যাদির কথা ও বিচারে পূর্ণ তাহা শ্রবণ, পঠনাদি বিচারপর ব্যক্তি মাত্রেরই মুক্তির কারণ। এই শাস্ত্র মানব সভ্যতা এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক নিয়ম-কানুনের অতীব কিছু সুদুর্ল্লভ কথা কীর্ত্তন করেন। তাহা বৈষ্ণবগণের প্রাণপ্রিয় 'সংবিধান'। এই 'বৈষ্ণব-সংবিধানই' কৃষ্ণ-সংসারের প্রবর্ত্তক।

কৃষ্ণের সংসার

দৈব-বর্ণাশ্রমই কৃষ্ণ-সংসারের পরিকাঠামো। কৃষ্ণ-সংসারে কৃষ্ণানুশীলনই বৈষ্ণবগণের একমাত্র কৃত্য। বনবাসী বা গৃহবাসী নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। শৌচাদি অন্তে শ্রীগুরুদেবের স্তব-স্তুতি পাঠ, বৈষ্ণব-প্রণাম এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মঙ্গল প্রভাতে বাদ্য, গীত, ধূপ-দীপদ্বারা সুমঙ্গল পরিমণ্ডল রচনা করিয়া মঙ্গলারতির আয়োজন করেন। অতঃপর মা-যশোদার প্রাণকানাইয়ার গোষ্ঠ-বিহার কাল। বৈষ্ণবগণ অভিন্ন নন্দগাঁও বোধে মঠ-মন্দিরে ও গৃহাশ্রমে, বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণকে মা-যশোদার আনুগত্যে তাঁহার প্রাণগোপালের পুরাতন কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও বাল-চঞ্চলতা বা কখনও তাঁহার অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণেরও নয়নমুগ্ধকর 'ফুল্লেন্দিবর কান্তি'র বর্ণনা করিয়া, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগে তাঁহার পূজাদি করিয়া গৃহকর্ম্মের সূচনা করেন। অতঃপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, আহ্নিক এবং ব্যক্তিগত সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ মধ্যাহ্নে ভোগ-রাগাদি পর্ব্বশেষে মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার পূর্ব্বে গোধূলি-লগ্নে বৃন্দাবনের বনপথে অসংখ্য সখা, ধেনু, গাভী, বৎসাদি-সহযোগে সিঙ্গা ও বেণুরব করিতে করিতে মা-যশোদার বাৎসল্য স্নেহাদি পাইবার লোভে ও অনেক ক্লান্তি মাখা দেহে পীতাম্বর-বনমালী বলরামসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাই সংকীর্ত্তনাদি শেষে সন্ধ্যারতির আয়োজন হয়।

এইভাবে নিত্যই শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, তুলসী, ভাগবত ও মহাপ্রসাদ সেবা ও নাম ভজনই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ জীবগণেরই লভ্য। শুধুমাত্র ভাগ্যবান্ জীব এবম্বিধ উপায়ে চাতুর্ম্মাস্য, একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি তিথি-পালন এবং শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিতে বিশেষ উৎসবদ্বারা সুকৃতি সঞ্চয় করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। যে কোন কুলে জাত ব্যক্তি এই প্রকারে সদ্গুরুর আনুগত্যে **সদাচার** এবং **নিরন্তর অভ্যাস যোগদ্বারা** বৈধী ভক্তিমার্গ হইতে ধীরে ধীরে প্রেমভক্তি লাভের অধিকার অর্জ্জন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারেন। (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীরঘুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী**

মহাপ্রভু ও রঘুনাথ

তরি আরোহিলা দোঁহে।
রঘুনাথ কহে, নিমাই তোমার অঞ্চলে ওকি ওহে?
প্রভু কহে কিছু নয়।
রঘুনাথ কহে কিছু নহে? ও যে পুঁথি বলে মনে হয়।
কাজের পুঁথি ও নহে,
প্রভু বলে, রঘুনাথ 'দেখি তবু' বার বার ইহা কহে।
রঘুনাথ কহে আমি।
রচিয়াছি এক সুমহতী টীকা বহু দিন রাতি যামি।
নিশ্চয় তার কাছে।
শিখিবে নব্য-ন্যায়-কৌশল যত পণ্ডিত আছে।
বিশ্বে আমার মত।
পণ্ডিত নাই, আমি আনিলাম ন্যায়ের নূতন স্রোত।
প্রভু কহিলেন রঘো!
তুমিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তব সম নাই কেউ ওগো।
পুনরায় রঘু বলে।

দেখাও পুঁথিটী কিছু নয় বলে ঢাকিছ কিসের ছলে।
অঞ্চল থেকে খুলি'।
নব্য ন্যায়ের রাজটীকাখানি দিলা প্রভু হাতে তুলি'।
রঘুনাথ হেরি' তাহা।
বলে হে নিমাই! মোর চেয়ে তুমি কত পণ্ডিত আহা।
এমন ক্ষমতা তব।
গর্ব্বিত আমি মানিলাম আজি, তুয়া কাছে পরাভব।
রঘুনাথ বলে ভাই।
ইহা প্রকাশিলে আমার যশের ডালি যাবে তুয়া ঠাঁই।
প্রভু কহিলেন তবে।
এই কথা? বেশ্, তুমিই বঙ্গে বড় নৈয়ায়িক হবে।
কহিতে কহিতে কথা।
রঘুনাথের তু'নয়ন হইতে ঝরিল অশ্রু-লতা।
রঘুনাথ কয় কাঁদি'।
দীধিতি টীকার তুমি ছাড়া নাই বিশ্বে কেহই বাদী।
আমার আছিল মনে।
বিশ্ব শিখিবে ন্যায়ের তত্ত্ব মোর টীকা অধ্যয়নে।
প্রভু বলে শুন ভাই গো।
তুমিই শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিদ্ হও, বাদী কেহ নাহি নাই গো।
আর প্রভু মৃদু হাসে।
বিশ্ব-বিজয়ি-টীকা দিলা জলে, ছেঁড়া টীকা জলে ভাসে।
প্রভুর এ লীলা হেরি'।
রঘুর শরীরে তড়িৎ বহিল তীব্র উপহাসেরি।
স্তম্ভিত হয়ে রঘু।
ভাবিতে লাগিলা গোরা হতে মোর হৃদি হায় কত লঘু।
রঘু কয় ভাই একি?
প্রভু বলে, ভাই কি হবে প্রাকৃত নব্য ন্যায়ের ফাঁকি।
তরি' গেল পরপারে।
রঘুনাথ ভাবে ভগবান্ বিনা একাজ কেহ কি পারে?

—শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়

———

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর]

'সনাতন ধর্ম্ম' মানে হল যেটা কখনও নষ্ট হয় না, যেটা সর্ব্বাবস্থায় একইরূপে থাকে। Everexisting—Everlasting সেই জিনিসটা, তাকে বলছেন সনাতন ধর্ম্ম। আগে দেহধর্ম্মের কথা, পরে মনোধর্ম্মের কথা, তারপর আত্মধর্ম্মের কথা আলোচনায় এসেছে। দেহধর্ম্ম—দেহ কিছু অন্ন-পানাদি চায়, খেলে দেহ সুস্থ হবে। মনটা—কিছু বিষয় কথা পেলে খুব খুশী হয়। দেহ যা চায়, মন তা চায় না; মন যা চায়, দেহ তা চায় না; মন যা চায়, আত্মা তা চায় না। আত্মার খাদ্য হচ্ছে—ভগবৎকথা আলোচনা—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি। আত্মানুশীলন এইভাবে হতে পারে। সনাতন ধর্ম্মে সেই কথাই শিক্ষা দিয়েছেন।

সনাতন শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন—সেই প্রেমময় ভগবানকে কি করে ভালবাসা যায়। চৌষট্টি প্রকারে ভগবানকে ভালবাসতে পারা যায়। ৬৪ রকমের কথা শুনে ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা দিয়েছেন—ভক্তি যাজনের কথা বলেছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

—এই নয় রকম পারা যাবে না। কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা দেওয়া হউক। শাস্ত্র তখন বলেছেন পাঁচ রকম অভ্যাস কর :—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

না, এই পাঁচ রকমও পারব না, আরও কিছু Concession। শাস্ত্র তখন বলছেন,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—এই তিনটে কর। না এই তিনটীও পারব না, Special concession প্রয়োজন। তখন বলেছেন শাস্ত্র—নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর। সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে অন্য ৬৩ অঙ্গ অনুস্যূত আছে। সেই কথা শাস্ত্রে বিচার-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা

ভক্তি-সংযোগেনৈব।" যদি তোমার অন্য কোন সাধনাঙ্গ যাজন করতে ইচ্ছা হয়, Practice করতে ইচ্ছা হয়, তুমি করতে পার; কিন্তু নাম-সঙ্কীর্তনাঙ্গ তার সঙ্গে অবশ্যই মিশ্রিত করতে হবে. তা না হলে ওটা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥"

এই উপদেশ ত' করেছেন শাস্ত্র। সনাতন ধর্ম্ম মানে আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম। অসনাতন ধর্ম্ম মানে দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম। আর্য্যঋষিগণ যে সনাতন ধর্ম্মের কথা বলেছেন, সেটা আত্মধর্ম্ম। তাঁরা আত্মকল্যাণ চিন্তার কথাই বিশেষ-ভাবে বলেছেন।

শরীরটা যখন আছে তখন তাকে সুস্থ রাখতেই হবে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে—এটা ঋষিগণের উপদেশ। তাঁরা বলেছেন,—"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"। যদি কথাটার শুধু জড় দিক্‌টাই নিই, তাহলে শরীরটাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাসোটা করতে হবে। কিন্তু যদি আমি সাধন-ভজন না করি, যদি আমি ধর্ম্মপথে না চলি, তাহলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যায়। মানুষকে বলছেন—Rational Being। Rationality, Animality দুটোই রয়েছে মানুষের মধ্যে। Minus Rationality মানে হল—পশুত্ব। 'মানব'-শব্দের ব্যাখ্যা ত' শাস্ত্রে সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। মহর্ষি মনুর বংশধর আমরা। মহর্ষি মনু শাস্ত্রে যে-সব নীতি-আদর্শের কথা বলেছেন, সে-সবগুলো যদি আমরা পালন না করি, তাহলে আমাদের মনুর সন্তান সংজ্ঞা থাকে না। তখন আমরা 'দানব' হয়ে পড়ি। তাঁর যে নীতি-আদর্শ-উপদেশ, সেগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবে রূপায়িত না করি, তাহলে মানব বা মনুষ্য সংজ্ঞা আমাদের থাকছে না। সেইজন্য সেখানে বলেছেন,—

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

নীতি-আদর্শ-পরায়ণতাই হল মানবত্ব—মনুষ্যত্ব। সনাতন ধর্ম্ম মানে হল আত্মকল্যাণ-চিন্তা। 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্' নীতি নিয়ে যদি আমি শুধু শরীর রক্ষার চেষ্টাই করছি কিন্তু ভগবৎ চিন্তা-ভাবনা রাখছি না—আত্মকল্যাণ চিন্তা করছি না, তাহলে কেবল শরীর ভাল রেখে হবে কি? সেই সুস্থ শরীর দিয়ে লাভ কি? একথাও পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয়েছে।

এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল, সে প্রশ্নগুলোর উত্তর ত' একরকম হয়েছে। কিন্তু

এর ভিতরে অনেক কথা ত' রয়েছে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বললেন,—'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা।' কিন্তু ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তাহলে জগৎও সত্য। ব্রহ্ম—সত্য, জগৎ—মিথ্যা হতে পারে না। কেন ?—জগৎটা ত' সেই ভগবানেরই সৃষ্ট। এতে তাৎকালিকতা রয়েছে অর্থাৎ জগৎ অনিত্য, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। কিন্তু যেটা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, সেটাকে অনিত্য বলে অস্বীকার করা যায় না। 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যাত্ববাদ' এটা আচার্য্য শঙ্কর প্রচার করেছেন ভগবদাজ্ঞাক্রমে। সে বিষয়টা আপনাদের জানা উচিত। ভগবান্ আজ্ঞা করেছিলেন, তাই বেদ-বিরুদ্ধ কথা—অবৈদিক নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ তাঁকে প্রচার করতে হয়েছে। কেন ? —আমার ভক্তের পথ রোধ করছে নাস্তিক, আসুরিকপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মানুষ। হে শিবশঙ্কর! তুমি ওদের পথ রুদ্ধ কর। সমস্ত শ্রুতি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে দাও।—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

জনগণকে আমার থেকে বিমুখ কর, শ্রুতির কল্পিত অপব্যাখ্যা দাও, কদর্থ কর। এমনভাবে উল্টোপাল্টা করে বলবে যাতে আমার ভক্তের পথ ঠিক থাকে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তিনি দেবীকে বলছেন,—জান, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণঘরে গিয়ে জন্মগ্রহণ করব এবং মায়াবাদরূপ অবৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করব।—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥

যেটা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, যেটা বুদ্ধের শূন্যবাদ, সেইটাই ব্রহ্মবাদ বলে তিনি চালিয়ে দিলেন Suger coating করে। বুদ্ধের শূন্যবাদ আর শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মবাদ একই, কেবলমাত্র নামান্তর। বৌদ্ধযুগে একথা বলার তাৎপর্য্যও ছিল। কাপালিক যুগ ছিল তার আগে। সেইজন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করতে হয়েছে তাঁকে।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।"—বিষ্ণু-বুদ্ধরূপে এসে তাঁকে ওটা বলতে হয়েছে। যজ্ঞবিধির নিন্দা করতে হয়েছে, পশুহনন, বলি ইত্যাদি নিষেধ করতে হয়েছে। সেইজন্য শ্রীবিষ্ণু অবতার আসবার বহু কারণ ছিল।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে অনেকের অনেক ধারণা আছে। বুদ্ধ কিন্তু অনেক। জগতে সাধারণতঃ যে বুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয়, তিনি হলেন কপিলাবস্তু নগরে জন্ম-

গ্রহণকারী শুদ্ধোধন-পুত্র সিদ্ধার্থ-বুদ্ধ। তার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু নবম অবতার বুদ্ধ হলেন শ্রীভগবানেরই অবতার। একজন সাধক-বুদ্ধ আর একজন অবতার বুদ্ধ। যদিও বহু জায়গায় 'ভগবান্' শব্দটা লাগানো আছে। বৈষ্ণবগণের উপাস্য বিষ্ণুবুদ্ধ ও শাক্যসিংহ বুদ্ধ একই ব্যক্তি নহেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী মানব। এ সম্বন্ধেও বহু মতবাদ দেখা যায়। শ্রীশঙ্কর সুগত-বুদ্ধকে বিষ্ণুবুদ্ধ না বুঝিয়া গৌতম-বুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ২৫টী নামে বুদ্ধের ইতিহাস আছে। রাবণের গুরু একজন বুদ্ধ ছিলেন। রাবণ লঙ্কাবতারসূত্রে জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ববুদ্ধকে স্তব করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধ একজন নন। বিভিন্ন বুদ্ধের Theory বিভিন্ন রকম। আমার আলোচ্য যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ, তিনি শূন্যবাদ প্রচার করেছেন। সেই শূন্যবাদকে Sugar coating করে ব্রহ্মবাদ বলে চালিয়েছেন আচার্য্য শ্রীশঙ্কর। সেইজন্য তিনি শিবানীকে বলছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন,—

বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ ॥

জগতের ধ্বংসের জন্য আমি এই উল্টোপাল্টা কথাগুলো বলব—জানাচ্ছেন তিনি। 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—তিনি স্বয়ং শিব, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবদাজ্ঞাই তিনি পালন করেছেন। "পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।" ভগবানের গুণগান করাই জীবনের ব্রত বলে মেনে নিয়েছেন শিব-শিবানী। অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসী ধামেও শিবঠাকুর মুমূর্ষু জীবের কর্ণে 'তারকব্রহ্ম নাম' দান করছেন—জগদ্গুরুর কার্য্য করছেন। সাধারণ মোহগ্রস্ত জীব বুঝবেন কি করে তাঁর জগদ্গুরুত্ব? রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র দশভাই প্রচেতা গিয়েছিলেন তপস্যা করতে। পথিমধ্যে শিবঠাকুরের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছে ভগবদারাধনার উপদেশ লাভ করলেন। শিবঠাকুর তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের কি চাই বাছা? আমি তোমাদের সমস্ত অবগত আছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। তাঁরা বললেন,— আমরা এসেছিলাম তত্ত্বদর্শন—আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব জানব বলে আপনার কাছে। আমরা মনে করেছিলাম—আপনিই পরাৎপর তত্ত্ব। তাহলে আপনি কার ধ্যান করছেন? ঠিক ধরেছ। আমার যে উপাস্য—সেই পরব্রহ্ম ভগবান্, তাঁর ধ্যান করছিলাম। আমরা যে এসেছিলাম আপনার কাছে। ঠিক আছে, আমার যে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ তাঁর মন্ত্র গ্রহণ কর। তাঁর ধ্যান, জপ, পূজার ব্যবস্থা

দিলেন। মহামন্ত্র দান করলেন এবং বললেন,—মন্ত্রজপ ও ভগবৎ স্তোত্রপাঠে তোমাদের সিদ্ধি হবে। যিনি আমার প্রভু তিনি তোমাদেরও প্রভু। যাঁরা অনন্যভাবে তাঁর শরণাগত হন, তাঁরা আমার প্রিয়। দেবতাগণ ও আমি শ্রীভগবানের সেবক ; আমরা দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদই প্রাপ্ত হব। তোমরা ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং আমার প্রিয়পাত্র ; তোমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র অন্য নাই। পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায়ই জীবের চরম সফলতা।

দশ রকমের নামাপরাধের উল্লেখ রয়েছে শাস্ত্রে। নামাপরাধ কি কি, না জানলে পরে এটা ছাড়তে পারা যাবে না। তাহলে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হবে না। "নাম লৈলে প্রেম দেয়।"—সে অবস্থাটা ত' হবে না। "যেরূপে লৈলে নাম প্রেম উপজয়।"—সে নাম ত' হবে না। শুদ্ধনাম হওয়া দরকার—নিরপরাধে নাম উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের পিছনে দারুণ কলি লেগে আছে।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥

এই চার রকমের অধর্ম্ম, এখানে কলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান কলিকাল, আমরা কলিতে বসে আছি—বাস করছি। কলির যে প্রবল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাতেই আমরা চলছি। সুতরাং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব আমাদের ভিতরে ঠিক থাকছে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্ম্ম করছি আমরা। কিন্তু তা কি হবে ? সদ্‌বস্তু কি করে লাভ করা যাবে ? যাঁরা এরই ভিতরে সাধন-ভজনপরায়ণ তাঁদের কোন অসুবিধা নাই।

ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন হচ্ছিল নৈমিষারণ্যে। সেখানে শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষি শ্রোতা হয়ে বসেছেন, আর বক্তা হলেন শ্রীসূত গোস্বামী। প্রশ্ন রেখেছেন শৌনকাদি ঋষিগণ,—দারুণ কলিকাল আসছে, আমরা আমাদের সাধন-ভজন কি করে রক্ষা করব ? দ্বাপর যুগের শেষের কথা। কলিযুগ আসছে, তাই তাঁরা ভীত, সন্ত্রস্ত। সূত গোস্বামী বললেন,—আমার গুরুদেব শ্রীশুকদেব গোস্বামীর কাছে রাজা পরীক্ষিৎ ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। আপনারাও সেই প্রশ্ন আমার কাছে করেছেন। আমার গুরুদেব ত' উত্তর দিয়ে রেখেছেন। উত্তরটা কি ছিল ?—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলি অশেষ দোষের আকর, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলি সর্ব্বদোষাকর হলেও তাঁর একটা মহৎ গুণ আছে। 'কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য'—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা কলিজীব মুক্তি লাভ করবেন, বলা হল।

বহু ব্যক্তির ধারণা আজকাল—যে কোন নাম করলে হবে। এক ফল হবে। তা ত' হ ব না। যে কোন নাম করলে হবে না। কৃষ্ণনাম-হরিনাম বড়ই মধুর। যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥" ভগবানের গৌণ নাম করলেও সময় অনেক লাগবে। কলিজীব আমাদের পরমায়ু খুব কম। "অনন্তপারং কিল-শব্দশাস্ত্রম্, স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" সুতরাং সার সংকলন করতে হবে। সংক্ষেপ ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের। সে সংক্ষেপ ব্যবস্থা শিবঠাকুর শিবানীকে বলেছেন। শিবানী প্রশ্ন করেছেন—কোথা থেকে এলাম তুমি-আমি? শিবঠাকুর উত্তর দিয়েছেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।

সেই পরমেশ্বর ভগবান্ থেকে তুমি ও আমি জাত হয়েছি। দেবী আবার প্রশ্ন করেছেন—কার উপাসনা করব? কি উত্তর দিয়েছেন শিবঠাকুর?—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং সমর্চ্চনম্॥

ভগবানের আরাধনা কর তুমি। তার থেকে শ্রেষ্ঠ আরাধনা কিছু আছে কি? —হ্যাঁ, আছে। সেটা হল তাঁর ভক্তের সেবা। তার দ্বারাই ভগবানের উপাসনা সার্থকতা লাভ করে। আবার প্রশ্ন—কোন্ নাম করব?—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥

হে বরাননে! তুমি বিষ্ণুসহস্রনাম কীর্ত্তন কর। দেবী বিষ্ণুসহস্রনাম কীর্ত্তন করছেন। শিবঠাকুর বললেন,—এর থেকে সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে। সহস্র বিষ্ণুনামের সমান এক রাম নাম। দেবী তখন 'রাম রাম' নাম জপ করছেন। শিবঠাকুর তখন বললেন,—এর থেকেও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা আছে। সহস্র বিষ্ণুনামের সমান এক রাম নাম, তিন রাম নামের সমান এক কৃষ্ণ নাম। তখন দেবী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপ করতে লাগলেন। শিবঠাকুর বললেন,—ওভাবে করলে হবে না। কিভাবে করতে হবে বল, তুমি ত' আমার পতি, গুরু। তখন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর তুমি জপ কর। এই তারকব্রহ্ম নাম জপ করছেন দুজনে। জগদ্গুরু শিব জগৎকে পরমার্থ শিক্ষা দিচ্ছেন। শিবকে পৃথক্ ঈশ্বর

জ্ঞান না করে জগতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের সাধন-ভজন শিক্ষা দিচ্ছেন। ঐভাবে ব্রহ্মাজীকে জগদ্‌গুরুরূপে নিতে হবে, তাহলে তত্ত্বদর্শন ভুল হবে না। শ্রীনামের যথার্থ ফল মিলবে। সেই কথা শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে।

সাধুনিন্দা, গুরুনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর নামের সঙ্গে কৃষ্ণনামের সমান জ্ঞান করা, নাম বলে পাপবুদ্ধি, অহংমম-বুদ্ধি ইত্যাদি ছেড়ে নাম করলে তবে নামের বাস্তব ফল মিলবে। যেমন তেমন করে দিনান্তে একবার তাঁকে ডেকো, এটা কি রাম সিং-এর ব্যাগার? অত সহজ নয়। শ্রদ্ধা করে ডাকতে হবে তাঁকে, তবেই যথার্থ ফল মিলবে।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

—কথাটা বলা আছে। কিন্তু কার পক্ষে?—যার অপরাধ নাই তার পক্ষে। "ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" কৃষ্ণনাম-ভগবন্নাম জীবকে ত্রাণ করবে, পবিত্র করবে কখন?—যখন তার অপরাধ থাকবে না—সেই কথাই শাস্ত্রে উপদেশ করা হয়েছে।

আজ যে-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না, সে-সব প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হবে এবং আরও অন্যান্য নূতন Point গুলো আলোচনা করা যাবে। এসব কি এক আধদিনে সম্ভবপর? অসীম, অনন্ত ভগবান্, তাঁর লীলা অনন্ত, নাম অনন্ত, গুণ অনন্ত—সবই অনন্ত। তা কি করে সসীমতায় আমরা শেষ করতে পারি! "আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ।" সুতরাং যতটুকু দিগ্‌দর্শন করা সম্ভব, ততটুকু করা হল। "নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ।" অতএব শ্রীভগবান্ নিত্য, ভক্তি নিত্য, ভক্ত নিত্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৪শ বর্ষ | ৭ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৯৯, ইং ১৬/১২/৯২ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তি-হারিণী
প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোঽপি পাপসিন্ধু-তারিণী॥
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষ-চিত্ত-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী॥ ১॥

যিনি স্বীয় পবিত্র দর্শন-দানেই অতিপাতকী জনগণকেও পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বাগ্রজ যমরাজের নগরাভিমুখে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন,

যিনি স্বকীয় নীর-মধুরিমায় অশেষ দেব ও নরগণের চিত্ত বশীভূত করিয়া থাকেন, সেই পদ্মবন্ধু ভানু-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

হারি-বারি-ধারয়াঽভিমণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ডজালি-তাণ্ডবা ।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপসম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥

চিত্তহারিণী বারি-প্রবাহে যিনি ইন্দ্রের সুবৃহৎ খাণ্ডব-বন বিশেষরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, যাঁহার শুভ্র পঙ্কজসমূহে খঞ্জনাদি পক্ষীশ্রেণী পরম-সুখে নৃত্য করিতেছে, স্নানকারী ব্যক্তিগণের কি কথা, স্নানেচ্ছু জনগণেরও অতি তীব্র পাপরাশিকে যিনি ক্ষীণ করিয়া থাকেন, সেই কমল-বন্ধু সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দ-নন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর-বর্দ্ধিনী ।
তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবর্দ্ধিনা
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥

যিনি অম্বুকণ-সংস্পৃষ্ট প্রাণীগণের দুষ্কর্ম্ম-ফল বিনাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন করেন এবং যিনি নিজ তট-নিবাসেচ্ছু জনগণের পরম কল্যাণকারিণী, সেই রবিসুতা শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

দ্বীপচক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্ম্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী ।
কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দ-নিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপ-সেবিত সপ্ত-সমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা, যিনি শ্রীমুকুন্দের প্রকটিত সর্ব্বোত্তম দিব্য কেলিসমূহের পরিজ্ঞাতা, স্বকীয় দিব্যোজ্জ্বল কান্তি-প্রভাবে ইন্দ্রনীল-মণিরও কান্তি-সমূহকে যিনি পরাভব করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী সদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুনাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা ।
ঊর্ম্মি-দোর্ব্বিলাস-পদ্মনাভ-পাদ-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥

যিনি মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত হইয়া পরম শোভিতা হইয়াছেন, প্রেমৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের যিনি বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির পরিবর্দ্ধনকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গরূপ বাহুযুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনে তৎপরা, সেই ভানুদুহিতা শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্ব-পুষ্পরাজ-রূষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসংঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥

অতি রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হম্বা'-ধ্বনিকারী গোবৎসগণ-কর্তৃক যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব-পুষ্পশ্রেণীর দিব্যগন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকর-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বকাল আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেব-সিদ্ধ-কিন্নরালি-পূজিতা।
তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥

আনন্দে পক্ষ-বিস্তারকারী মলিন-চঞ্চু-চরণ রাজহংস-বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিতা হইতেছেন, ভক্তিতে আকৃষ্টচেতা দেব-সিদ্ধ-কিন্নর-অধিপতিগণও স্ব-স্ব যূথ-পরিবৃত হইয়া যাঁহার পূজায় রত থাকেন, এবং যিনি উভয়তীরস্থ গন্ধবাহী পরিমলদ্বারা প্রাণীসমূহের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্কর-দুহিতা যমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাস-বারিপূর-ভূর্ভুবঃ-স্বরূপিণী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরু-পাপমর্ম্ম-তাপিনী।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গরাগ-ভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদাত্মক বারিপ্রবাহদ্বারা যিনি 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বর' এই লোকত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন,—সে-কারণ যিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা' এই নামে পরিচিতা, যিনি উচ্চারিতা হইয়াও অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় পাপরাশির মর্ম্মান্তঃবিনাশ-কারিণী, ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া-হেতু তদীয় অঙ্গরাগ-গলিত কুঙ্কুমাদি

অনুলেপন গন্ধদ্বারা যিনি সুরভিতা, সেই সবিতৃ-তনয়া শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মি-চেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি সর্ব্বদেব-বেষ্টিতম্ ।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপ-মোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি পুণ্ডরীক-লোচনে ॥ ৯ ॥

হে সর্ব্বপাপমোচনকারিণী ! হে ভানুপুত্রি ! পবিত্র তরঙ্গ-বিস্তারই তোমার চেষ্টা এবং তুমি সর্ব্বদেবগণের আশ্রয়স্বরূপা। যিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টক পাঠ করিয়া তোমার স্তব করেন, তুমি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহার ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন কর ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর

১। শ্রীমায়াপুরের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশ-স্বরূপ এই মায়াপুর-মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে সেইরূপ শ্রীপ্রৌঢ়মায়া (যাঁহাকে লোকে 'পোড়ামা' বলিয়া বলে) সর্ব্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহাতীর্থের মধ্যে **মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান।** মায়াতীর্থের এরূপ প্রভাব যে, তথায় অপতিত যে কয়েকটী মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাণনাথ গৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রভু বলিয়া অভিমান করেন এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বান্ধবের ন্যায় যত্ন করেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

২। শ্রীভক্তিবিনোদ লুপ্ত গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন ?

"প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রজভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে

যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়া-সমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক ধান্যক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকে জানাইব?"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৩। তিনি কি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন?

"মনে হইল, আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। *** মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন,—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪। কিরূপভাবে শ্রীমায়াপুর আত্মপ্রকাশ করেন?

"আমি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলস্থান অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ-নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। গঙ্গাপার উত্তরদিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। * * * প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দে'খলে দেখিলাম যে, তথায় একটী তালগাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—ঐ স্থান বল্লালদীঘি, তথায় লক্ষ্মণ সেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা-পদ্ধতি', 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' যে-সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম।

কৃষ্ণনগরে বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে

পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকবাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বুদ্ধি-বলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপ-মণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধাম-মাহাত্ম্যে স্বল্পাকারে ছাপা হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৫। শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট কি ?

"বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণে একটী অপূর্ব্ব স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা প্রভৃতি **শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ করা** যাইতে পারে। সেই সেবার অধীনে **জন্মস্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভ-রক্ষা,** মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রীনিবাসের স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তনের অভিলাষ কাহার হৃদয়ে প্রথম উদিত হয় ?

"বিধি আছে যে, শ্রীমায়পুর হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমন স্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটী বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। * * * জগন্নাথমিশ্রের গৃহ-নির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটী বৃহৎ পতাকা ও একটী আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৭। শ্রীমায়াপুরের ইতিবৃত্ত কি কি ?

"শ্রীগঙ্গানগর, ভরদ্বাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গানগর গ্রামেই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায়। সেই স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মার তপস্যা-স্থল বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতি পূর্ব্বে মায়াপুরের পূর্ব্ব-অংশে ও অন্তর্দ্বীপের মধ্য দিয়া বাগ্দেবীর একটী ক্ষুদ্র প্রবাহ ভাগীরথী পর্য্যন্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সেই প্রণালীর মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বাগ্দেবীর তীরে তৎকালে প্রৌঢ়ামায়ার মন্দির ছিল। বিদ্যার্থিগণ বাগ্দেবীর প্রণালীতে স্নান করত প্রৌঢ়ামায়ার মন্দিরে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া উপাধি গ্রহণ করিতেন।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ৯ম বর্ষ

৮। লুপ্ত গৌর-লীলাস্থলী আবিষ্কারের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপ ব্যাকুল আহ্বান করিয়াছিলেন ?

"হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল অন্য আশা, অন্য চিন্তা দূরে রাখিয়া এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ ও গতিসম্বন্ধীয় গবেষণার ন্যায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নয়। তাঁহারা জড়বিদ্ পণ্ডিত, সুতরাং জড়বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণরূপ বহু কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুলসকল, তোমাদের স্থিতি জড়জগতে নয়; তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আব্দার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া! হা প্রভু নিত্যানন্দ! হা প্রভু অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস! বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাক্, তাহা হইলে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া দিবেন। হে বৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৯। লুপ্ত গৌর-জন্মস্থানের উদ্ধার হইলে ধর্ম্মব্যবসায়িগণের কিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হইয়াছিল?

"প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকাশ হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেকপ্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা শয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

১০। "শ্রীমায়াপুরের প্রথম শ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসবকে খেতুরীর মহোৎসবের সহিত তুলনা করা যায় কেন?

"শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। * * * প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব-সন্দর্শনার্থ বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের উন্নতির বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বাধাসকল তিরস্কার করত শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

—'শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহামহোৎসব', সঃ তোঃ ৬।১

১১। শ্রীমায়াপুরে ধূমধাম করা কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত ?

শ্রীমায়াপুরে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বড় ধূমধাম করা প্রভুর অভিপ্রেত নহে।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১২। শ্রীযোগপীঠে শ্রীমহাপ্রভুর ভাবি-মন্দির সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবিষ্যদ্-বাণীটী কি ?

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥" —নঃ মাঃ, ৫ম অঃ

১৩। কাহারা ভাবি-বৈষ্ণব-জগতের প্রধান উপকারী ?

"যাঁহারা সেই মায়াপুরের সেবাস্রোতঃ প্রবল রাখিবার যত্ন পাইতেছেন, তাঁহারা ভাবি-বৈষ্ণব-জগতের প্রধান-উপকারি-জনের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১৪। শ্রীমায়াপুর যে ভাবি-কালে বিশ্ববিখ্যাত হইবেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তি-বিনোদের ভবিষ্যদ্-বাণীটী কি ?

"জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসিবার আশা করিবেন।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ১২।১

১৫। শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরকে লইয়া যাইবার জন্য রূপানুগবর শ্রীভক্তি-বিনোদের বিচারটা কি ?

"আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে॥
সেই বটে এই যতি, আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৭০-৭৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না; তাহাতে তাহাদের বদ্ধদশার ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা, ইহা জানিলে ভগবৎ স্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবার নিযুক্ত রাখিবে।

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ ঘা জুতা আর পাঁচশ' ঘা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে,—'মন, তোমার পরচর্চ্চা করিয়া কি লাভ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?' "পর-চর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" 'পর-চর্চ্চা'-শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বরবিমুখ জনের চর্চ্চা। উহার দ্বারা আত্মার অমঙ্গল হয়, কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইয়া থাকে।

হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

'আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই বিবেক অনেক সময় আমাদের হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ।

যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের-প্রসাদের নামে বিষয়ীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধা বা যাবতীয় ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব।

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ হরণ হইবে, অপরাধযুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহুজন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কিছু হইবে না। অনর্থ থাকাকালে কৃষ্ণসেবা উন্মেষিত হয় না—চেতনবৃত্তির উন্মেষ হয় না, ভোগ্য ধারণাকে কৃষ্ণ জ্ঞান হয়। মায়াবাদী—ত্যাগী, আর মিছাভক্ত—কৃষ্ণভোগী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিলে পূর্ণতম জগন্নাথ দর্শন হয় না। এই চক্ষুদ্বারা জগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্ভব। শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ দর্শন হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা বলেছেন—চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন কর—কৃষ্ণভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা করা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না করলে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি ক'রে হ'বে? শেষে হয় ত' নির্ব্বিশেষ-বিচারই বরণ ক'রে ব'সবো। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না ক'রলেই অসুবিধায় পড়্‌তে হ'বে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক চৈতন্যের কথা বিচার করুন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন?—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"। শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যেকাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং'-অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান করিতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের উপর নির্ভর করাই একমাত্র উপায়।

এই পৃথিবীতে জ্ঞান-সংগ্রহ করার স্পৃহা থাকাকাল পর্য্যন্ত সেই পূর্ণবস্তু "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি" তাঁ'কে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞান দোষজনক কিসের জন্য? এসব জ্ঞানের অন্য পক্ষ থা'কবেই। একমাত্র সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবার আবশ্যক হয় না। উহাকে নড়াইতে পারা যায় না। যা'কে স্থানচ্যুত করা যায়, তা' একমাত্র সত্য নয়। অন্যটা তর্কপথ। যে পন্থায় আমরা বিরুদ্ধ যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অসত্যতা উদ্‌ঘাটন করবার অধিকার পোষণ করি, তা'তে সেই শব্দগুলির দোষ নির্দ্ধারিত হউক, এইরূপ অবসরের সুবিধা দেই। একমাত্র সত্য—এরূপ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-জাত সত্য নয়। ইন্দ্রিয়জ চেষ্টারূপ পর্ব্বত-আরোহণ-কার্য্যদ্বারা কোথায় পৌঁছাব, তা' কেহ জানে না। উহা

গণিতের বিচারের অসীমের বিচারের মতন ধ'রে নেওয়া জিনিষ। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের খিলানের এদিক্‌কার ভিত্তি আমরা বহির্জ্জগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে—যা'র সম্বন্ধে কিছু জানি না, সেদিকে এই অভিজ্ঞান দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরূপ জ্ঞান-সংগ্রহদ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে সুবিধা হ'বে না।

বৈদিক-পন্থায় শ্রবণ করতে হবে; তজ্জন্য আনুগত্য স্বভাবের আবশ্যক। সে জ্ঞানটা সেদিক থেকে আসবে। যেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পাচ্ছি না, সেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে, তা'র অনুগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তাহ'লে নিত্যমঙ্গলের কথা শুন্‌তে অবকাশ পা'ব না। যদি জানেন, তাঁ'র কাছ থেকে জানতে হ'বে। যদি আমি জানি—এইরূপ অভিমান হয়, তা'হলে জান্‌তে পার্‌ব না। যেকালে সন্দেহ হ'বে, ব'লতে হ'বে এবং জবাবটা ধৈর্য্যের সহিত শুন্‌তে হ'বে, অমনোযোগী হ'লে শুনা হবে না। পরিপ্রশ্ন হোক্, কিন্তু প্রশ্নটা ক'রে জবাবটা শুন্‌বো না—এরূপ অধৈর্য্য হয়ে প'ড়তে হবে না—প্রশ্নের উদয়ে প্রত্যুত্তর পা'বার চিত্তবৃত্তি থাকার দরকার। অন্য বিষয়ের চিন্তা ক'রলে—পুরাণো কথা মনে হ'লে প্রশ্নের উত্তরের সময় অমনোযোগী থাক্‌বো। জবাবটাকে কার্য্যে পরিণত ক'রবো। নইলে প্রশ্ন করি কেন? ঘড়িতে দম দিয়ে আবার সমস্তটা খুলে দেবো না। ঘড়ির সময় দেখ্‌বার পর একটা কাজ থাকা উচিত। যদি কেবল ঘড়ি দেখতে থাকি, তাহ'লে কাজ হ'বে না, পরে একটা কৃত্য আছে—তা'র নাম অভিধেয়।

জ্ঞানটা পা'বার পরে সেই কার্য্য করি। জ্ঞানটা পাবার পরে সেবা। সেবার কথাটা জা'নতে হবে—মনোযোগ দিয়ে। নিজের সন্তুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্ন ক'র্‌বো। মনোযোগেব সহিত জবাব শুনে সেবায় লাগিয়ে দেবো। তর্কের পথ বা জ্ঞানের পথ বিভিন্ন। শুনার পথে শব্দ ব'লে একটা জিনিষ আছে—যা' দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করে। আমরা চতুর্থ মানের তুরীয় সংবাদ জানি না। সেটা এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। তৃতীয়মানের শব্দ বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গম্য। বেশীমানের—পঞ্চমমানের কথা—'মধুর-মুরলী পঞ্চম জুযে'—যমুনার ধারের পঞ্চম-মানের কথা তুরীয়মানের ভিতর থাকাকালে শুনতে পাওয়া যায় না। তুরীয় রাজ্যে চারটে বৃত্তচতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়। একটা বৃত্তচতুর্থাংশ দেখে এখন সংবাদ পাচ্ছি। চারটে দেখলে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়। একপাদ বিভূতি এই জগৎ তিনটে বিষয়ে—দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে আবদ্ধ ক'রেছে। গোলোক বস্তুর—সমস্ত বস্তুটার পূর্ণতা দর্শন হ'চ্ছে না।

অৰ্দ্ধাংশ আমাদের দর্শনীয় হয়। ১৮০ ডিগ্রি দেখি আমাদের চোখের দ্বারা।

আর তুটো অপরার্দ্ধ দে'খতে পাই না। বৈকুণ্ঠ বর্ণনে এরূপভাবে অর্দ্ধাংশ দেখতে পাচ্ছি। কেবল নীচে থেকেই দেখবো বিচারটা ছেড়ে দিয়ে যদি অধিকতর বিশ্রম্ভের সহিত অগ্রসর হই, তা'হলে দেখতে পা'ব যে, সেই বস্তুটা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে যে রকম সম্বন্ধ পাই, তা'তে নির্ব্বিশেষ অবস্থা চরম লক্ষ্য হয়। পঞ্চমমানের পূর্ণতা লাভ করতে হ'লে কৃষ্ণতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব বিচার প্রবল হয়। কৃষ্ণযোষিৎসম্বন্ধ সাধারণ সাহিত্যে নাই—চতুর্থমানে নাই—সাধারণ দর্শনে নাই। সম্ভ্রমপূর্ব্বক আর আড়াইপ্রকার রস বাদ দেওয়া হয়। কৃষ্ণ-যোষিৎসম্বন্ধ চতুর্থ মানেও বুঝতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব একথাটা ব'লে দিয়েছেন। চতুর্থ আর পঞ্চমমানের কথা এদেশে এসেছে। অল্প সময়ের মতো এদেশে এলেও তা' ধ'রে নিতে পারা যায়। যাঁ'রা ভাগ্যবান্, তাঁ'রা ধ'রে নিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জা'নবার ইচ্ছা হ'বে যাঁ'র, তাঁ'র সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন ব'লেছেন—"চৈতন্যবিমুখ নিজজনে জানি পর।" দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ ক'রতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসিগণ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন ব'লে থাকেন, কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাঁ'দের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

প্রমাণ ও প্রমেয়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩১ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্

শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও

স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না। যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা ঐ যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।

অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রজার জননীস্বরূপা, সমানরূপা এক অজা নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজা পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজপুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্তভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ,—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ মন্ত্রে)

ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
(ঈশাবাস্য ৫ম মন্ত্র)

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী
পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশাবাস্য ৮ম মন্ত্র)

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু ও পরিভূ। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যপদার্থসকলকে তত্ত্বিবিশেষদ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"

শ্রীভগবান্ বিভু হইয়াও মূর্ত্ত—'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।' শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃত সমুদ্র—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।' (তৈত্তিরীয় ২।৭)

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ডতত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ স্বতন্ত্র। সেই ভগবানকে লাভ করিবার সহজ ও সরল পথ—ভক্তিমার্গ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবানকে লাভ করেন। অন্যান্য সাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। একাদশস্কন্ধ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রিয়সখা শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব, মদীয় সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্যধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ হয়, আর বহুজন্মের সুকৃতি-প্রভাবে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয়ের সুযোগ-সৌভাগ্য হয়। ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধা। গুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরপরাধে হরিভজনে নিযুক্ত হইতে হয়। 'ভক্তি'-শব্দে—ভজন। ভক্তি—অভিধেয় তত্ত্ব,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১-১৫৪,)

আমরা শাস্ত্রে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের কথা পাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তির কথা বলিয়াছেন,—

শ্রবং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩।২৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ-এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

ভক্তি অমৃতস্বরূপ। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভক্তি যাজন করা যায়। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে আমরা পাই,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সকল মায়িক ভেদাবরণশূন্য কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষতাবর্জ্জিত, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশসেবন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই 'ভক্তি' বলিয়া কথিত হয়।

"কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।" সেই ভক্তিধর্ম্ম অনুষ্ঠান আমাদের একমাত্র কৃত্য। ভক্তিদ্বারা যথাযথভাবে ভগবানকে জানা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীঃ ১৮।৫৫)

আমি যে স্বরূপ ও স্বভাব-বিশিষ্ট, তাহা শুদ্ধভক্তি উদিত হইলেই জীব আমাকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন। সেই ভক্তিবলে (প্রেমভক্তি) বস্তুতত্ত্ব ও স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, আমার নিত্যলীলায়, নিত্যপরিকরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

জীব—নিত্য-কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা এই জগতে আসিয়াছি। সেই নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনধাম আমাদের নিত্য বাসস্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা লাভ করিতে হইলে শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রয়োজন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী নিত্যতত্ত্ব। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিন তত্ত্ব নিত্য ও অপ্রাকৃত।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণভক্তি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য অভিলাষ-রহিত। নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান, কর্ম্মজড়স্মৃত্যাদির নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম। ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যভ্যাসাদি অমিশ্রিতভাবে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত (কায়মনোবাক্যে) শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার অনুশীলনই 'উত্তমা ভক্তি'।

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা, গীতা, ভাগবত, গোস্বামিগ্রন্থ, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
ইহ ভক্তি পরম-কারণ॥"

—**শ্রীরামগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী**

পতিতপাবন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তিপথে কোন বাধা আসিলে শুদ্ধভাবে শ্রীএকাদশী-তিথি পালনে বা বৈষ্ণব-গুরুদর্শনে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনে তাহা বিদূরিত হয়। বৈষ্ণবের পক্ষে কোন কর্ম্মফলাদিজনিত প্রায়শ্চিত্তের কাল্পনিক বা স্মার্ত্তবৎ বিধান নাই। কারণ ভক্তি-পথে সম্বন্ধাধিদেব স্বয়ং কৃষ্ণই। তাঁহার শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই—ইহা শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখোক্তি। বিবাদ উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণের পক্ষে গ্রাম্য-ব্যবহারে উন্মত্ত হওয়া শাস্ত্র ও সদাচার-বিরুদ্ধ। যথা—

"বিষ্ণোর্ভাগবতানাঞ্চ প্রতীপন্থাকৃতিঃ সদা।
পরস্পরবিরোধে তু বিশিষ্টস্যানুকূলতা॥
প্রিয়ং বিষ্ণোস্তদীয়ানামপি সর্ব্বং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মমপ্যপ্রিয়ং তেষাং নৈব কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ॥
হরিভক্তাবনুচ্চস্তু বর্ণোচ্চোঽপি ন পূজ্যতে।"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২৯।২১)

অর্থাৎ বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্টাচরণ কখনই করিবে না। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যস্থ উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশ অনুসরণ করাই বিধি। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রিয়কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মের ন্যায় আচরণও যদি বৈষ্ণবের প্রীতিকর না হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুষ্ঠান করিবে না।

জন্ম-সূত্রে বৈষ্ণব নহে

এবম্বিধ দুর্ল্লভ প্রেমভক্তিই বৈষ্ণবগণের প্রাণ। যে ভক্তি নিখিল পুরুষার্থবর্গের জননী; যিনি তাঁহার আশ্রয়গ্রহণকারীকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষাও সমধিক আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় অনিত্য বিষয়সুখ হইতে সত্ত্বই বিমুক্তি লাভ করা যায়, পুনঃ ব্রজবধূগণের ন্যায় শ্রীরাধারমণের পদাম্বুজযুগলই যাঁহার প্রধানতম আশ্রয়, সেই ভক্তিদেবীর সর্ব্বতোভাবে সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত অসংখ্য মঠাশ্রমাদিতে ভক্তি—অনুকূল এবং প্রতিকূল কার্য্যাবলীর সিদ্ধান্ত-সমন্বিত শাস্ত্রাদির সহিত পারমার্থিক গুরুবর্গ এবং গোস্বামিগণ প্রেরিত হইয়া থাকেন। এইরূপে স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনই বৈষ্ণবদিগকে নিত্যকাল পালন-পোষণ করিয়া থাকেন।

তৈত্তরেয় ব্রাহ্মণে (১ম পঞ্জিকা, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড) বলিতেছেন,—

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ।
স্বেয়ৈবেনং তদ্দেবতায়া স্বেনচ্ছন্দা সম্বর্দ্ধয়তি॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরা বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। 'বিষ্ণুর্দেবতাঽস্য বৈষ্ণব'। জীব কি-প্রকারে 'বৈষ্ণব' হইবে? 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'। শ্রবণের দ্বারা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত যে কোন কুলজ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। জন্ম বা বংশের অপেক্ষা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' জন্মসূত্রে নহে। কেবল শৌক্রজ জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যবস্থাপিত হওয়ায় সনাতন-ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। বৈষ্ণবগণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। তাঁহারা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন না। দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। যথা,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

কৃষ্ণ-বিষ্ণু বিচার

প্রশ্ন হইল, মহাশয়! কৃষ্ণ-কৃষ্ণ যে করে, তাঁকে 'বৈষ্ণব' কেন বলা হইবে? অথবা বিষ্ণু-স্মরণকারীর 'কৃষ্ণ-ভক্তপদ' কি-প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শাস্ত্রমর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া বলিতেছেন,—

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহ কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥

* * *

সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১২-১১৫)

সম্যগ্‌রূপে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এবম্বিধ বিষ্ণুর বিশেষ পরিচয়টি দিয়াছেন। যথা—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

রাসক্রীড়াপরায়ণ যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণ সেই শ্রীমদনমোহন 'বিষ্ণুর' উপাসক। ব্রজবধূগণের সহিত সেই বিষ্ণুর রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ্‌—কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন। এই 'বিষ্ণু'দ্বারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত আশা প্রকাশ করিয়াছেন,—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

অর্থাৎ—"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৩৩)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী প্রাণী-মাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।

এরূপভাবে জীবসত্তায় সম্ভাব্য সকল অধিকারের অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় রচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সকল জীবকে নিত্যকাল আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের মতই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনাদি ও অনন্তকালের Universal Religion—সনাতন জৈবধর্ম্ম; এবং বৈষ্ণবই সেই প্রেমময় ভগবানের প্রিয়তম পাত্র। শাস্ত্র তাঁহার সম্মান ও প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন; যথা—(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১৩।২)

"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি, তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি, সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

হে বৈষ্ণব ঠাকুর! তোমার দর্শন লাভ—চক্ষুর ফল, তোমার মত গুণবানের গাত্রস্পর্শ করাই শরীরের ফল, তোমার গুণ-কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল। এই জগতে ভক্ত-ভাগবতসঙ্গ সুদুর্ল্লভ।

"দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মণ্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥" (ভাঃ ১১।২।২৯)

জন্ম-মৃত্যুময় সংসারে মনুষ্যদেহ লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ। বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন বৈষ্ণব-সঙ্গ তদপেক্ষাও সুদুর্ল্লভ।

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমময় হৃদয়কে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যথা,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুগণ আমার হৃদয়-স্বরূপ। আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের হৃদয়ে বাস করি। আমাকে ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না। আমিও তাঁহাদের ছাড়া অন্য কিছুর আদর করি না।

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনামের মহিমা

(১)

বিশ্ব জুড়ে ঝরে যেন অগ্নি-বৃষ্টি,—
শেষ বুঝি হয় সব সৃষ্টি ;
কোথা বিন্দু শান্তি নাই,
নাই ভাই ভাই ;
দ্বন্দ্বে ভরা
ধরা ;

(২)

ধন-মদ-মত্ত বড় বড় দেশ,—
সেজে আছে যেন যুদ্ধ-বেষ ;
মৃত্যু-অস্ত্র হ'চ্ছে জমা,
নাহি কোথা ক্ষমা,
নাহি দয়া-
মায়া ;

(৩)

বৃহৎশক্তি সদা মাথা উঁচু করে,—
দন্তভরে টুঁটি চেপে ধরে,—
তুচ্ছ করে আর সবে
মহা ভীম রবে ;
কূট ছলে-
বলে ;

(৪)

মন যা'র সদা থাকে বাঁকা বাঁকা,—
বড় শক্ত তা'রে সোজা রাখা ;
কীটে ভরা কলি-যুগে
দুষ্ট রোগে ভুগে
হয় জীর্ণ-
শীর্ণ ;

(৫)

বহু রাষ্ট্র মিলে তৈরী রাষ্ট্র-সঙ্ঘ,—
প্রতি রাষ্ট্র তার এক অঙ্গ ;
উচ্চে থাকা রাষ্ট্র কভু
মানে না-কো তবু
অন্য পথ-
মত ;

(৬)

রক্ত দিয়ে রক্ত ক্ষয় হ'য়ে যায়,—
দেশে শক্তি শেষ হয় প্রায় ;
মৃত্যু যেন তুচ্ছ অতি,—
নাই তার গতি ;
সব শেষে
এসে ;

(৭)

ধনে জনে তেজে ভরা যার চিত্ত,—
ভাবে—তা'র কাছে সব নিত্য ;
চলা যায় খুশী-মত ;
যত্র-তত্র পথ,—
বলে মুখে
সুখে ;

(৮)

বড়-ছোট সব রাষ্ট্র এক হও,—
"গৌর-বাণী" সদা চিত্তে লও ;
বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ হবে
এই মহা ভবে ;
করো প্রাণ
দান ;

(৯)

রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি সত্যপথে চলে,—
শুদ্ধ-স্বচ্ছ-ন্যায়-নীতি-বলে ;
টানে যদি সব মন
ভাবি' নিজ-জন
তবে জয়
হয় ;

(১০)

ধর্ম্ম ওরে, ধ'রে আছে সব কিছু,—
তার কাছে নেই উঁচু-নীচু
সেবা, ত্যাগ, ভক্তি, নিষ্ঠা,
আর সব বিষ্ঠা,
হীন মতি
অতি ;

(১১)

করযোড়ে যবে মাতৃ-গর্ভে থাকি,—
"গৌর-নাম" সদা মনে রাখি,
ভূমি স্পর্শে মায়া আসে ;
স্মৃতি দূরে ভাসে,
কোথা যায়
হায় !

(১২)

সারা বিশ্ব ঘিরে আছে 'হরিনাম'
সে তো "হরে কৃষ্ণ হরে রাম",
এই মন্ত্র হৃদি মাঝে
যেন নিত্য 'রাজে,
ভক্তিবেশে
এসে ।

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,** সেবাসুহৃদ, সাংবাদিক পি. টি. আই.

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর]

যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সাধুসঙ্গের পরিবর্ত্তে যাহাদের ভাগ্যে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ঘটে, তাহাদের সেইরূপ রুচিই প্রবল হয়। যোষিতে অভিনিবিষ্ট ও যোষিৎ—উভয়সঙ্গই জীবকে সত্য-শৌচাদি মানবোচিত ধর্ম্ম হইতে অধঃপতিত করে। এইজন্য ইন্দ্রিয়পর যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে অসাধুসঙ্গ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি। উভয়েই কলির স্থান। যেখানে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গের কারখানা খোলা হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; তথায় নিত্য কলি বিরাজমান। বৈধ স্ত্রীতে আসক্তিও অধর্ম্মের সেতু। স্ত্রীসঙ্গ ত' কলির স্থানই, এমন কি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। "কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগতে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ে ত্যাগী সাধকগণকে সাবধান করিতে গিয়া গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"বৈরাগী ভাই, গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-দরশন।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাই প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

কামিনীর দাস হইলে জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রীতি লাভ সুদূরপরাহত হইয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারই কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের প্রধান অন্তরায়। স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া চিদ্ধর্ম্মে বিচরণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা করিয়া গেলে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ অনায়াসসাধ্য হইবে। তাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত "প্রেমবিবর্ত্তে" বলিয়াছেন,—

"কভু এ সংসারে, স্ত্রী পুং-ব্যবহারে,
না হয় পীরিতি-ধন।
চর্ম্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ত,
নহে নিত্য সংঘটন॥

গোপীভাব ধরি', চিদ্ধর্ম্ম আচরি',
পীরিতি সাধিবে যেই।
স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার,
ভিতরে গোপিনী সেই ॥"

জড়প্রতিষ্ঠা বাঘিনীসদৃশ আত্মঘাতক ; বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ভবপারের পাথেয়-স্বরূপ

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ "মনঃশিক্ষায় জড়প্রতিষ্ঠাকে বাঘের সহিত তুলনা না করিয়া বাঘিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কারণ ব্যাঘ্রী যেরূপ ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিক হিংস্র, তদ্রূপ জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অন্য জড়ীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষাপেক্ষা অধিক অহিতকর। জড়প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছ ও ঘৃণার্হ। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠা গুরু-বৈষ্ণবগণেরই প্রাপ্যবস্তু হওয়া উচিত। সে প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাহার সহিত জড়প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নাই। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা দুইটী বিপরীতধর্ম্মী অবস্থা। "প্রতিষ্ঠার" স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪।১৪৬-১৪৭)

উপরিউক্ত পয়ারের 'অমৃতভাষ্যে' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"যিনি প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় না—ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদও চৈঃ চঃ মধ্য ৪।১৪৬-১৪৭ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"বদ্ধজীবসকলের অনেকেই মৎসরতা ধর্ম্মসম্পন্ন। যিনি সুখ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাচরণে মৎসরগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তজ্জন্য প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির হিংসাপরায়ণ জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা পাইবার পরিবর্ত্তে হিংসিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা দৈন্যবশে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদিগকে মৎসর-সমাজ নিতান্ত অসমর্থ ও দীন-জ্ঞানে দয়া করিয়া প্রতিষ্ঠামূলক উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ জড়জগতে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক নহেন। পাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা

হয়, তজ্জন্য বৈষ্ণবরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী লোকচক্ষের অন্তরালে নিজ ভগবৎপ্রিয়ত্বের ঘটনা আবৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনন্য কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টা দর্শনে জগতের সকললোক ঐ ঘটনাকে শ্রীভগবানের তদীয় ভক্তের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাই শ্রীপুরীপাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণে নিজের ভাবগৃহের অন্তরালে লুক্কায়িত কপট দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠাবর্জ্জিত বলিয়া ছলনা করেন, তাহাদের বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।"

"হরিকথা-প্রচারকগণ প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক নহেন। তাঁহাদের যে হৃদয়-সিংহাসনে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামগ্রহণ করেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীর অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর ? কেহ কেহ বলেন,—"প্রচারে প্রতিষ্ঠা আসিবে, সুতরাং প্রচার করা সাধকের পক্ষে উচিত নহে।" কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসিগণের অন্তঃকরণেও প্রতিষ্ঠাশা কিছু:কম নহে। "প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব।"

প্রতিষ্ঠা আসা কিছু দোষের নহে, প্রতিষ্ঠায় অভিভূত হওয়াই দোষের। প্রকৃত গুরুসেবক প্রতিষ্ঠায় গুরুপাদপদ্মের উজ্জ্বল মহিমাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "গুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত শিক্ষাই এ হেন প্রতিষ্ঠা আনয়ন করিয়াছে, আমার কোন কার্য্যে উহা আসে নাই। সুতরাং উহা গুরুপাদপদ্মেরই প্রাপ্য"—ইহা জানিয়া গুরুসেবক তৎপাদপদ্মে ঐ প্রতিষ্ঠা অর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ 'মনঃশিক্ষায়' গাহিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের কাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।

প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥

* * * *

ব্রজবাসিগণ,— প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁরা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব ॥"

বৈষ্ণবগণই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যথোচিত প্রয়োগস্থলের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য চিদানন্দময় বস্তু। সেই ভগবানের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেবা করা কর্ত্তব্য। যিনি ভগবৎসেবার নিমিত্ত ধন উপার্জ্জন করেন, কামিনীকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন ও প্রতিষ্ঠাকে গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে অর্পণ করেন, তিনিই শ্রীভগবানের অব্যভিচারিণী সেবার অধিকারী বা সেবা করিতে সমর্থ। নাম-সাধকের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কোন কামনা নাই। তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই স্বীকার করিয়া থাকেন, প্রয়োজনের অধিক বা কম গ্রহণ করিয়া পরমার্থ হইতে চ্যুত হন না।

ভক্ত যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করেন, তিনি বিষয়ীর ন্যায় বিষয়ে লিপ্ত হইয়া আত্মবিনাশ করেন না; আবার প্রয়োজনীয় বিষয়-গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও করেন না। প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব হরিসেবায় উদাসীন থাকিয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা নিজের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে ব্যস্ত, আর বৈষ্ণব প্রাপঞ্চিক জড় উন্নতির প্রতি উদাসীন থাকিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ভোগী বা ত্যাগীর অভিনয় করিবার সময় পান না।

—**শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[হাজী দেশারথ কলেজ, পাঠানখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তাং ১২।৫।১৯৮৫]

দ্বিতীয় অধিবেশন

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী ! গতকাল আমরা সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সামান্য কিছুমাত্র নিবেদন করেছি। আজ বিশেষ-ভাবে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু বহু প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। সে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গেলেও সময় লাগবে। যদিও প্রশ্নগুলো অপ্রাসঙ্গিক নয়, সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা।

সনাতন ধর্ম্ম মানে হচ্ছে—অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী আলোচনা। সনাতন ধর্ম্ম যাতে ঠিক ঠিকভাবে যাজিত হতে পারে, সেই অন্বয়মুখী অনুশীলন একরকম, আর তার বিরোধীভাব যেগুলো রয়েছে, সে-সম্বন্ধে সমালোচনা অন্যপ্রকার। কিন্তু দুটোই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। শাস্ত্র বলছেন,—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ কর, সাধুসঙ্গ—সৎসঙ্গ গ্রহণ কর। কিন্তু যদি দুঃসঙ্গ সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা না থাকে আমাদের, তাহলে দুঃসঙ্গ ছাড়তে পারি না ; আবার সৎসঙ্গ সম্বন্ধে যদি বাস্তব ধারণা না থাকে, তাহলে ওটা গ্রহণও করতে পারি না। সেইজন্য শাস্ত্রে বিচার-যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত হয়েছে,—তুমি খারাপটাও আলোচনা কর এবং সদ্ভাবটাও আলোচনা কর। দুটোই পাশাপাশি জেনে বুঝে নিয়ে একটাকে ছাড়, আর একটাকে গ্রহণ কর।

আমরা গতকাল সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—সনাতন ধর্ম্ম গুরুবাদী ধর্ম্ম। পরে বলেছি,—সনাতন ধর্ম্ম বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্যাখ্যাটি দেওয়ার সুযোগ হয় নাই। আজ সেই গুরুবাদী ধর্ম্মের গুরুতত্ত্ব নিয়েই আমি আলোচনা শুরু করছি। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন, অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্যগোষ্ঠী, দৈত্য, দানব ইত্যাদি সব সৃষ্টি করেছেন। সেই প্রেমময় ভগবান্ প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করেন। তারপরে উভচর প্রাণী—Amphibious, উরগ প্রাণী সৃষ্টি করেন। তারপর পাখী, পশু ইত্যাদি সব সৃষ্টি করেন। এতসব সৃষ্টি করেও সেই প্রেমময় ভগবানের মনে শান্তি নাই। কেন ?—এদের সঙ্গে আমার ভাবের আদান-প্রদান হবে না। তাই সেই নরাকার পরব্রহ্ম তাঁর আকারের মত একটা আকার দিয়ে মানবকে সৃষ্টি করলেন। দিয়েছেন কি তাকে ?—জ্ঞান, বিবেক,

বৈরাগ্য, বিচক্ষণতা প্রভৃতি সবকিছু দিয়েছেন একাধারে। সেই মানবের মধ্যে বিচার-যুক্তি দিয়েছেন, বলে দিলেন—ভাল-মন্দ বিচার করে তুমি জগতে চল।

বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা—এদেরকে একটা স্তরের মধ্যে ফেলেছেন। এদের বলা হয়েছে, আচ্ছাদিত-চেতন। সাধারণতঃ বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতাকে বলা হয়েছে। তারপরে বলা হল—সঙ্কুচিত-চেতন। সাধারণতঃ **Reptiles**—উরগ প্রাণী এবং তার সঙ্গে পাখী-পশু হল সঙ্কুচিত-চেতন। পরবর্ত্তিকালে মানুষকে যখন সৃষ্টি করলেন তিনি, তখন তাকে বলা হচ্ছে মুকুলিত-চেতন মনুষ্য। সেই মানুষ যখন সাধন-ভজন শুরু করল সদ্‌গুরুর উপদেশ নির্দ্দেশ নিয়ে, তখন তাকে বলা হল—বিকচিত-চেতন মনুষ্য। সেই মানুষ যখন সাধনে সিদ্ধিলাভ করল, তখন তাকে বলা হল—পূর্ণ-বিকচিত-চেতন মনুষ্য। ঠিক এইভাবে চেতনতার ক্রমবিকাশ শাস্ত্রে জানিয়েছেন আমাদের। সুতরাং সব মানুষই সমান—এটা বলা চলবে না। স্কুল, কলেজে যেমন Gradation আছে বিদ্যাশিক্ষার, তদ্রূপ সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে সাধক-সাধিকার যে অধিকার বিচার, তার পার্থক্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে—এটাকে মেনে নিতে হয়। আমি যখন কিছু জানি না—বুঝি না, তখন যিনি জানেন—বুঝেন, তাঁরই শরণাপন্ন হতে হয়। সেই রীতি-নীতির কথা শাস্ত্র প্রথমেই জানিয়েছেন।

লেখাপড়া শিখি নাই আমি, আমার Guardian হাতে খড়ি দেওয়ালেন আমাকে একজন গুরুমশায়—পণ্ডিতমশায়কে এনে। তিনি আমার হাতটী ধরে শ্লেটে পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখলেন, আর আমাকে বললেন,—বল বাবা 'অ', আমি বললাম 'অ'; বল বাবা 'ক', আমি বললাম 'ক'। এইভাবে আমার অ, আ, ক, খ শিক্ষা হয়। কিন্তু সেই শিশু আমি যদি মাষ্টারমশায়কে বলি—এই অ-আ, ক-খ এর ইতিহাস-ইতিবৃত্ত বলুন। মাষ্টারমশায়ের ওটা জানা আছে, কিন্তু আমি ত' শিশু, আমি কি তখন বুঝতে পারব? প্রশ্ন হয়ত' করলাম কিছু, কিন্তু আমার বুঝবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু সেই শিশু বড় হয়ে যখন স্কুল-কলেজে পড়ে, তখন অ-আ, ক-খ-র ইতিহাস-ইতিবৃত্ত, A B C D-র Annals-Antiquities জানতে পারে, সে সুযোগ আছে। আমি যখন কিছু জানি না, বুঝি না, ভগবান্ জ্ঞান দিয়েছেন আমাকে, কিন্তু সে জ্ঞানের স্ফূরণ হয় নাই আমার; যেহেতু আমার আক্ষরিক বিদ্যালাভ—অ-আ, ক-খ-র জ্ঞান হয় নাই, সেইজন্য একজন গুরুমশায় বা পণ্ডিতমশায়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে অ-আ, ক-খ শিখবার জন্য। এই জগৎ শিক্ষাক্ষেত্র, পরীক্ষাক্ষেত্র। এখানে শিক্ষার্থী—বিদ্যার্থী আমরা শিক্ষালাভ করব, পরীক্ষা দিয়ে যাব। সেই কথাই সনাতন শাস্ত্রে বুঝানো আছে। আমি যদি

কিছু জানতে চাই, শিখতে চাই, কিছু জ্ঞান আহরণ করতে চাই, তাহলে আমার অবশ্যই কিছু যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সেই যোগ্যতার কথা গীতাশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু তখনই কিছু উপদেশ করতে পারেন, যখন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তিনটে অবশ্য গুণ দেখতে পাবেন। সেই তিনটে গুণ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি। প্রথম অধিকার প্রণিপাত—আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমাকে দয়া করে জানিয়ে দেওয়া হোক, বুঝিয়ে দেওয়া হোক—এইরূপ। দ্বিতীয় অধিকার পরিপ্রশ্ন—প্রশ্ন করব আমি, জানব, বুঝব, শিখব বলে। মাষ্টারমশায়ের বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষা করবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, আমি সে-ভাব পোষণ করছি না। আমি জানব বলে, শিখব বলে প্রশ্ন করব, যাকে বলা হয়েছে **Honest enquiry after Truth**। তৃতীয় অধিকার **Serving temparament**—সেবোন্মুখ বৃত্তি। এই তিনটে সদ্‌বৃত্তি যদি থাকে তবে শিক্ষক মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয় আমাকে কিছু বলতে পারেন, শিখাতে পারেন, উপদেশ করতে পারেন। এটাই শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থীর অধিকার বিচার।

গুরুবাদী ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম এসেছে কিভাবে?—শ্রৌত-পরম্পরায়। স্বয়ং ভগবান্ হচ্ছেন সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রবক্তা। তিনিই সনাতন ধর্ম্মের মূল ধারক-বাহক। তিনিই সমস্ত তত্ত্বদর্শনটা জানিয়েছেন পরম্পরাক্রমে। আদৌ শ্রীভগবান্ উপদেশ করেছেন লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা উপদেশ করেছেন নারদ ঋষিকে, নারদ উপদেশ করেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে। সেই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব, সেই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রৌত-পরম্পরায় এসেছে কানে কানে। সেইজন্য তার নাম হয়েছে শ্রুতি। বেদ বা উপনিষদের অপর নাম হল শ্রুতি।—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥

তিনি (ব্রহ্মা) তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করেছেন এই ব্রহ্মবিদ্যা। এইভাবে জগতে প্রচারিত হয়েছে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব। আমরা সেই সুপ্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারেই জিনিসটা আলোচনা করতে চাই।

যদি প্রশ্ন করা যায়, ভগবানকে কে সৃষ্টি করলেন? তার উত্তর শাস্ত্র দিয়েছেন,—ভগবানকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি স্বতঃপ্রকাশিত—**Full effulgent** বস্তু সেই ভগবান্। সেকথা গীতা, ভাগবতে, বেদে, উপনিষদে

বুঝানো হয়েছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।"—হে জীবসকল! জান, আমাকে কেউ সৃষ্টি করেন নাই, আমি স্বয়ং আবির্ভূত তত্ত্ব।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

সৃষ্টির আদিতে আমি ছিলাম, বর্ত্তমানে আমি আছি এবং মহাপ্রলয়ে আমিই থাকব। অনন্ত বিশ্বে অনন্ত জীবাত্মা **Latent**—সুপ্ত অবস্থায় আমার মধ্যে অবস্থান করবে। ভগবান্ বলছেন,—আমি সবাইকে সৃষ্টি করেছি, আমাকে কেউ সৃষ্টি করে নাই। "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়ন্তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ।" সেই ভগবান্ থেকে নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, দেবদেবী সব সৃষ্টি হয়েছেন। কৃষ্ণ নিজেই বলছেন,—

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ অহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতৌ মম মায়া-বিমোহিতৌ।

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আমি সৃষ্টি করেছি, শিবকে আমি সৃষ্টি করেছি। আদিসৃষ্টির পূর্ব্ব থেকে আমি আছি। 'ন ব্রহ্মা নেশানঃ'—ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানদেব—শিবও ছিলেন না। তাঁদের আমিই সৃষ্টি করেছি। ঠিক এই কথা ভগবান্ যেমন বলছেন, শিব-ব্রহ্মাদিও স্বীকার করেছেন শাস্ত্রে। ব্রহ্মা বলছেন,—"সৃষ্টামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।"—সেই ভগবানের আজ্ঞাবাহী হয়ে আমি গৌণ সৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছি। হর—শিবও প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। কথাগুলোর সঙ্গে মিল আছে। সুতরাং সেই যে পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্, তিনি সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন এবং অন্তেও থাকবেন।

ভগবান্ সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই কেন?—যে সৃষ্টি তিনি প্রথমে করেছেন, তাদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হবে না। এটাই ভগবানের অসন্তুষ্টির কারণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানব। সমস্ত সম্পদের অধিকারী করেছেন মানুষকে, দিয়েছেন পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার, বিচার-ক্ষমতা। সেই মানুষ যখন অহঙ্কারী হয়ে পড়ে, তখন সে কিছুই পায় না। যতদিন পর্য্যন্ত সে নিরহঙ্কার থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তার জন্য সব আছে।

কিভাবে চলব আমরা সমাজজীবনে? ভগবান্ কিভাবে আমাদের চলতে বলেছেন?—ভাল-মন্দ বিচার করে চল। সেগুলো সনাতন আর্য্যঋষিগণ বুঝিয়েছেন শাস্ত্রে। ভগবানের যে মৌলিক উপদেশগুলো—অবদান-বৈশিষ্ট্য, তা গীতা, ভাগবতে সুন্দরভাবে রয়েছে। ঋষিগণ সেই জিনিসটা আবার সাধনার

দ্বারা উপলব্ধি করে তার ব্যাখ্যা-বিবৃতি দিয়েছেন। সুতরাং আমরা সনাতন আর্য্য-ঋষিগণের নিকট চিরঋণী—সেইকথাও বুঝাচ্ছেন শাস্ত্র। এ সংসারে বসবাস করছি আমরা, ঋণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের বহুভাবে। ভগবান্ ছয় রকম ঋণের কথা বললেন আমাদের্। ভাগবতে উপদেশ করেছেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট ঋণ পরিশোধ করবার জন্য একটা প্রচেষ্টা আমাদের থাকে মনুষ্য-জীবনে। যদি এই ঋণ শোধ করতে না পারি, তাহলে পুনরায় আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। গীতা বলছেন,—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে ?' সুতরাং এই জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই কি আছে ? শাস্ত্র জানাচ্ছেন,—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত বার বার এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে—মায়িক সংসারে এসে আমাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে। জন্ম-মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার কর্ম্মফলভোগ, আবার স্বর্গ-নরকভোগ করতে হবে। যদি আমরা দুঃখ-ক্লেশপূর্ণ এই মায়ার সংসারে থাকতে না চাই, তখন ভগবান্ বলছেন,—দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার যে Process, Procedure আছে, সেটা তোমরা অবলম্বন কর। সেটা কি ?—ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান-ধারণা, সাধন-ভজন-প্রচেষ্টা এসেছে তখনই।

মানুষের হৃদয়ে যদি জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের উদ্রেক হয়, তার মীমাংসার একটা আকাঙ্ক্ষা বা প্রচেষ্টা তার থাকে। তার দ্বারাই আমরা কিছু জানতে, বুঝতে, শিখতে পারি। তত্ত্বজিজ্ঞাসা—কে আমি ? কোথায় ছিলাম ? কেন এ সংসারে এসেছি ? এখানে এসে কি করছি ? যদি ভগবানের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল আমাদের, সে সম্পর্ক হারিয়েছি কেন ? পুনরায় সেই সংযোগ রক্ষা করা চলবে কিনা ?—এই জাতীয় প্রশ্নই হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এ সকল প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ নিজেই দিয়ে রেখেছেন শাস্ত্রে। ঋষিগণ আবার সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা-বিবৃতি দিয়েছেন, সকল সংশয়-সন্দেহের মীমাংসা করেছেন।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

যদি এই জন্ম-মৃত্যুই এ সংসারে আমাদের একমাত্র প্রাপ্য হয়, তাহলে সন্তোষ বা শান্তি কোথায়? সেই প্রশ্নই ত' আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ করছেন তাঁর 'মোহ-মুদ্গরে'। সংসারে কি করছি আমরা?—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥

পরব্রহ্ম ভগবান্ কে? তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে? এ সম্পর্কের উদ্বোধন প্রয়োজন মনে করছি না আমরা। সুতরাং যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছি আমরা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা যদি হৃদয়ে উদিত হয়, তার জন্য যদি আমাদের প্রচেষ্টা থাকে—আমরা জানব, বুঝব, শিখব, তাহলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে কার? আমি ত' কিছু জানি না, বুঝি না। আমার থেকে যিনি বেশী কিছু জানেন, বুঝেন, তাঁর কাছে এগোতে হচ্ছে। সেই উপদেশ দেওয়া আছে। কি?—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

তুমি যাও সদ্গুরুর কাছে। তাঁকে তত্ত্বসিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা কর, তোমার আত্ম-কল্যাণবিষয়ক প্রশ্ন রাখ। কে তিনি?—'শ্রোত্রিয়ম্'—শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। কেবল শাস্ত্রজ্ঞান থাকলে হয় না। 'Devil can quote scriptures'—'শয়তানও ধর্ম্মের বুলি আওড়ায়!' সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞান থাকলে যে তিনি সবজান্তা হয়ে গেলেন, তা নয়। তাঁর ভিতরে সদ্গুরুর একটা আন্তরলক্ষণ আছে। কি?—'ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—ভগবন্নিষ্ঠ, ভগবানের প্রতি তাঁর একান্ত আনুগত্য ও নির্ভরতা আছে। সেইরকম নির্ভরতা জগতে কারও থাকতে পারে না। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।" সদ্গুরুর কাছে গিয়ে কি প্রশ্ন রাখব আমি?—উত্তমশ্রেয় জিজ্ঞাসা করব আমি। জাগতিক কিছু সুবিধার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব না, যেটা সাধারণ সবাই জানে, বোঝে। খাওয়া, পরা, থাকার প্রশ্নের মীমাংসা কমবেশী সকলেই দিতে পারেন, কিন্তু ওটা নয়, যেটা কেউ দিতে পারেন না, সেই বিষয়ে প্রশ্ন রাখতে হবে তাঁর কাছে। সেটা কি প্রশ্ন?—'উত্তমশ্রেয়ঃ' জিজ্ঞাসা করতে হবে। আত্মকল্যাণবিষয়ক প্রশ্ন রাখতে হবে। আমার আত্মকল্যাণ কিসে হবে—সেই বিষয়ে প্রশ্ন রাখতে হবে। কে সদ্গুরু?—"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥" তিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্র ও ভগবানে পারঙ্গত ও ভক্তিমান্। অদ্ভুত নির্ভরতা সেই ভগবানের উপর সদ্গুরুর। সুতরাং এইভাবে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একটা নিত্য সম্পর্ক আছে, যে

সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহলে সে সম্পর্ক বাস্তবে রূপায়িত হয় না, সেটাও সাধু-শাস্ত্র জানিয়ে দিয়েছেন। সদ্গুরু কি উপদেশ করবেন ? তিনি কি বলবেন, তুমি আমাকেই মান, আমার উপরওয়ালাকে মানতে হবে না ? আমার প্রিয় পরমোপাস্য যে ভগবান্, তাঁকে তোমার বুঝবার দরকার নাই ?—একথা সদ্গুরু কখনও বলবেন না। তিনি বলবেন,—আমার পরমপ্রিয় উপাস্য যে ভগবান্ তাঁকেই তুমি জান, বোঝ। তাঁর কথাই তিনি বলবেন। তিনি কখনও বলবেন না—তুমি আমাকেই সম্মান কর। কিন্তু তাঁকে সম্মান না করলে, ভগবান্‌কেও সম্মান করা হয় না। ভগবান্ নিজেই বলেছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

জান, সদ্গুরু কে ?—আমিই সদ্গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হই, আবার সদ্গুরুকেই জগতে আমিই প্রেরণ করি। সুতরাং তাঁকে কখনও অবহেলা, অবজ্ঞা, অবমাননা কর না।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—গুরু সর্ব্বদেবময়। তাহলে ভগবান্ ও গুরু ত' এক হয়ে গেলেন। সেরূপ অন্ধ কথা হয় নাই। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।" সাধুসন্তগণ গুরুতত্ত্ব কিভাবে চিন্তা করছেন ? ভগবান্ শ্রীহরি তাঁরই সদ্গুণরাশি সদ্গুরুতে সঞ্চারিত করেন, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে পরিচিত হন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যে বিষয়-বিগ্রহ, ভোক্তা-ভগবান্ সদ্গুরু তাহা নহেন। সদ্গুরু হচ্ছেন—আশ্রয়-বিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্। যিনি ভগবানের সেবাশিক্ষা দান করছেন জগতে, ভগবত্তত্ত্ব প্রদান করছেন, তাঁকে বলা হবে সদ্গুরু। সদ্গুরু কখনও বলবেন না—আমার পূজা কর, আমিই ভগবান্। তিনি তাঁর পরমোপাস্য ভগবানেরই মহিমা-মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশিত করেন, বিস্তৃত করেন। তিনি কখনও পায়ে তুলসী নেবেন না। বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অন্যের শ্রীচরণে তুলসীপ্রদান চরম সেবাপরাধরূপে গণ্য। আজকাল ত' বহু গুরু পায়ে তুলসী নিচ্ছেন। সদ্গুরুর কথা ওটা নয়।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুতত্ত্বকে প্রণাম করা হয়েছে। শাস্ত্রেরই শ্লোক, কিন্তু বুঝতে ভুল হচ্ছে। এই যে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, কে ইনি ? স্বয়ং ভগবান্ যখন গুরুরূপে আবির্ভূত,

প্রকটিত, তখন তাঁকে প্রণাম করা হয়েছে এই মন্ত্রের দ্বারা। "গুরুবেব পরংব্রহ্ম"। পরংব্রহ্ম মানে স্বয়ং ভগবান্, তাঁরই বিশেষণ হল পরংব্রহ্ম। গুরুরেব পরংব্রহ্ম মানে হল—পরব্রহ্মরূপী ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁকে প্রণাম করা হয়েছে। আবার প্রণাম মন্ত্র রয়েছে,—

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রণাম করলেন কাকে?—গুরু-তত্ত্বদর্শনকে প্রণাম করা হয়েছে। কোন সাধারণ মানুষকে প্রণাম করা হয় নাই। 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' যে গুরুতত্ত্ব—Ontology (তত্ত্ববিজ্ঞান) সেই গুরুতত্ত্বকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সদ্গুরুর সদ্গুরুত্বকে প্রণাম করা হয়েছে। সুতরাং শাস্ত্রে এইগুলো সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন গুরু যদি বলেন,—আমিই গুরু, ভগবান্ কেউ নয়, আমারই উপাসনা কর, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, তিনি গুরু-পদ-বাচ্যই নন। তিনি কিরূপ গুরু? তার উদাহরণ ভাগবতে দিয়েছেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

সেই 'গুরু' গুরু নন, সেই 'স্বজন' স্বজন নন, সেই 'পিতা' পিতা নন, সেই 'মাতা' মাতা নন, সেই 'দেবতা' দেবতা নন, সেই 'পতি' পতি নন। যিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে না পারেন, যিনি আমাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করতে না পারেন, তিনি সদ্গুরু নহেন। তারই কথা বলা হয়েছে শুক্রাচার্য্যের উদাহরণ দিয়ে। শ্রীবামনদেব দান গ্রহণ করতে গেছিলেন বলিরাজের সভায়। গুরু শুক্রাচার্য্য শিষ্য বলিরাজকে বললেন,—দিও না, দিও না তুমি; তোমার সব নিয়ে নেবে। যে ভগবানের থেকে সব কিছু পেয়েছি, তাঁরই খাই, তাঁরই পরি, 'তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হয়ে রই'—এই ত' আমার বিচার। আর আপনি কিনা বলছেন, তুই সব দিয়ে দিস্ না ভগবানকে। জানিস্ কে এসেছেন? স্বয়ং ভগবান্ এসেছেন। ভগবানেরই ত' দেওয়া সব জিনিস, তাঁর জিনিস তাঁকে দেব এতে বাহাদুরী কি আছে? কিন্তু শুক্রাচার্য্য নিষেধ করছেন,—"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা, মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্?" ওরে মূর্খ! তুই সব যদি বিষ্ণুকে—ভগবানকে দিয়ে দিবি, তাহলে তুই কি খাবি? তার মানে শিষ্যের যদি কিছু না থাকে, তাহলে গুরুদেবও কিছু ভাগ পাবেন না। কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা!

ওটা গুরুর গুরুত্ব নয়। যেখানে ভগবৎসেবার ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন, বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন, তিনি সদ্‌গুরু কিসের? ভগবৎ-সেবাশিক্ষা যিনি প্রদান করতে ভুলে যাচ্ছেন, তিনি ত' সদ্‌গুরু নন, তিনি অসদ্‌গুরু। সেই গুরুকে বর্জ্জন কর। কি করলেন বলিরাজ?—বলিরাজ তাঁর কথা শুনলেন না। তিনি যখন ভৃঙ্গার থেকে জল নিয়ে আচমন করতে যাচ্ছেন, শুক্রাচার্য্য ভৃঙ্গারের নলের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছেন সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। জল পড়ছে না, একটা শলাকা নিয়ে এসে পরিষ্কার করা হল। কিছুক্ষণ পরে কাণাশুক্র বেরিয়ে এলেন! ভগবানের সেবায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী গুরু! তোমাকে চাই না, তোমার মত গুরুর দরকার নাই, প্রয়োজন নাই। তোমার দ্বারা আমার কোন আত্মকল্যাণ হতে পারে না। 'স্বজনো ন স স্যাৎ।' 'রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর-সভার মাঝ।' স্বজন-আত্মীয় রাবণ কি করছে? ভগবানের শক্তিকে হরণ করতে যাচ্ছে। এই হল রাবণের আসুরিক বিচার। দুই ধরণের নাস্তিক, আসুরিক বিচারবিশিষ্ট ব্যক্তি জগতে আছেন। এক হলেন—কেবলমাত্র শক্তিকে মানেন, আর এক নাস্তিক হচ্ছেন—কেবলমাত্র শক্তিমান্‌কে মানেন। দুই-এর বিচারই ভ্রান্ত। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'—বেদান্তের একথা ঠিক। এটা শাস্ত্রীয় বিচার। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে যদি আমি মানি, তাহলে ভগবানের শক্তিকেও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেনে নিতে হবে। আমি কেবল শক্তিকে মানব, শক্তিমান্‌কে মানব না, Theory ভুল হবে। দুই জাতীয় নাস্তিকের উদাহরণ দিলেন শাস্ত্রে। একজন শক্তিকে হরণ করতে যাচ্ছেন, শক্তিমান্ থাকেন থাকুন। শক্তিমান্ শ্রীরামচন্দ্র থাকেন থাকুন, তাঁরই অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবী—সীতাদেবীকে অপহরণ করতে যাচ্ছে রাক্ষসরাজ রাবণ। এ এক জাতীয় নাস্তিক। আর এক জাতীয় নাস্তিক—শক্তি থাকেন থাকুন, আমি ভগবান্‌কে জগৎ থেকে উড়িয়ে দেব। ইনি হচ্ছেন—কংস। এই দুইরকম উদাহরণ দেখান হয়েছে শাস্ত্রে। দুটো Theory-ই ভুল। (**ক্রমশঃ**)

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

আসাম প্রদেশান্তর্গত কাছাড়-জেলার শিলচর-শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত হিমাংশু পাল মহোদয় শিলচরের রংপুর, শান্তিপাড়ায় প্রায় ১ বিঘা জমি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দান করেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ সদলবলে বিগত ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৮ (ইং ১৬।২।৯২) তারিখে শ্রীশ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের পুণ্য-তিথিতে উক্ত জমিতে ভিত্তিস্থাপন করেন। শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দত্ত, শ্রীশিশির পুরকায়স্থ, শ্রী পি. দাস ও শ্রীহিমাংশু পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকরূপে শ্রীদামসখা দাস, শ্রীনন্দকুমার দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল দাস ব্রহ্মচারী (মঠরক্ষক), শ্রীবিষ্ণুপদ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীচক্রধর দাস ব্রহ্মচারী নিযুক্তহন।

শ্রীমঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজের পরিচালনায় গত ২৪শে শ্রাবণ ১৩৯৯ হইতে ২৮ শে শ্রাবণ ১৩৯৯ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীঝুলনযাত্রার পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচারিগণ বিরাট্ পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট তোরণ নির্ম্মাণ করেন এবং মঠপ্রাঙ্গনে বৃন্দাবনলীলার অনুসরণে বহু স্টল ও নৃত্য-কীর্ত্তনরতা মৃন্ময়ী অষ্টসখী পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনদোলা নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমৎ যতি মহারাজ নাম-সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে দোলায় আরোহন করান।

পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীদাম সখা প্রভুজী ভগবৎকথা আলোচনা করেন এবং সমাপ্তি-দিবসে অর্থাৎ শ্রীবলদেব-পুর্ণিমা-তিথিতে "শ্রীবলদেব-তত্ত্ব তথা শ্রীগুরুতত্ত্ব"-বিষয়ক ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী এতদ্বিষয়েও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য রাখেন।

৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার, জন্মাষ্টমী-দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী-পরিক্রমান্তে সুসজ্জিত মোটরকারে শ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর অর্চ্চালেখ্য লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করা হয়। তদনন্তর সারাদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীদামসখা প্রভুজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার-বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক তত্ত্বদর্শন আলোচনা করেন। এই সভায় প্রধান-অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—শিলচরের ডি. এস. পি. শ্রীঅশোক মোদক এবং পুলিশ অফিসার শ্রীনীলোৎপল শর্ম্মা (এম. এ., বি. এল.) এবং আরও অনেকে।

মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যজন্মলগ্নে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। অতঃপর উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে শ্রীচরণামৃত ও অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। তদনন্তর ভি. ডি. ও. যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

নন্দোৎসব-দিবসে সারাদিন সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠের বিশেষ প্রশংসা করিতে থাকেন।

—**নিজস্ব সংবাদদাতা**

সাধুসঙ্গে

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সমাচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী করুণায় এবং সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সমিতির সুযোগ্য শিষ্যগণ শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীদামোদর-ব্রত—উর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে ইং ১০ অক্টোবর ১৯৯২, বাং ২৩ আশ্বিন শনিবার ১৩৯৯, সাধুসঙ্গে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত তীর্থযাত্রিগণ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে (মথুরা) সমবেত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ের তীর্থযাত্রীর সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাধিক। সর্ব্বসাকুল্যে তীর্থযাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ২৭৫ (সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ-সহ)।

ইং ১০ নভেম্বর ১৯৯২, বাং ২৪ কার্ত্তিক ১৩৯৯, মঙ্গলবার তীর্থযাত্রিগণ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে (বৃন্দাবন) পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে নানাবিধ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনদ্বারা চাতুর্ম্মাস্যব্রত, কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত বা উর্জ্জব্রত ভঙ্গ করেন। ইং ১০।১১।৯২ মঙ্গলবার রাত্রেই সমিতির সেবকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ তীর্থযাত্রিগণ নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উল্লেখ থাকে যে, ব্রতভঙ্গের সমাপ্তি দিনই শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহগণের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা-দিবস। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও কলিকাতা হইতে আগত পাইন পরিবারবর্গ শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বৈষ্ণববৃন্দকে বিবিধ উপায়ণদ্বারা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সমিতির বলিষ্ঠ প্রচারক ও পত্রিকা-সম্পাদক বেদান্তবিৎ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এই বিশাল পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শাস্ত্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রীরাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রসবিশেষ আলোচনার দ্বারা পরিক্রমাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের অপার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

সমিতির অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ —পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডী মহারাজ, সন্ন্যাসী মহারাজ, মঙ্গল মহারাজ ও আচার্য্য মহারাজ পরিক্রমামুখে হরিকথা পরিবেশন করিয়া যাত্রিগণকে প্রচুর আনন্দদান করিয়াছেন। মহাজনগণের গীতি-গানে শ্রীপাদ কানাই ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, চিন্ময় ব্রহ্মচারী, গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, সনাতন ব্রহ্মচারী, সুদর্শন ব্রজবাসী ও অন্যান্য কীর্ত্তনীয়াগণ সুমধুর কীর্ত্তনদ্বারা তীর্থযাত্রীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

ভাণ্ডারকার্য্যে শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ও মথুরাবাসী কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত, প্রসাদ প্রস্তুতকার্য্যে শ্রীযদুবর ব্রহ্মচারী, শুভানন্দ ব্রহ্মচারী, নরহরি দাসাধিকারী, সার্ব্বভৌম ব্রহ্মচারী, শুভকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থদপ্তরে শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী, নবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, নীলাদ্রি ব্রহ্মচারী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে সমিতির প্রশংসাও অর্জ্জন করিয়াছেন। সাফাই কার্য্যে শ্রীপাদ কাঁলাচাদ ব্রহ্মচারী, পতিতপাবন ব্রহ্মচারীর অশেষ প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য্য। যাত্রিগণের সুবিধা-অসুবিধা দেখিবার ভার পড়িয়াছিল — শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন প্রভু, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, বলভদ্র ব্রহ্মচারী, অনুপম ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকবৃন্দের উপর। চিকৎসায় ডঃ শ্রীপাদ বিনোদবিহারী দাসাধিকারী (কোলাঘাট, মেদিনীপুর) যথাসাধ্য যত্নের সহিত ঔষধ পরিবেশনদ্বারা যাত্রিগণের সেবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রসাদ পরিবেশনে সমস্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও সন্ন্যাসিবৃন্দ স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করিয়া পরিক্রমাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

পরমপূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ এই পরিক্রমার সমস্ত দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভুও পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী সমিতির সেবকবৃন্দের পূর্ণ সহযোগিতায় তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া সকলের স্নেহভাজন ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অন্নকূট-উৎসবে মথুরার জনৈকা শ্রদ্ধালু ভক্তিমতী ব্রজবাসিনী শতাধিক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে দান করিয়াছেন এবং তৎসহ যথাযোগ্য প্রণামী দিয়া উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরিক্রমা আরম্ভ হইতে সমাপ্তি-দিবস পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ প্রাতঃকালে ক্রমান্বয়ে শ্রীদামোদরাষ্টকম্ ও ভজন-রহস্য পাঠের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণলীলার বাল্য, পৌগণ্ড ও কুমার কালের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ

বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রতিদিন বহুবিধ হরিকথা আলোচনা করিয়া তীর্থযাত্রিগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং ভজনপথে নিজ-নিজ অধিকার অনুসারে অগ্রসর হইতে আবেদন জানাইয়াছেন। অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের নির্দ্দেশে সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের মাধ্যমে প্রচুর হরিকথা পরিবেশন করিয়া যাত্রীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এবৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ ছিল—শ্রীরাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়া তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ। পরমপূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যতত্ত্ব স্থাপন করিতে যত্নশীল ছিলেন। শ্রীল মহারাজজী শ্রীমদ্ভাগবত রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস গোস্বামী, কবি জয়দেব, জীবগোস্বামী, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-নরোত্তমদাসের গীত ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের টীকা-টিপ্পনীর উল্লেখ করিয়া সুললিত কণ্ঠে সিদ্ধান্তপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষতঃ পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের লোভময়ীবৃত্তিকে উৎসাহিত ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নির্ভীক বক্তা পরম পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজজী তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় 'নমামীশ্বরম্', 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ', 'মত্ত পরতরং নান্যৎ' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়া ও অন্যান্য শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা কৃষ্ণই যে একমাত্র আরাধ্যতত্ত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" শ্লোকের উল্লেখ করিয়া গভীর আর্ত্তিসহকারে পরিক্রমায় অংশ গ্রহণকারী ভক্তবৃন্দকে বলেন যে, আপনারা নিজ নিজ অধিকার জানিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইবেন। শাস্ত্র বলেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরেভক্তিঃ উৎপাতায়েব কল্পতে॥
"অধিকার না জানিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি ঘটে শক্তির অভাবে॥"

উপস্থিত অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ বক্তৃতার মাধ্যমে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী বক্তৃতার সুযোগ লাভ করিয়া গোস্বামি-গণের টীকা-টিপ্পনীর উল্লেখপূর্ব্বক বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীকেই সর্ব্বসাধ্যসার তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন।

পরিশেষে, যাত্রিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে এরূপ উন্নতোজ্জ্বল রসের আলোচনা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন এবং অন্তরে স্বাভীষ্ট সেবালাভের আশা প্রকাশ করেন। তীর্থযাত্রিগণ পারমার্থিক কল্যাণ চিন্তা করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়া সমিতির পরিচালকমণ্ডলীকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহারা এবারের তীর্থযাত্রাকে সফল মনে করিলেন। কারণ শাস্ত্র বলেন,—

শুদ্ধভকত, চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি, প্রেম-লতিকার মূল॥

*　　*　　*

গৌর-আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥

পরবর্ত্তী সংখ্যায় দর্শনীয় তীর্থস্থানের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য, যাহা পূজনীয় স্বামিজিগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিবার বাসনা রহিল।

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী,** ভক্তিভূষণ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকার কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৪৫শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা এবং ষান্মাসিক ভিক্ষা ১৭·০০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারেই প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। এ বিষয়ে আপনাদের একান্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—
—**শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী**
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

।। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ; ইং ১৬।১২।৯২,

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাধ্য-বেদান্তবিত্তাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৬শে মাঘ, ১৩৯৯ (ইং ৯।২।৯৩) মঙ্গলবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ (ইং ১১।২।৯৩) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—**২৬শে মাঘ,** মঙ্গলবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন গীতি কীর্ত্তন. পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারাত্রি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২৭শে মাঘ, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারাত্রি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৪শ বর্ষ

৬ মাধব, কারণোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৯; ইং ১৪/১/৯৩

১১শ সংখ্যা

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌড়দেশে সুর-দীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতি-রম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য-তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১ ॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি ।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্‌জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ২ ॥

যাহাকে কেহ কেহ 'পরব্যোম', কেহ কেহ 'গোলোক' এবং তত্ত্বজ্ঞগণ 'বৃন্দাবন' বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সু-পবনৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৩ ॥

যে-স্থান নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানা-বৃক্ষে শোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুযোগ দান করে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥ ৩ ॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সুবর্ণ-সোপান-নিবদ্ধ-তীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভি-র্গৌরবগাহ ময্যে স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৪ ॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

মহান্ত্যনন্তাণি গৃহাণি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৫ ॥

যেখানে স্বর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠগৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিদ্যা-দয়া-ক্ষান্তি-মখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষি-দেব-সিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৬ ॥

যেখানে লোকসকল বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞপ্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলায়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৭ ॥

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদি-লীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দলভ্য শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রেমভরেণ সর্ব্বম্।
নিমর্জ্জয়ত্যুজ্জ্বল-ভাব-সিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করত সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল-ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৮ ॥

এতন্নবদ্বীপ বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ ॥ ৯ ॥

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপ-ধামের সুচিন্তাপূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

কৃষ্ণধাম-স্বরূপ ও তত্ত্ব

১। দেবীধাম হইতে হরিধাম-পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

"প্রথমে 'দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটী লোক আছে। তদুপরি শিবধাম, সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় সদাশিব লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক।" —ব্রঃ সং ৫।৪৩

২। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ-ধর্ম্ম নাই, ইহা কি বেদ বলিয়াছেন ?

"উপনিষদ্‌গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু,—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয় বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপও কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ—ইহারা যুগপৎ সর্ব্বত্র অবস্থান করে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৩। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের বিশেষ-ধর্ম্মে পার্থক্য কোথায় ?

"চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত ; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি বিশদ ও চিদানন্দময়।"

—ব্রঃ সঃ ৫।৫৬

৪। গোকুলে কি বৈকুণ্ঠের মোক্ষ ও চতুর্দ্দশ লোকের ধর্ম্মার্থ-কাম আছে ?

"বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূলবীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর।" —ব্রঃ সঃ ৫।৫

৫। গোলোক ও গোকুলে পার্থক্য কি ?

"গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এই মাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান।"

—ব্রঃ সং ৫।২

৬। মাথুরমণ্ডল ও গোলোকে পার্থক্য কি ?

"যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকট-লীলার গোলোক।" —জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৭। প্রকট ও অপ্রকট-লীলার ব্রজ কিরূপ ?

"নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য

বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন,—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥" 'ব্রজের সহিতে' এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময় ধামের অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকট-ব্রজেরই বিচিত্রিতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।" —অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৬-৫০

৮। গোকুলে গোলোক-দর্শন কিরূপ?

"কৃষ্ণের চিন্ময়ী-লীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু-দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায়-পীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক-বিশ্ব দর্শন করেন।" —জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৯। কৃষ্ণধামের স্বরূপ কি?

"কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই, সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ; ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি; গোধন-সমূহই প্রজা; রাখালগণ সখা; গোপীগণই সঙ্গিনী, নবনীত, দধি, দুগ্ধই খাদ্য-দ্রব্য; সমস্ত কানন ও উপবনই কৃষ্ণপ্রেমময়; যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা; সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ-পরিচারিকা। যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখনও উপাসকের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।" —চৈঃ শিঃ ১।১

১০। গোলোকে কি অসুর-মারণাদি লীলা আছে?

"গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়।" — ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। ধাম-দর্শনে অধিকারী কে?

"ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যাঁ'রা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র করে যত দুর্নীতি বা নিরীশ্বর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁ'দের ভিতরে নাই। নিখিল সৎনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, তিতিক্ষা, অমানিমানদত্ব, সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠগুণ তাঁ'দের সেবা ক'র্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব। ভগবদ্ভক্ত স্বপ্নেও দুর্নীতিপরায়ণ হন না। আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এইরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে।

মূলটা ঠিক ক'রে রা'খলে সবই ঠিক থা'কবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আকরস্থানে কেন্দ্র ঠিক না রা'খ্‌লে বিপথে চ'লে যে'তেই হ'বে।

ভগবদ্‌বিস্মৃতি হওয়ার দরুণই জীবের ঐসকল অবস্থা, ভগবান্ কি জিনিষ তাঁ'র অনুশীলনের অভাবেই নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত, এমন কি, অখিল সদ্‌গুণের আকরের অস্তিত্বের অস্বীকার পর্য্যন্ত দে'খ্‌তে পাওয়া যায়।

নিয়ামকহীন নীতি অর্থাৎ নিরীশ্বরনীতির কোনও মূল্য নাই। পৃথক্ পৃথক্ নীতি-পালনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবদ্‌সেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্গুণ আনুষঙ্গিকভাবে লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তি-আলোচনাই মূল। সৎনীতি ত' তা'রই অন্তর্গত।

ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁর নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানরত বা গৃহাদিতে আসক্ত, সুতরাং হরিতে তার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত; তা'তে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

যদি আলাদা ক'রে দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি পরিত্যাগ কর্‌বার চেষ্টা হয়, তা'হলে সুবিধা হ'বে না। All Pervading (বিষ্ণু) মূল মালিক ভুল হ'য়ে গেলে যত অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

যাঁ'রা যেস্থলে আছেন, তা'তেই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শুন্‌বার জন্য ব্যাকুল থাকেন। যাঁ'রা সত্য-সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁ'দিগের প্রতি অসূয়া না ক'রে তাঁ'দের আনুগত্য ক'র্‌লেই আমরা ভগবানের প্রসাদ লাভ করতে পার্‌ব। হরিজনের প্রসাদেই হরিপ্রসাদ লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

অনর্থনিবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তেই যেন আমাদের দিন ফুরিয়ে না যায়। অর্থে প্রবৃত্তি

না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থপ্রবৃত্তি হ'লে অনর্থনিবৃত্তি গৌণ হ'য়ে পড়ে—অর্থপ্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হ'লেই হ'বে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট ভজনে অগ্রসর হ'বার মুখে কতটা চলেছেন, তা'ও দেখ্‌তে হ'বে।

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় ক'র্‌তে হলে গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে, গৌর-সুন্দরের চরণাশ্রয় ক'রতে হলে নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে, ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় ক'র্‌লে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল ক'রে বুঝা যা'বে।

ভগবান্ প্রচুর দয়াময় ব'লে আমাদিগকে ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়েছেন। জীবনে-মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন-ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁ'র সকল আত্মা সেবারসে স্নাত হয়।

কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূর্ণবস্তু, তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হ'য়ে যায়—অপূর্ণের নিকট, তা'তে অপূর্ণ অনায়াসে পূর্ণকে পেতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণমঙ্গল লাভ ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সকলকে দয়া ক'রে সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন ক'র্‌তে ব'লেছেন। যাঁ'রা তাঁ'র এই কথা শ্রবণ ক'রেছেন তাঁ'রাও 'হরিনাম সদা কীর্ত্তনীয়'—এই উপদেশই পেয়েছেন। কোন সময় হরিনাম ক'রতে হ'বে না, এইরূপ নয়—হরি সদা কীর্ত্তনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌লে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন ক'র্‌লে স্মরণ হয়, কীর্ত্তনকারী যখন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন হরিকথা স্মরণে আসে।

প্রমাণ ও প্রমেয়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর]

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্ব ন এবং বিজানন্ আত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি।

আত্মরূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব, জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। (মাণ্ডুক্য ১।২ মন্ত্র)

এই সমস্তই অবরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তিনি চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি, কার্য্যক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা-স্বরূপে মহারসময়। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং অস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।

(বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়-বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ অপরঞ্চৈবমেবারং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃহদাঃ ৪।৩।১৮)

সেই তাটস্থ্যধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব-পুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট; সূর্য্যকিরণ পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণস্থল। যথা—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মন সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। —অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্রবিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগতসত্তাবিশেষ। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়।

তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধদশায় মায়াকবলিত—

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহি স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১১)

ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টিদ্বারা বিবৃদ্ধি ধর্ম্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্ম্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ।

জীব স্বীয় আদৃত প্রাকৃতগুণে স্থূল সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপর রূপদ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহণ মধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গবলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তিদ্বারা অনাদি-অনন্ত-অবতারাবলী-বীজস্বরূপ বিশ্বমধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে পিপ্পল ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।'—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।

স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপী ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

(বৃহদাঃ ৪।৪।৫)

সেই বা এই (স্থূললিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।

তটস্থ-গঠনবশতঃ জীব মুক্তদশার প্রকৃতিমুক্ত—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

যাঁহার কৃষ্ণে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অধিকাররূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধু-গুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্য্য কথিত ও প্রকাশিত হয়। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ। (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)

এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়-জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। বেদান্তমতে এইপ্রকার মুক্তিই চরমমুক্তি।

— জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

পতিতই কৃপা পায়

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্—এই তিনজনই পতিতপাবন। ইঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক মাদৃশ হরিবিমুখ পতিতগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এজগতে অবতরণ করিয়াছেন। ইঁহারা মাদৃশ দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ, কাঙ্গালের বন্ধু। ইঁহারা পতিতের পাবন—কাঙ্গালের ঠাকুর, দাম্ভিকের কেহ নহেন। দাম্ভিকের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। দাম্ভিক পুরুষাভিমানী—প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, কৃপাকাঙ্ক্ষী নহে; আর পতিত—কাঙ্গাল, অকিঞ্চন, নিরভিমানী। তাই তিনি চান কেবল পতিতপাবনের কৃপা—দয়া। তিনি নিজকে অতি নিঘৃণ্য বলিয়া উপলব্ধি করায় অন্যের নিকট প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশা করেন না। তিনি কেবল দীনহীনভাবে কাতর হইয়া তিন ঠাকুরের কৃপাভিক্ষাই করেন। সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্যের মধ্যেই কৃপাভিক্ষা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃপাভিখারী সর্ব্বক্ষণই নিজের পাতিত্য উপলব্ধি করেন এবং বলেন,—

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভবপারাবারে॥
অধমের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

সাধুসঙ্গে পতিত নিজকে পতিত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে পতিতপাবন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পান। এইরূপ পতিত সরল—অকুটিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল সেবাপিপাসা আছে। তিনি একমাত্র হরিভজনই চান, অন্য কোন কিছু চান না। তিনি নিজ সুখ-দুঃখের প্রতি সতত উদাসীন। তিনি সর্ব্বক্ষণই নিজের পাতিত্য ও গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের পতিতপাবনত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি পতিত থাকিয়া নিজকে পাবন মনে করেন না। তিনি পতিত-পাবনগণের সহিত পাল্লা দিতে যান না। যাহার ভোগবুদ্ধি প্রবল, সে-ই ভগবানের প্রতি মৎসর—কৃষ্ণের প্রতি তাহার একটা নৈসর্গিক বিরাগ আসে। সেরূপ দাম্ভিকেরই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রাপ্য সম্মান, প্রতিষ্ঠাদি পাইবার আকাঙ্ক্ষা আসিয়া পড়ে। তাই সে ক্রমে ক্রমে গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়ে। কিন্তু শরণাগত পতিতের এ-সকল অসুবিধা নাই। যে দুর্ব্বল, সে সবলের সহিত পাল্লা দিতে যাইবে কি করিয়া? যে নিজকে দুর্ব্বল জানিয়া গুরুকৃষ্ণের কৃপাভিক্ষা করে না, তাঁহাদের পদধূলিলাভের জন্য প্রার্থনা জানায় না, সেই ত' বঞ্চিত। মায়ার

প্রলোভনে পতিত হইয়া ভোগ ও ত্যাগের দ্বারা আক্রান্ত হইবেই হইবে। কিন্তু নিষ্কপট পতিত কৃপাভিখারীর এ সকল বালাই নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজকে পতিত পামর জানিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা সততই প্রার্থনা করেন। তিনি পতিতপাবনগণের নিন্দা করেন না—তাঁহাদের প্রতি মৎসর হন না, পরন্তু তাঁহাদের দয়ার কথাই অনুক্ষণ বিচার করেন এবং তাঁহাদের করুণার কথা আলোচনা করিতে করিতে যতই তাঁহাদের দয়া উপলব্ধি হয়, ততই তাঁহাদের শ্রীচরণধূলি লাভের জন্য কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অমানিমানদ ভাব ততই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসে। নিষ্কপট পতিত কপটের ন্যায় অন্তরে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি অনাদর করিয়া বাহিরে তাঁহাদের সেবা-পূজাদি করেন না। গুরু বৈষ্ণবের সেবা করিয়া অন্যের নিকট হইতে ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের আশাও তাঁহার নাই। তিনি কেবল সেবালাভের জন্যই তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি সাধ্যানুযায়ী যাহা করিয়া থাকেন, তাহা আন্তরিকতার সহিতই করেন।

পতিত জানেন—সর্ব্বক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে—তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিতে হইবে না। তাঁহাদের মর্য্যাদা হানি করিলে তাঁহাদের চরণে অপরাধ হইবে। তিনি সব একাকারও করেন না—বদ্ধকে সিদ্ধ এবং সিদ্ধকে বদ্ধ মনে করেন না। তিনি সাধুর কৃপায় নিজের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'যে যেমন বৈষ্ণব' চিনিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া ধন্য হন। যিনি অনধিকারী, তিনি কনিষ্ঠাধিকারীর সঙ্গ করিবেন ; যিনি কনিষ্ঠাধিকারী, তিনি মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন এবং যিনি মধ্যমাধিকারী, তিনি উত্তমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া সেবা-প্রগতির পথে চলিবেন। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করা সেবাপথে ভীষণ বাধা। আমাদের বিচার হওয়া উচিত যে, সকলেই ভাল, সকলেই প্রভুর সেবাসুখ বিধান করিতেছেন, কিন্তু আমি ত' পারিতেছি না। সুতরাং আমি তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সমালোচক হইতে যাইব কেন ? আমাপেক্ষা সকলেই ভাল—এই বিচারই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের সঙ্গ করা উচিত নয়। যাঁহার অনর্থনিবৃত্তি হইয়াছে—গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হইয়াছে, অনুক্ষণ তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে হইবে এবং সঙ্গের ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতেছে কিনা, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধু-শাস্ত্রের বাণী শ্রবণ ও তদনুসারে নিজকে নিয়মন করিতে হইবে, সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া নিজের ভজনপথের নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হইবে। কৃপাভিখারীগণ এ-সকল বিষয়ে খুব সজাগ এবং খুব সাবধান হইয়া চলেন।

অকিঞ্চন পতিত নিজকে কখনও শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। তিনি সর্ব্বদা নিজের দোষ দর্শন করেন এবং গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া অনুক্ষণ অন্তরে অন্তরে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া যাহার হৃদয়ে প্রবল অগ্নি জ্বলিতেছে, অনুতাপাগ্নিতে তাঁহার অনর্থরাশি ভস্মীভূত হইয়া গিয়া গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় সত্বর তিনি সেবা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবেন। পতিত নিজের পাতিত্য—সেবাহীনতার কথা উপলব্ধি করিয়া কাতরভাবে—বড় আবেগভরে কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করেন। কৃপা ছাড়া গতি নাই—উপায় নাই। ইহা তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি জানেন—'গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তাঁহাদের কৃপালাভ না হইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত দাঁড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই।' তাই তিনি তাঁহাদের শ্রীচরণ ব্যতীত আর কাহারও নিকট কৃপাভিখারী হন না। তিনি নিজ নিত্য প্রভুত্রয়ের কৃপা ছাড়া অন্য কোন লঘু ব্যক্তির কৃপাভিখারী হইয়া আত্মরক্ষা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন না। তিনি দুর্ব্বল বলিয়া সর্ব্বক্ষণ বলদেবের কৃপাভিখারী।

নিষ্কপট দুর্ব্বল কখনই কপটের সঙ্গ করেন না। দুর্ব্বল কপটের সঙ্গ করিলে তাহাকে আর নিষ্কপট বলা চলে না। তখন সেও কপট হইয়া পড়ে। পতিত গুরুকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, কিন্তু কপট বঞ্চিত হয়। শরণাগত পতিত শ্রদ্ধাহীন নহেন। তিনি সশ্রদ্ধ। দৃঢ়শ্রদ্ধের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহারও শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে। পতিতের অপরাধ নাই বলিয়া হৃদয় কঠিন নহে। সাধুমুখে চেতোনোন্মেষিণী বাণী শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি প্রভুকে প্রভু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া তাহা তিনি পালনে যত্ন করেন। দুর্দ্দৈববশতঃ প্রভুর নিকট হইতে তিনি দূরে থাকিলেও তিনি রক্ষাকর্ত্তার আহ্বানে সাড়া দেন। সাধুর হরিকথা-কীর্ত্তনে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের দুঃখের কথা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জানান এবং কৃপাভিক্ষা করেন।

অকপট পতিত কখনই কৃপাবঞ্চিত হন না। তিনি কখনই পতিতপাবনকে ছাড়িয়া আশ্রয়চ্যুত হন না। যিনি কৃপার আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি ত' কৃপালাভ করিবেনই। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তিতে কেহ বাধা দিতে পারে না। কৃপালাভের যোগ্যতা পাতিত্য উপলব্ধি। পতিতই কৃপালাভের সুপাত্র। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥

* * * *

আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥

কিন্তু কই পতিতপাবনগণের সাক্ষাৎ পাইয়াও আমি ত' তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না? আমার পাতিত্য উপলব্ধি হইল কই? তাঁহাদের কৃপা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারিলাম কই? সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছি না—আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি না, আর কৃপা কি করিয়া পাইব? কৃপা পাইলাম না, তাই অনর্থ নিবৃত্তি হইতেছে না, উত্তরোত্তর কৃপা চাওয়ার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে না। পতিতপাবনগণ ত' আমাদের নিকট হইতে শরণাগত হইয়া কৃপা-ভিক্ষামুখে সেবাচেষ্টা ছাড়া আর অন্য কিছু চাহেন না। কেবল আমরা তাঁহাদিগকে চাহিলেই হইল। 'আর আমি কারও নহি' বলিয়া আপনজ্ঞানে তাঁহাদিগকে চাহিলেই কৃপা পাওয়া যায়। তাই পতিতের কাঙ্গাল হইয়া কৃপা প্রার্থনা ছাড়া কৃপালাভের অন্য কোন উপায় নাই।

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

তাই যাহাতে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় পাতিত্য উপলব্ধি হয়, নিজকে অতি অযোগ্য জানিয়া অনুক্ষণ তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতে পারি, ভগবৎ-কৃপাবতার শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের পদধূলি লাভের জন্য তীব্র আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা জাগে, তাহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু, না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী।
কৃপাবলোকন কর, আমি বড় দুঃখী ॥

যাঁহাদের উপর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপা অমায়ায় স্বেচ্ছায় বর্ষিত হয়, একমাত্র তাঁহারাই নিজদিগকে পতিত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং উত্তরোত্তর আরও গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা-সমৃদ্ধ হন। অপরের জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কারের মাদকতা কিছুতেই কাটে না। তাহারা নিজেদের ব্যর্থ অভিমানে সতত লাঞ্ছিত হইয়াও তাহাতেই মসগুল থাকিতে বাধ্য হয়।

ভক্ত ও অভক্ত

এ জগতে দুই প্রকার লোক আছে—এক শ্রেণী ভক্ত, আর এক শ্রেণী অভক্ত। ভক্তের সম্বল ভগবান্, আর অভক্তের একমাত্র সম্বল জড়েন্দ্রিয়। স্বসুখই অভক্তের কাম্য। জড়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানই অভক্তের প্রমাণ; আর ভক্তগণ শব্দাশ্রিত—নামানুশীলনপর। অভক্তগণের জড়প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি বিশ্বাস, আর ভক্ত শ্রুতিবাক্যে আস্থাবান্, চিৎপ্রত্যক্ষবাদী। অভক্ত অসত্য বা অনিত্যের সাহচর্য্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চায়, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়; আর ভক্ত সত্যের সাহচর্য্যেই সত্যে পৌঁছিতে পারেন। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী; আর ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। অভক্তগণ হৃষীকের গোলাম; আর ভক্তগণ হৃষীকেশের সেবক। অভক্ত নিজকে দ্রষ্টা জানিয়া সমস্ত বস্তুকে তাহার দৃশ্য মনে করে, আর ভক্ত সকল বস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজকে দৃশ্য মনে করেন। অভক্তের সম্বল জড়েন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জাগতিক অভিজ্ঞান; আর ভক্তের সম্বল শ্রদ্ধা, আনুগত্য বা শরণাগতি-বিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা। অভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি নির্ভরশীল, আর ভক্তগণ ভগবানের কৃপার ভিখারী। অভক্তগণ আরোহপন্থী, আর ভক্তগণ শ্রৌতপন্থী, অবরোহপন্থী বা অবতারবাদ-স্বীকারকারী। অভক্ত নিজকে ভোক্তা, পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, ধনী অথবা দরিদ্র, পণ্ডিত অথবা মূর্খ মনে করে; আর ভক্ত নিজকে ভগবৎ-সেবক মনে করেন। অভক্তগণ জড়-প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের কাঙ্গাল, আর ভক্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত, গুরু-কৃষ্ণের সেবক। অভক্ত সন্দিগ্ধচিত্ত শ্রদ্ধাহীন; আর ভক্ত নিঃসন্দিগ্ধ শ্রদ্ধাবান্। অভক্ত ভোগে বা ত্যাগে ব্যস্ত; আর ভক্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। ভক্ত ভগবানকে রক্ষক বা পালক বলিয়া জানেন; আর অভক্ত নিজকে অথবা জগদ্বাসীকে রক্ষক মনে করে। অভক্তের ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি আপনজ্ঞান নাই। তাহার আপনজ্ঞান দেহে, দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়-

স্বজনাদিতে ও এই মায়িক জগতে; কিন্তু ভক্তগণ জানেন, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া তাঁহাদের আত্মীয় আর কেহ নাই। ভক্তের দুঃসঙ্গে অনাদর ও সৎসঙ্গে উল্লাস, গুরু-গৌর-বিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি, সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি —স্বাভাবিক টান আছে; আর অভক্তের দুঃসঙ্গে আদর এবং সৎসঙ্গে অনাদর, আর গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি, শ্রদ্ধাহীনের প্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত, আর অভক্ত অপরকে নিজের অনুগত করিবার জন্য ব্যস্ত। অভক্তের কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল, কিন্তু ভক্তের কর্ত্তৃত্বাভিমান আদৌ নাই। অভক্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী, আর ভক্ত রূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পদধূলি-প্রার্থী। ভক্ত নিজনিন্দায় সহিষ্ণু, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দায় অসহিষ্ণু। অভক্ত নিজনিন্দায় অসহিষ্ণু, আর গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা শুনিয়াও নির্ব্বিকার ও মৌনাবলম্বী। ভক্ত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী, আর অভক্ত প্রজল্পী। ভক্ত সৎসঙ্গী, আর অভক্ত অসৎসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গী ও অভক্তসঙ্গী। অভক্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও দেহারামী, কিন্তু ভক্তের দেহাভিনিবেশ নাই, তাঁহাদের শুদ্ধমন ভগবন্নিষ্ঠ। অভক্তের চিত্ত ও বিচার পরিবর্ত্তনশীল ও অশুদ্ধ, আর ভক্তের বিচার শুদ্ধ নির্ম্মল ও অপরিবর্ত্তনশীল।

অভক্ত আরোহবাদ স্বীকার করে, আর ভক্ত নিত্যসত্যের অবতার স্বীকার করেন। অভক্তের ভ্রম আছে, কিন্তু ভক্তের ভ্রম নাই। অভক্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত, কিন্তু ভক্ত নির্ভীক। অভক্ত ম্লানবদন ও উৎসাহহীন, আর ভক্তগণ প্রফুল্লমনে সেবোৎসাহী। অভক্তগণ শ্রীহীন, স্বরূপশক্তির আশ্রয়বিহীন; আর ভক্তগণ শ্রীযুত— স্বরূপশক্তির নিত্য আশ্রিতাভিমানী।

ভক্ত নিত্যকাল কৃষ্ণধনে ধনী। তিনি সমস্ত অভাব হইতে পরিমুক্ত; কিন্তু অভক্ত নিত্যকাল অভাবক্লিষ্ট—অশান্ত। ভক্ত নিত্যসুখবোধতনু কৃষ্ণের আপন-জন বলিয়া তাঁহার দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। কিন্তু অভক্ত সর্ব্বদা অভাব ও দুঃখ-দ্বারা পীড়িত।

ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের প্রতি নিত্য সাপেক্ষধর্ম্মযুক্ত; আর অভক্তগণ জগতের প্রতি পূর্ণ সাপেক্ষধর্ম্মযুক্ত। তাহারা জগতের ভোগ্যবস্তুর প্রতি—ভোগসরাবরাহকারী ব্যক্তিগণের প্রতি অপেক্ষাযুক্ত; কিন্তু ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের প্রতি নিরপেক্ষ, শুধু নিরপেক্ষ নহে— বিদ্বেষী। ভক্ত ও অভক্তের চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

—শ্রীভক্তদাস ব্রহ্মচারী

বিশ্বরূপ কি শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্বরূপ ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহামতি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন, ইহা শ্রীগীতার বিশ্বরূপদর্শন-যোগ অধ্যায়ে উল্লেখ রহিয়াছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগিতে পারে,—"বিশ্বরূপ কি? ইহা কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন শ্রেষ্ঠ রূপ? এই রূপের নিত্যকাল আরাধনা সম্ভবপর কি না? বিশ্বরূপ দর্শন প্রাকৃত না অপ্রাকৃত দর্শন?" বিশেষভাবে আলোচনা করিলে এই বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

জড় জগতের যাবতীয় চিন্তাস্রোতের সর্ব্বগ্রাসী বিরাট্ মূর্ত্তিই হইতেছে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ, তাহা তাৎকালিক অর্থাৎ অনিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রকাশের ন্যায় তাঁহার এই বিশ্বরূপ পরা-প্রকৃতিতে নিত্য বিরাজমান নয়, এই রূপের প্রকাশ এবং অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহই হইতেছেন তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেব। এই শ্রীবলদেবই মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশবিশেষই কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়। তাঁহারা যথাক্রমে কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত থাকেন। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ঈক্ষণশক্তির প্রভাবে এবং তাঁহারই উপাদান শক্তিবলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী এই বিশ্বকে প্রসব করেন। ভগবানেরই শক্তিবলে এই বিশ্বের লালন-পালনাদি ও সংহার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই বিরাট্ বিশ্বের অন্তর্যামি-পুরুষই গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহারই বাহ্য অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন বা ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। তিনি বিশ্বের অঙ্গিরূপে তাঁহার বিরাট্ অঙ্গ নশ্বর জীবের নিকট ব্যাপকরূপে অভিব্যক্ত করেন।

সত্যস্বরূপ সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাদানভূত তাঁহারই বিভূতি-স্বরূপ এবং শরীরস্বরূপ এই বিশ্ব মিথ্যা নহে, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনিত্য। সকল শাস্ত্রই বহুমুখে জগতের সত্যত্ব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ অনিত্য হইলেও সত্য। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কোন বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের বাহিরে অবস্থান করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়,—"যস্যাত্মা শরীরং যস্য পৃথিবী শরীরম্" অর্থাৎ জীবাত্মা যাঁহার (যে ব্রহ্মের) শরীর এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর [অর্থাৎ চিৎ ও

অচিৎ যাবৎ বস্তুই যাঁহার শরীর] এবং তিনি (ব্রহ্ম) এই যাবৎ বস্তুরই শরীরী। বিষ্ণুপুরাণেও (২।১২।৩৯) উক্ত হইয়াছে,—

জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে স্থৈর্য্যং তে বসুধাতলম্।
জ্যোতিংষী বিষ্ণু ভুবনানি বিষ্ণু বনানি বিষ্ণু গিরয়োদিশশ্চ
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং যদস্তি যন্নাস্তি স বিপ্রবর্য্য॥

—"এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুর শরীর বলিয়া এই শাশ্বত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র, জ্যোতিঃ, জগৎ, বন, গিরি, নদ-নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সমস্ত শব্দবাচক জগতে যা কিছু বস্তু আছে, এমন কি যাহাও নাই, তৎসমস্তই বিষ্ণু-পদবাচ্য।" স্বতন্ত্র বিশ্বের নিষেধার্থে শাস্ত্র বিশ্বকে ভগবানের প্রাকৃত শরীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত শরীর নাই। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপ শ্যামসুন্দররূপের সহিত প্রাকৃত বিশ্বরূপের বিশেষ পার্থক্য স্থাপন করিয়া শাস্ত্র 'শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারিগণের' সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করিবার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে,—"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তিঃ" অর্থাৎ ভগবানের বিগ্রহ প্রাকৃত নহে, তাহা অপ্রাকৃত। শ্রীভাগবতের (২।১।৩৯) "য সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব" শ্লোকেও পাওয়া যায়, "সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাট্ অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজনা করবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে।"

মায়াবদ্ধ জীব ভোগপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা যে ভগবানের সুবৃহৎ বিরাট্‌ভাব দর্শন করেন, তাহা বদ্ধজীবোচিত প্রাপঞ্চিক ভোগময় দর্শনের অন্তর্গত ব্যাপার। বিরাটের সগুণধারণারূপে বদ্ধজীবভোগ্য বৃহত্ব বা পূজ্যত্বের নিত্যতা নাই। ভগবানের বিরাটরূপে নিত্যা ভক্তি বলিয়া কোন চেষ্টা হইতে পারে না—উহা বদ্ধজীবের নশ্বর বৃহৎপ্রতীতিমাত্র। বিশ্বরূপ দর্শন মায়িক দর্শনের তাৎকালিক দৃষ্টি মাত্র। নিত্যমুক্তজীবের একমাত্র সম্পত্তি—ভগবদ্ভক্তি নিত্যা, তাহা মায়িক জগতের কোন ব্যাপার নহে।

ভগবানের বিশ্বরূপে প্রেমানুভূতির আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া ভক্ত ভগবানের ঐ রূপ দর্শনে আগ্রহী নহেন। ভক্ত সর্ব্বদাই শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে দ্বিভুজ মুরলীধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন, কারণ ভগবানের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপই হইতেছে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ রূপ। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন অস্বস্তি বোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ" (গীতা ১১।৫০) স্বীয় শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। "স্বকং রূপম্" শব্দপ্রয়োগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ

হইতে বিশ্বরূপের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া 'বিশ্বরূপ যে তাঁহার পরম-স্বরূপ নহে' তাহা দেখাইলেন। আর অর্জ্জুনও দ্বিভুজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নিজ স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। গীতাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

—"হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্য-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখন আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।" ভগবৎস্বরূপের সহিত বিশ্বরূপের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভাঃ ১।২।৩ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—"গর্ভোদশায়ীর বিরাট্ আকাররূপ প্রপঞ্চ নবীন উপাসকগণের মনঃ স্থৈর্য্যের উদ্দেশ্যে কল্পিত। বিরাটরূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নহে। পাতালাদি অবর লোকসমূহ বিরাটের পাদাদির কল্পনা। ভূমা বস্তুর ধারণা করিতে গিয়া নব্যগণ অবয়ব সংস্থানমূলে যে বিরাটের আকার কল্পনা করেন তাহাতে জ্যাড্যাংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। ভগবানের স্বরূপে তাদৃশ জড় ধারণার কিছু মাত্র অবকাশ নাই। জীবের জড় ধারণায় ভোগ্যবিচার সংশ্লিষ্ট, ভগবৎ-স্বরূপের তাহা কোনদিন অন্তর্ভুক্ত নহে। শক্তি ও স্বরূপের অভেদহেতু ভগবানের পৌরুষ-রূপ চির বিশুদ্ধ। সেই পরমানন্দ ও সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ রূপ জড়ের ন্যায় দুর্ব্বল নহে।"

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন,—"ভগবানের বিশ্বরূপই তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপ। তাহা যদি না হইত, অর্জ্জুন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-ময় বিগ্রহ সখ্যভাবে দর্শন করিতে পাইয়াও পুনরায় কেন ঐশ্বর্য্যদ্যোতক বিরাট্ বা বিশ্বরূপ দর্শনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ?" তাহার উত্তর এই যে,—অর্জ্জুন অপ্রাকৃত চক্ষুর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিয়াই পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত ছিলেন। ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তাই তিনি তাঁহার নিজের মনের সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে চাহেন নাই। ভবিষ্যতের মানুষেরা যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে একজন 'সাধারণ মনুষ্য' মনে করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ না করে, তাই তাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে আরও একটী গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ভবিষ্যৎকালে কোন কোন অসৎপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যাহাতে 'নিজেদের ভগবানের অবতার' প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া অপরকে ঠকাইতে না পারেন, তাই মানুষকে এ বিষয়ে সাবধান করিতে গিয়া অর্জ্জুন

বিশ্বরূপ দর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন। কেহ যদি নিজেদের ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই দাবীর যথার্থতা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে অবশ্যই বিশ্বরূপ দেখাইতে হইবে। নতুবা তাহাকে কিছুতেই ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ভগবানের প্রকাশ এবং তাহা অসীম, অনন্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিদানের প্রভাবে অর্জ্জুন তাহা এক স্থানে বসিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ যুক্তি উত্থাপন করিতে পারেন—"বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনের যেহেতু দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, সেইহেতু বিশ্বরূপই ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ—ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।" তাহার উত্তর এই যে, —মায়াবদ্ধ জীব প্রাকৃত চক্ষুর সাহায্যে ভগবানের অসীম, অনন্ত বিশ্বরূপকে দর্শন করিতে সক্ষম নহে। তাহারা কেবল বিশ্বরূপের আংশিক প্রকাশকে দর্শন করিতে সক্ষম। অসীম, অনন্ত বিশ্বরূপকে দর্শন করিতে অতি অবশ্যই ভগবান্-প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন। এই দিব্যদৃষ্টির সহিত অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী অপ্রাকৃত দিব্যদৃষ্টির বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জ্জুন কেবলমাত্র ভগবানের অনিত্য বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তিনি স্বাভাবিকী দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজধর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টির সহিত দিব্যমন যুক্ত হয় নাই। দিব্যমনের সহিত দিব্যদৃষ্টি যুক্ত না হইলে ভগবানের পরম-স্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ গীতার টীকায় লিখিয়াছেন,—"দেবতাগণও এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দর্শন পান না। তুমি কিন্তু ইহাও আকাঙ্ক্ষা কর না। আমার মূল নরাকার-স্বরূপের মহামাধুর্য্যের নিত্য আস্বাদনকারী তোমার চক্ষুর নিকট ইহা কিরূপে রুচিকর হইবে? অতএব আমি 'তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি'—এই কথায় দিব্যচক্ষু দিয়াছি, কিন্তু দিব্যচক্ষুর ন্যায় দিব্য মন দিই নাই। অতএব আমার মনুষ্যরূপের মহামাধুর্য্যমাত্রগ্রাহী-মনস্ক বলিয়া দিব্যচক্ষুদ্বারাও তোমার নিকট সেইরূপ সম্যক্‌ভাবে রুচিপ্রদ হয় নাই। যদি তোমাকে দিব্য মনও প্রদান করিতাম, তাহা হইলে দেবলোকের ন্যায় তুমিও ঐ বিশ্বরূপ পুরুষ-স্বরূপে রুচিযুক্ত হইতে।"

জড়বিচার প্রবল থাকিলে ভগবানের স্বরূপদর্শনাভাবে বিরাট্ প্রভৃতি কাল্পনিক রূপ দর্শনের অবকাশ হয়। বিশ্বের দ্রষ্টা কখনও ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে, কেন না, কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণবস্তু দর্শনে জীবের অসামর্থ্য হয়। সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বের অন্যতম বলিয়া জানেন, কিন্তু বিশ্ব

শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গ—এইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের পূর্ণত্ব শ্রীগুরুদেবেরই পূর্ণ-সেবাময়ী দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দর্শনকে ভগবত্তার গৌণ-লক্ষণেরই প্রকাশ বলিয়াছেন। প্রাকৃত জ্ঞানে বলীয়ান্ দুর্য্যোধন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও ভগবৎস্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় সবংশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া-রচিত জগতে দুর্য্যোধন পুণ্য-প্রভাবে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও ভগবানে প্রাকৃত বুদ্ধিবশতঃ ভগবৎস্বরূপ দর্শনাভাবে ভগবৎসেবোন্মুখ হইতে পারেন নাই বলিয়া তাহার ভাগ্যে ভক্তিসুখ লাভ সম্ভবপর হয় নাই। ভগবানের শ্যামসুন্দর রূপ—সুদুর্দর্শনীয়, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্যরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ভক্ত ভক্তিচক্ষুর দ্বারা অনুক্ষণ ভগবানের পরম-স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ লাভ করেন, ইহা সকল শাস্ত্রের মূল কথা।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকার কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৪৫শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা এবং ষান্মাসিক ভিক্ষা ১৭·০০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারেই প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। এ বিষয়ে আপনাদের একান্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৪ পৃষ্ঠার পর]

ভগবানকে যদি আমি মানি, তাহলে তাঁর শক্তিকে মানতে হবে, তাঁর শ্রীনামকে মানতে হবে, তাঁর রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরকে মানতে হবে একই সঙ্গে। তা না হলে ভগবানকে মানা হবে না। আমি রাজাকে মানি, কিন্তু রাজার কর্ম্মচারীকে মানি না, মন্ত্রীবর্গকে মানি না, তাহলে রাজাকে মানা হল না। ঠিক সেই উদাহরণ।

শাস্ত্রে অসদ্গুরুর উদাহরণ দিয়েছেন। 'গুরুর্ন সঃ স্যাৎ স্বজনো ন সঃ স্যাৎ পিতা ন সঃ স্যাৎ'। অসদ্গুরু সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বিভীষণ ভগবদ্-বিদ্বেষী স্বজন রাবণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন। সেই পিতা পিতা নন, প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করেছেন ; যেহেতু হিরণ্যকশিপু ভগবান্ বিষ্ণুকে অবমাননা করছেন, অস্বীকার করছেন—তাঁর প্রতি জেহাদ ঘোষণা করছেন, সেহেতু তাহার মত পিতা পরিত্যাজ্য। আবার 'জননী ন সা স্যাৎ'—সেই মাতা মাতা নন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবেন, কিন্তু উল্টে হয়ে গেল চতুর্দ্দশ-বর্ষ বনবাস তাঁর। 'আমার ছেলে রাজা হবে'—কৈকেয়ীর ইচ্ছা। ভরত যখন মাতুলালয় থেকে ফিরে এসেছেন তখন মাকে বললেন,—মা, তোমার ছেলে রাজা হবে, তার জন্য তুমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিলে! ছিঃ, ছিঃ, তোমার মত মায়ের দরকার নাই। দেবতাগণকে পরিত্যাগ করছেন খট্টাঙ্গ রাজা এবং মুচুকুন্দ রাজা। প্রার্থনা করলেন দেবতাদের কাছে—মুক্তি দিতে পারবেন আমাকে, মুক্তি চাই আমি। মুক্তি হবে না, মুক্তির Protfolio আমাদের হাতে নাই। মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ। আপনি যদি মুক্তি চান, তাহলে সেই মুক্তিদাতা ভগবান্ মুকুন্দের উপাসনা করুন। আমরা দেব দেবী মুক্তি দিতে পারি না। "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"—বলে দিলেন। সুতরাং কথাগুলো ত' শাস্ত্রে এইভাবে বুঝান আছে। আমরা যেন ভুল না বুঝি।

'গুরুবাদী ধর্ম্ম' মানে সদ্গুরু পদাশ্রয় করতে হচ্ছে। তাঁরই আশ্রয়ে সাধন-ভজন শিক্ষা করতে হবে এবং সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হতে হবে, তবেই তত্ত্বদর্শন লাভ। সাধনার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি অনেক ও বহুরকমের বাধা-বিপত্তি। সেগুলো নিয়েও শাস্ত্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বুঝতে হবে সেগুলো ; সাধনের ক্রম রয়েছে। সনাতন শাস্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা-রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—তিনটে তত্ত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে। সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রেম—প্রয়োজন। ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎপ্রেম হল আমাদের মূল লক্ষিতব্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জানিয়েছেন ওটা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর **Theory**টা সংক্ষিপ্তভাবে শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে।—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতা। বৃন্দাবন হল তাঁর ধাম। 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।'—ব্রজবধূগণ যেভাবে সাধন-ভজন করেছেন সেইভাবে বা উন্নতোজ্জ্বল রসে—**Process, Procedure**টা হল শ্রেষ্ঠ। কেন বলছেন এই কথা?—সাধন-ভজন করতে গেলে বিভিন্ন আত্মার আত্মবৃত্তিতে যে যে রসের উন্মেষ বা প্রকাশ আছে, তদনুসারে সাধন-ভজন হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই মুখ্য পঞ্চরস এবং হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস—এই সপ্ত গৌণরস। দ্বাদশ রসের অধিদেবতা হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; সাধনার ক্ষেত্রে সাধক-সাধিকা তাঁদের অধিকারগত যে রস সেই রসানুসারেই সাধন-ভজন করবেন। কেউ শান্তরসে, কেউ দাস্যরসে, কেউ সখ্যরসে, কেউ বাৎসল্যরসে এবং কেউ মধুররসে সেই ভগবানের উপাসনা করবেন—এইকথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। সকলের অধিকার সমান নয়। কিন্তু শান্তভাবকে বাদ দিয়ে সবগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও মধুরপ্রেম বলে। এতে বিভিন্ন **Catagory** আছে। সেই অনুযায়ী সাধন-ভজন হবে। সদ্‌গুরু এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করবেন। তাঁরই আনুগত্যেই সাধন-ভজন বাস্তবে রূপায়িত হবে। বিশ্রম্ভ আনুগত্যের দ্বারাই সেই পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আসে।

শাস্ত্র বলছেন,—ভক্তিলাভই হল সাধন। "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্"—শ্রীমদ্ভাগবত হলেন অমল শব্দ-প্রমাণ। তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তার সমস্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস বেদবিভাগ

করেছেন, বেদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন, মহাভারত রচনা করেছেন। আবার তার ব্যাখ্যাস্বরূপে অষ্টাদশ পুরাণাদি রচনা করেছেন। এত সব করেও তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কেন শান্তি পাচ্ছিলেন না?—তিনি যে তত্ত্বদর্শনটা বুঝাতে চেয়েছিলেন মনুষ্যলোককে, মানুষ সেটা বুঝে উঠতে পারে নাই। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—ত্রিবিধ শাস্ত্র রচনা করেলেন ত্রিবিধ অধিকারী জীবের জন্য। কিন্তু তারা ওটা বুঝে উঠতে পারে নাই। ভগবান্ যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি যে পরাৎপরতত্ত্ব, তিনি যে পরম ভজনীয় বস্তু—এটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে নাই। তাঁর সাধন-ভজনটাও বুঝল না। সেইটাই হয়েছে তাঁর মানসিক অশান্তির কারণ। তাই তিনি পুনরায় নূতনভাবে সেই ভগবানের পারতম্য, পরমারাধ্যত্ব প্রভৃতি সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। তার নাম হল 'ভাগবত'। এই ভাগবতের বিচার বুঝতে গিয়ে মহামহামুনি-ঋষিরাও অকৃতকার্য্য হচ্ছেন। ক্ষমতা নাই বুঝবার। মানুষের Talent—বুদ্ধিবৃত্তি আছে, Intelectualism আছে, কিন্তু বুঝবার উপায় নাই। কেন?—ভাগবতের কথা বুঝতে হয় ভক্তি-বৃত্তির দ্বারা। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।'—ভক্তিবৃত্তির দ্বারা ভাগবত বুঝা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি, টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা বুঝা যায় না। শাস্ত্র বলছেন,—'বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ'। মানুষের যে জ্ঞানভাণ্ডার আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, সব শেষ হয়ে যাবে এই ভাগবতের বিচার বুঝতে গেলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর সমাধিলব্ধ বাস্তব সত্য—পরমসত্য—সত্যদর্শন এই ভাগবতের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন। এটা সাধনার দ্বারা বুঝতে হবে। সাধনার দ্বারা গুরু ও ভগবৎকৃপায় বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়। সেই ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বা ভক্তির দ্বারাই ভাগবত বুঝতে হবে। কিন্তু সেই অধিকার বা Standard ত' লাভ করা আমার প্রয়োজন।

যদি বলেন—এটা কোন্ Standard-এর গ্রন্থ। শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে, এটা Post graduate ক্লাসের আলোচ্য বিষয়। শ্রীগীতার আলোচনা শেষ হয়েছে কোথায়?—আত্মসমর্পণে। এটা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বুঝাতে চাইলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন কে?—ভগবানের নিত্য সখা। যিনি ভগবানের সখা হয়েছেন, তাঁর কি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় নাই? নিশ্চয়ই হয়েছে। তথাপি সেই সখাকে বানিয়ে দিচ্ছেন—অসম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিরূপে। জিজ্ঞাসু না হলে প্রশ্ন আসবে না। আবার প্রশ্ন না এলে সদুত্তর বা সংশয়চ্ছেদনও সম্ভব নয়। প্রশ্ন অবতারণা করার জন্যই অর্জ্জুনকে ভগবান্ সাজিয়ে দিচ্ছেন অজ্ঞরূপে—আমি কিছু জানি না, বুঝি না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—দেখ, এই যে কৌরবগণ দাঁড়িয়ে আছেন, এরা সব আততায়ী। এদের বধ কর। এদের বধ করলে কোন অন্যায় হবে না, পাপ হবে

না। কেন হবে না ঠাকুর ?—আমিই স্মৃতিশাস্ত্রে বলে রেখেছি—আততায়ীদের বধ করা যায়, তাতে কোন পাপ হয় না। এই কৌরবরা যারা সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, এরা সব আততায়ী। কি অন্যায় করেছেন এরা ?—আততায়ীর পক্ষে যে ছয় রকমের অন্যায়, সে-সব অন্যায়গুলো করেছেন এরা।—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহ।
ক্ষেত্র-দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেব বিচারয়ন্।
ন আততায়ী বধে দোষঃ হন্তুর্ভবতি ভারত॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—আততায়ীকে যদি তুমি তোমার দিকে আসতে দেখ, তাহলে তুমি তাকে বধ করতে পার। সুতরাং এই যে কৌরবগণ এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন, তুম যদি সম্মুখ-সমরে এদের নিহত কর, আহত কর, কোন অন্যায় হবে না। অর্জ্জুন কি বলেছেন ?—ঠাকুর, পারব না, পারব না। রুধির-লিপ্ত রাজ্য দরকার নাই আমার।

গুরূন্ হত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ (গীতা)

—আমি রক্তলিপ্ত রাজ্য চাই না। সব বিদ্যা-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। ঠাকুর, আমি ভাল-মন্দের বিচার—ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সব হারিয়ে ফেলেছি।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

আমার পক্ষে যেটা মঙ্গলকর, আত্মকল্যাণকর, তুমি সেটা উপদেশ কর। 'শিষ্যস্তেঽহম্'—আমি তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করছি অর্থাৎ সখ্যভাব থেকে দাস্যভাবে নেমে গেলেন। হাতজোড় না করলে উপদেশ ত' আসবে না, সখা সখাকে উপদেশ করতে পারেন না। তাই দাস্যভাবে নেমে গিয়ে হাতজোড় করেছেন অর্জ্জুন।

শিষ্যের লক্ষণ কি ?—গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালন করা। 'গুরোরাজ্ঞা-হ্যবিচারণীয়া'—গুরুর আজ্ঞা যিনি অবিচারে পালন করেন, তিনিই শিষ্য। তাই 'শাধি মাম্'—আমায় শাসন করুন, আমায় উপদেশ করুন। 'ত্বাং প্রপন্নম্'—তোমাতে প্রপত্তি স্বীকার করছি। হাতজোড় করেছেন, আমি শরণাগত, আমি আত্মসমর্পণ করলাম, আবার সব বাহাদুরি ছেড়ে দিলাম। এই ভাব যখন আসে, তখনই গুরু শিষ্যকে উপদেশ করতে পারেন। তারপর থেকে কৃষ্ণের উপদেশ এসেছে, তার আগে আসে নাই। অর্জ্জুন, তুমি খুব বাহাদুরি

করছ না? "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" তোমার সম্মুখ-সমরে যদি মৃত্যু হয়, তোমার জন্য স্বর্গরাজ্য আছে, আর জয়ী হলে বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—এ রাজ্য আছে। কোনদিকেই লোকসান নাই তোমার। বুঝলেন না অর্জ্জুন। তারপর বিশ্বরূপ দেখালেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন বাহাদুরি করো না। 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' তোমার বাহাদুরি কিছু নাই। এরা এদের কর্ম্মফলে সব নিহত হয়ে আছে। দেখিয়ে দিলেন সব। অর্জ্জুন বুঝতে পারলেন না, কিন্তু ভগবান্ ছাড়ছেন না। তাঁকে গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম, সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশপূর্ণ বাক্য সব বললেন। তাও অর্জ্জুন বুঝতে পারলেন না। শেষকালে কৃষ্ণ বললেন,—এতক্ষণ আমি যা বলেছি তুমি সব ছাড়। আমি লৌকিক ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম যা কিছু বলেছি সব ছেড়ে দাও। আমার শেষ কথাটা শোন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। বহুর শরণ গ্রহণ করতে যেও না, ভুল পথে চলতে যেও না, ভুল হবে তোমার। বহু নয়, এক আমি, অদ্বিতীয় আমি। সেইকথাই জানানো হয়েছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—সেই পরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্। তাঁর সমান কেউ নাই, তাঁর ঊর্দ্ধেও কেউ নাই। 'ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'—**He is second to none**। সেইকথা বুঝানো হয়েছে পরাৎপরতত্ত্ব সম্বন্ধে। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"—আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত করব। যদি তুমি মনে কর যে, তোমার কিছু অন্যায় হচ্ছে, সে দায়িত্ব আমি নিলাম। সে দায়িত্ব ভগবান্ স্বয়ং হাতে তুলে ধরছেন। 'মা শুচঃ'—তুমি শোক করো না, তুমি ত' ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্র-ধর্ম্মে স্থিত হও, আত্মধর্ম্মে স্থিত হও। তুমি কেন শূদ্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করছ। শূদ্র-ধর্ম্ম কেন? —'শোচনাৎ ইতি শূদ্রঃ'। যারা প্রাকৃত মায়ামোহের বশীভূত, তারা হচ্ছে শূদ্র। এই সংজ্ঞা শাস্ত্রে রয়েছে।

কে ব্রাহ্মণ?—'বন্ধমোক্ষবিৎ'—যিনি পণ্ডিত, কিসে আমার বন্ধনদশা হয়েছে, কিসে আমি পুনরায় মুক্তি লাভ করব, এইটা যিনি জেনেছেন, বুঝেছেন, তিনিই হলেন মুক্ত, তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ কাকে বলছেন?—

"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলছেন গার্গীকে,—হে গার্গি! অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবানকে জেনে যাঁরা এজগৎ থেকে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা হলেন 'ব্রাহ্মণ'। আর এর উল্টো শব্দ বলেছেন 'কৃপণ'। 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সঃ কৃপণঃ।'—

অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবানকে না জেনে যারা এ জগৎ থেকে চলে যাচ্ছেন, বৃথা এলেন আর গেলেন, তারাই হলেন কৃপণ। আত্মকল্যাণ-চিন্তা করতে পারলেন না তারা, তারা হলেন শূদ্র। প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত যারা, তারা হলেন শূদ্র—বেদান্ত, উপনিষৎ এই ত' ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন,—আমি তোমার সব দায়িত্ব নিলাম, এবার তুমি কি বলছ ?—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন অর্জ্জুনকে 'করিষ্যে বচনং তব।' হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি যা বলছ, তোমার কথা আমি পালন করব। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। সেইটাই আমার ভক্তি, সেইটাই আমার সব কিছু। আত্মসমর্পণের কথা শিক্ষা দিলেন গীতা।

ভাগবত কি শিক্ষা দিচ্ছেন ? ভাগবত কি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে ?—'গায়ত্র্যা চ সমারম্ভঃ'—গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। 'সত্যং পরং ধীমহি'—এই দিয়ে আরম্ভ হয়েছে ভাগবত। কি শিক্ষা দিচ্ছেন ?—গীতার ঐ আত্মসমর্পণ কতভাবে হয়, তার থেকে ভাগবত শুরু হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি রসে সেই প্রেমময় ভগবান্ আরাধিত হন, উপাসিত হন—সেইটা ভাগবত শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা সদ্‌গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশক্রমেই সমস্ত তত্ত্বদর্শনটা অবগত হব। তত্ত্বদর্শন বড় কঠিন। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা মাথায় ঢোকে না, কিন্তু যদি ওটা আলোচনা না করি, তাহলে আমাদের সাধন-ভজন হবে না। এ কথাও শাস্ত্রে বলে দিলেন। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" তত্ত্বসিদ্ধান্ত কি ? সেটা আমাদের জানতে, বুঝতে, শিখতে হবে। ওতে গাফিলতি করলে হবে না, অনীহা থাকলে হবে না। ওগুলো হল **Axiomatic Truth, Universal Truth**। তত্ত্বসিদ্ধান্ত না শিখলে, না বুঝলে আমি ভাল-মন্দটা বিচার করতে পারব না। শাস্ত্র বলছেন,—সেইজন্য ওটা শিখতে হবে। "ভারত-ভূমেতে হইল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জনম সার্থক করি কর পর-উপকার॥" জন্ম সার্থক করা মানে কি ?—আত্মকল্যাণ চিন্তা করা, আত্মকল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হওয়াকে বলে জন্ম সার্থক করা। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজন আছে। তাঁকে জানব,—তিনি কে ?—আমি আত্মবস্তু; তিনি পরমাত্ম-বস্তু। জীবাত্মা পরমাত্মার সেবা করবেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন, তাঁর উপাসনা করবেন। এটা হল মোক্ষম কথা। সাধনাদ্বারা, ঈশ্বরের উপাসনা-দ্বারা সেই প্রেমময় ভগবানকে লাভ করা যায়—শাস্ত্রের সব জায়গায় বুঝানো আছে এটা। আমি যদি চেষ্টা করি, আমার যদি নিষ্ঠা থাকে, আন্তরিকতা থাকে,

তাহলে সবটাই সম্ভব। ধৈর্য্য থাকা চাই, উৎসাহ থাকা চাই, নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকা চাই। শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা না থাকলে কিছু হচ্ছে না।

তত্ত্বদর্শনটা কি, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। আমার উপাস্য কে? এই উপাস্য-নির্ণয় প্রথমে প্রয়োজন। সেটা ত' আমরা কিছুই বুঝি না। ৩৩ কোটি দেব-দেবী আছেন। আমি মনে করছি,—এই ৩৩ কোটি দেব-দেবী বোধ হয় আমার উপাস্য। তা ত' নয়। পরমোপাস্য ভগবান্, তাঁর বিরাট্ Structure, বিরাট্ বিশ্ব। সেইগুলো চালাতে গেলে তাঁর বহুসংখ্যক officer দরকার। সেই officerরা হলেন দেব-দেবী। তাঁদের কর্ম্মচারী-কর্ম্মচারিণী বলা হয়েছে। তাঁদের যে সম্মান আছে আমি সেই সম্মান দিয়ে যাব। সেই কথাই ত' গীতা-ভাগবতে বুঝানো হয়েছে। শাস্ত্রে কোথাও দেবদেবীর উপাসনা শিখান নাই। সব জায়গায় ঈশ্বরের উপাসনার কথা বলা আছে। গীতার শ্লোক নিয়ে আলোচনা করা যাক্ তাহলে।—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ কি করছেন?—অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হচ্ছেন। কি পাচ্ছেন তারা?—কিছু ফল পাচ্ছেন, সে ফলটা ক্ষয়িষ্ণু, অন্তবৎ। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।" তারা হলেন অল্পমেধা, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন—যারা আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনা করতে যাচ্ছেন, ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা বাদ দিয়ে। কি ফল পাচ্ছেন তারা? কোথায় তারা যাচ্ছেন?—"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" দুটো পৃথক্ করে বললেন কৃষ্ণ। দেবযাজিগণ অনিত্য দেবলোকে যাবেন, আর যারা আমার উপাসনা করছেন, তাদের আমার অক্ষয় অমরধাম—বৈকুণ্ঠে গতি হবে। দুটো এক হল কি? বহুলোক ত' আজকাল বুঝতে চেষ্টা করছেন—আরে, সবটার ফল ত' এক। বুঝিয়ে দিতে পারেন? ভগবান্ নিজমুখে বলছেন,—'দেবান্ দেবযজো যান্তি।' দেবলোক কোথায়? আমরা যেখানে বসে আছি, এটা হল ভূলোক। ভুবলোক হল পিতৃপুরুষগণের স্থান। তারপর Third dimension হল স্বর্গলোক। সেই স্বর্গে আমি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে গেলাম। কিন্তু পুণ্য শুধু একাকী হয় না, তার সঙ্গে পাপও বিমিশ্রিত থাকে। সুতরাং পাপের ফলও আমাকে নরক ভোগ করতে হয়। স্বর্গে আমি যাই। স্বর্গে গিয়ে যখনই আমার পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল তখন আবার 'পপাত ধরণীতলে'। আবার এই সংসারে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং লাভ কি হল? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রদ্ধা-কুসুমাঞ্জলি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে॥
অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম দায়িনে॥

জয় পরমগুরু জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
তব শ্রীচরণে মোর অনন্ত প্রণাম॥
দীনহীন আমি প্রভু সদা দুরাচার।
তব কৃপা বিনা মুঁই না পাই নিস্তার॥
ভক্তিহীন বলি' যদি মোরে উপেক্ষিবে।
অধমতারণ নাম কেমনে ঘোষিবে॥
নিজকর্ম্মফলে আমি হই মায়ার দাস।
অনর্থ আসিয়া হৃদয় করিলেক গ্রাস॥
হাবুডুবু খাইতেছি পড়ি' ভবসিন্ধু জলে।
কৃপারজ্জু দিয়া মোরে তোলহ সত্বরে॥
পাদপদ্মে স্থান দিয়া কর নিজ দাস।
তব কৃপা হইলে জানি ছাড়ে মায়ার পাশ॥
জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন ভক্তিশূন্য তাই।
কেমনে তোমার চরণে স্থান পাই॥
নিজগুণে কৃপা করি' করহ করুণা।
পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া ঘুচাও যন্ত্রণা॥
অশেষ ক্লেশের আধার মায়ার সংসার।
উদ্ধারহ প্রভু মোরে ডাকি বারবার॥
তুমিত' পতিতপাবন করুণার সিন্ধু।
মো-অধমে কর দান, তাহার একবিন্দু॥

তব কৃপাকণা যদি হয় কারো প্রতি ।
কৃষ্ণে মতি উপজয় ভজনে বাড়ে প্রীতি ॥
সজ্জন পণ্ডিতগণ তোমার অনুগত যত ।
নাস্তিক পাষণ্ডাদি তব কৃপায় হয় নত ॥
শুভদৃষ্টি কর প্রভু করুণাসাগর ।
এ-অধমের হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥
তব পদে ভক্তি রহে হেন কৃপা করি' ।
নিরন্তর রাখ মোরে নিজদাস করি' ॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপামূর্ত্তি ধরিয়া ধরায় ।
কত জীবে নিস্তারিলে হইয়া সদয় ॥
আবির্ভাব-দিনে বৈষ্ণব-সজ্জনসকল ।
উপনীত হইয়াছেন সব আনন্দে বিহ্বল ॥
মাল্য-পুষ্প-চন্দনাদি শ্রীচরণে দিয়া ।
তব গুণগান করে আনন্দিত হইয়া ॥
দণ্ডবৎ করি' সবে মাগে কৃপাকণ ।
অপরাধ ক্ষম মোরে পতিতপাবন ॥
অহৈতুকী কৃপা যদি মোর প্রতি হয় ।
কৃপার অযোগ্য মুঁই জানিহ নিশ্চয় ॥
তবু যদি কৃপাময় কৃপা কর মোরে ।
আশ্রয় দাও প্রভু তোমার চরণকমলে ॥
এ-মিনতি রাখ প্রভু, না কর নিরাশ ।
শ্রীবামনের দাস করে তব কৃপা-আশ ॥

—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

গোঁড়ামি কি সঙ্কীর্ণতা?

গোঁড়ামিকে সঙ্কীর্ণতা বলিলে কি প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়? সঙ্কীর্ণতাকে অনুদারতা বলা যেরূপ সঙ্গত, গোঁড়ামি পদটীও কি তদ্রূপ অনুদারতা অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত? গোঁড়ামি কথাটী কি নিন্দনীয় না প্রশংসনীয়, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কোন সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য বিক্রেতা যদি বলেন,—"আমার দ্রব্যটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট", তবে কি ইহা তাঁহার গোঁড়ামি হইবে? তাঁহার কি ইহা বলা উচিত হয় না? নিকৃষ্টমানের দ্রব্যের সহিত তাঁহার দ্রব্যটাও সমতুল্য বা সমগুণযুক্ত বলাই কি কর্ত্তব্য হইবে? সুধী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিতে পারেন না।

ব্যবহারিক জগতের বিচার ত্যাগ করত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কোন পক্ষকে এবম্বিধ মত পোষণ ও প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ পক্ষকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলজনক বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। সকল পক্ষই অন্য পক্ষের দোষ প্রকাশ করিতে আপ্রাণ যত্নশীল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ইহাকে গোঁড়ামি না সঙ্কীর্ণতা না উদারতা বলা সঙ্গত হইবে? জাগতিক সুখশান্তিকামী দলগুলিকে বহুশিক্ষিত মনীষী পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের রাজনীতির উন্মাদনায় শত শত নিরীহ মনুষ্য প্রাণ হারাইতেছে—ইহা কি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি নহে? শুধু ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই প্রকার অবস্থা বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে দেশে ধর্ম্মোন্মাদনা নাই, সে দেশেরও ইহা হইতে অব্যাহতি নাই। ধর্ম্মজীবনে উদাসীন দেশেও, জাগতিক সুখকামী ব্যক্তিদের স্বপক্ষে সমর্থন করাকে কি বলা উচিত? তাহাও কি গোঁড়ামি নহে?

বস্তুতঃ নিজমতের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা দোষাবহ নহে; তাহাকে গোঁড়ামি বলিয়া সর্ব্বমতকে সমভাবে আদর করা স্বাভাবিক হয় না। শ্রীগীতায় ৩।৩৫ শ্লোকেও দেখা যায়।—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

—এই শ্লোকটীতে অন্যের ধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা রক্ষা করিতে উপদেশ দেখা যায়। বর্ত্তমানে সকল ধর্ম্মই সমান বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের বহুল প্রচারের দ্বারা এবং সরকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু হিন্দু ধর্ম্মান্তরিত হইয়া বিবাহাদি কর্ম্মে উৎসাহিত হইতেছে। সকল ধর্ম্মই যখন সমান তখন

খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ বা শূদ্রের পুত্রের বা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মান্তরিত হইলেও কোন দোষ নাই—এই বিচার বর্ত্তমান সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে নাকি ?

বৈশিষ্ট্যযুক্ত সৃষ্টিতে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবস্থান্তর সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সকল বস্তুই সমগুণাপন্ন হওয়া উচিত—ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ মতবাদ। ভিন্নতা, উৎকৃষ্টতা, উৎকৃষ্টতরতা ও উৎকৃষ্টতমতা সর্ব্ববস্তুতে—কি মায়িক জগতে, কি মায়াতীত অপ্রাকৃত জগতে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। সুতরাং উদারপন্থীর নামে তথাকথিত সাম্য-বাদ অলীক কল্পনামাত্র। তবে নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নিষ্ঠা বা গোঁড়ামি অমঙ্গলজনক সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৯।২৯ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমগুণের প্রকাশ করিয়াছেন।—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

—এই শ্লোকটী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে কল্পিত সাম্যবাদ আকাশকুসুমে পরিণত হয়। সাম্য বা সমতা অর্থে অযোগ্যতাকে যোগ্যতা বলিয়া বিচার করা বুঝায় না। যাহারা ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন—বলায় অন্যভাবে তাঁহার অনুশীলনকারী বা উদাসীন মনুষ্য জগতে বর্ত্তমান আছে বুঝায় এবং ভক্তি-সহকারে ভজনকারীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সম্বন্ধ হয় অন্যের প্রতিও একইপ্রকার সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা বলা হয় নাই। ফলদাতা হিসাবে ভক্ত ও অন্যকে একই গুণযুক্ত ফল প্রদান করেন না—ইহাই সুস্পষ্ট উক্তি। যদিও তিনি সকলের প্রতি সম ; যদিও তাঁহার দ্বেষের পাত্র কেহ নাই, তথাপি মনুষ্য নিজ নিজ পৃথক্ কর্ম্ম বা কার্য্য অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বা বিভিন্ন প্রকার ফল তাঁহার নিকট হইতে পাইবে। কার্য্য, মত বা পথ অনুসারে সকলে অনুরূপ ফল লাভ করিবে, একই ফললাভ করিবে না, একই গতি লাভ হইবে না।—ইহাই শ্লোকটীতে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত।

উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থিগণ নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর লিখিলেও পরীক্ষক মহাশয়ের সকলকেই কি সমান নম্বর প্রদান করা কর্ত্তব্য ? নচেৎ তাঁহাকে কি বিষমদর্শী বলা হইবে ? পরন্তু কম-বেশী নম্বর দিয়াই তিনি প্রকৃত সমদর্শী হইবেন না কি ? অন্যথায় তাঁহাকে বিষমদর্শী বলা যাইবে না ত' ? এই প্রকার সাম্যবাদ অর্থে সকল মতকে বা পথকে সমান জ্ঞান করা বুঝায় না। যিনি পাপের পথ ধরিবেন, তিনি নরকে উপস্থিত হইবেন ; যিনি পুণ্যের পথে চলিবেন, তিনি স্বর্গে গমন করিবেন ; যিনি ত্যাগ ও জ্ঞানপথে গমন করিবেন, তিনি মুক্তিলাভ

করিবেন ; যিনি যোগমার্গ অবলম্বন করিবেন, তিনি পরমাত্ম দর্শন করিবেন এবং যিনি ভক্তিপথ অবলম্বনকারী তিনি ভগবানকে বা ভগবৎসেবাকে লাভ করিবেন। সকল পথের একই- ফল বলা হয় নাই।

যাহার যেরূপ মত বা পথ তাহার গন্তব্যস্থলও সেইরূপ উচ্চাবচ হওয়াই সাম্য-বাদ। একই কৃষ্ণতত্ত্বকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিপথে অনুশীলন করিলেও, ভক্তিপথে যিনি ভজন করেন তাঁহারই সম্বন্ধে "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" বাক্যটী উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীকে ইহা বলেন নাই।

শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপন্থার আলোচনাদ্বারা ভক্তিরই আচরণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা সুফল লাভ হইবে না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। যথা—৩।৯, ১৩ শ্লোক।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচর ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

এস্থলে যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্যই কর্ম্ম করিবার উপদেশ। অন্যত্র পদদ্বারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য জীব—দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি এই কর্ম্ম বিষ্ণুর জন্য বিহিত না হয় তবে তদ্দ্বারা বন্ধন হইবে ; মুক্তি বা তদূর্দ্ধ্ব গতি লাভ হইবে না, বলা হইয়াছে। 'যজ্ঞশিষ্ট' বাক্যে বিষ্ণুর প্রসাদ বুঝায়। এতদ্দ্বারাই সর্ব্বপাপমুক্তি বলিয়াছেন। অন্যথায় অর্থাৎ নিজ সুখহেতু রন্ধনাদিকে পাপভোজন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর জন্য না কৃত হয়, তাহা কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুর জন্য কর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুর জন্য এই কর্ম্মই ভক্তি ব্যতীত কিছু নহে।

'দেবান্ ভাবয়তানেন', 'যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ' প্রভৃতি শ্লোকগুলি বিরোধাত্মক বলিয়া ভ্রম হয়। পরন্তু এই শ্লোকগুলি সকাম ব্যক্তির কামনাসিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। পরন্তু এই প্রকার কামনামূলক কর্ম্মকে গীতা এবং সকল শাস্ত্রই গর্হণ করিয়াছেন এবং তাহা পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন।

'যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ' শ্লোকস্থ "মামেব" পদটী শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিকে উদ্দেশ করিয়াছে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায় নাই। এই অর্থ গীতা ৯।২৫ শ্লোকটীতে স্পষ্টীভূত হইয়াছে,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্ ॥

এই শ্লোকটীতে উপাসক যে দেবতার উপাসনা করিবেন তাহার সহিতই তিনি যুক্ত হইবেন বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন না, তাঁহার বিভূতিস্বরূপ দেব-দেবীকেই পাইবেন। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য উপাসনার ফল নশ্বর, তাহাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গীতা ৭।২৩ এবং ৮।১৬—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবী বা মনুষ্যাদি জীবের ভজনাকারীকে অল্পবুদ্ধি বা বোকালোক বলা হইয়াছে এবং তাহাদের উপাসনার ফলও ধ্বংস বা নাশপ্রাপ্ত হয়; চিরস্থায়ী হয় না। তাঁহারা দেবতাদিগের উপাসনা করিয়া দেবলোক এমন কি ব্রহ্মার উপাসনাদ্বারা সত্যলোক গমন করিলেও তথা হইতে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু বিষ্ণুর ভক্ত বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। অতএব সকল প্রকার পথেই একই ফল লাভ হয়—ইহা শাস্ত্রের মত নহে; পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন ফলই লাভ হইয়া থাকে—ইহাই গীতার বা সমুদায় শাস্ত্রের মত।

কোনও মনীষী গীতাকে সাম্যবাদের অতি উদারতম গ্রন্থ বলিয়া উদারতা বর্ণনমুখে লিখিয়াছেন,—

গীতাশাস্ত্রে কোন গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। গীতার ৪।১১ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"যে যেভাবে আমার আরাধনা করে আমি সেইভাবে তাহাকে কৃপা করি। সকল ধর্ম্মপিপাসু মৎপথেই বিচরণ করিতেছে।" ৭ম অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে আছে,—যাহারা ঈশ্বরের যে কোন রূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদিগকে সেই মূর্ত্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।" ৯।২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতা উপাসনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।" এইরূপ সার্ব্বজনীনতা ও উদারতা অন্য ধর্ম্মগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। ভগবানের অসংখ্য নাম ও অসংখ্য রূপ। তাঁহার যে কোন একটী নামে ও রূপে আমাদের নিষ্ঠা হইলেই মুক্তি করতলগত হইবে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার একটী নাম জপ ও একটী রূপ ধ্যান করিলেই মোক্ষলাভ হয়। অপরের ইষ্টকে অশ্রদ্ধা করা অনুচিত। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রত্যেকটী অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মুক্তিমার্গ, এই ভাবটী গীতার কয়েকটী শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। রুচির বৈচিত্র্য-

হেতু ঋজু, কুটিল যে পথে মানুষ চলুক না কেন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকিলে সাধকের ঈশ্বর লাভ হইবেই। যত মত তত পথ।

আমাদের বক্তব্য—তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি এবং তাঁহার বর্ণনা একার্থবোধক হয় নাই। তাঁহার বক্তব্যমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজস্ব কাল্পনিক মতবাদ অযথাভাবে যোজনা করায় কদর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত ১ম শ্লোকটী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" মাননীয় অনুবাদক মহাশয় অনুবাদে যথার্থই লিখিয়াছেন—যে যেভাবে আমার আরাধনা করে, আমি সেইভাবে তাহাকে কৃপা করি। কিন্তু তাঁহার সাম্যবাদের ব্যাখ্যায় ইহার তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। 'যে যেভাবে, সেইভাবে তাহাকে'—ইহাদ্বারা সকলকে একই ভাবে বুঝায় না। ভাবের ভিন্নতায় কৃপারও ভিন্নতা হইবে—ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী তাঁহার "যত মত তত পথ" বাক্যের তাঁহার অভীপ্সিত অর্থের সাধক না হইয়া বাধকরূপেই প্রকাশ পায়।

আমার আলোচিত গীতার ৯।২৯ শ্লোকটীও একতাৎপর্য্যজ্ঞাপক। নিরপেক্ষ সুধী পাঠকবৃন্দের তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

এক্ষণে সাম্যবাদ প্রচারক মহাশয়ের উদ্ধৃত ২য় শ্লোকটী এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটীর প্রকৃতার্থ ও মর্ম্ম বিচারের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

মাননীয় উদারবাদী লেখক মহাশয় তাঁহার উদ্ধৃত ২য় শ্লোকটীর অর্থে বলিয়াছেন,—"যাহারা ঈশ্বরের যে-কোনও রূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদিগকে সেই সেই মূর্ত্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।"

পরন্তু এই শ্লোকটীতে "যাং যাং তনুং" বলিতে ঈশ্বরের বা কৃষ্ণের কোনও রূপকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। ইহা আধিকারিক দেবতাগণের রূপকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এবং সেই মূর্ত্তিপূজার বা আরাধনার যে ফল দেবতারা প্রদান করেন, তাহাও দেবতাদের নিজস্ব কোন সম্পদ নহে। ঐ ফলগুলিও আমার সম্পদ এবং আমিই দেবগণকে ঐ প্রকার ফল দেবতাভক্তকে প্রদান করিবার

জন্য প্রদান করি, এবং এই কামনার বস্তুগুলি জাগতিক বলিয়া বিনাশশীল। তাহা নিত্যতত্ত্ব নহে। তজ্জন্য ঐ কামীদিগকে হৃতজ্ঞান ও অল্পমেধাযুক্ত বলিয়াছেন। অধিকন্তু ঐ দেবভক্তগণ অভীষ্ট দেবতাগণকে লাভ করিবে; আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করিতে পারিবে না। মদ্ভক্ত অর্থাৎ আমার ভক্ত কেবলমাত্র আমাকে লাভ করিবে। সুতরাং লেখক মহাশয়ের উদ্দিষ্ট সাম্যবাদ তাঁহার উদ্ধৃত ২য় শ্লোকটীতেও প্রকাশ পায় না; পরন্তু তাহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।

অতঃপর লেখক মহাশয়ের ৩য় শ্লোকটী, অর্থাৎ—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

—এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থও লেখক মহাশয়ের প্রতিকূল হইতেছে। এই শ্লোকটী আমি যদিও পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তথাপি পাঠকগণের সুবিধার জন্য পুনরায় এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

মাননীয় লেখক মহাশয় তাঁহার উদ্ধৃত তিনটী শ্লোকদ্বারা "যত মত তত পথ" অর্থাৎ সকল পথেই একই ফল লাভ হয়—ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টান্বিত। কিন্তু অন্যদেবতা বলিলে বিষ্ণুতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্বকে বুঝায় না। সুতরাং দেবযাজীরা দেবতাগণকে লাভ করেন; বিষ্ণুতত্ত্বকে লাভ করেন না বুঝায়। বিষ্ণুভক্তের সমান ফল লাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের ফলগুলি ধ্বংসশীল, তাহাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। "মামেব" পদটী পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা "কৃষ্ণকে" লক্ষ্য করে না; কৃষ্ণের বিভূতি বা আধিকারিক দেবতাদিগকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ইহাও সকল মত বা পথের একই ফল বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন পথ বা ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হয় বুঝায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিপথের ফল যে একই প্রকার বা সমান নহে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০ শ্লোকে দেখা যায়,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রদীপ্ত ভক্তি আমাকে যেরূপে লাভ করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং ত্যাগপথে আমাকে সেইরূপে লাভ করা যায় না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সকল মতের আলোচনা ও প্রশংসা করিয়া উপসংহারস্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সকল মত বা পথকে ভক্তির অনুগত বা ভক্তিময় হইতে উপদেশ

দিয়াছেন, নচেৎ স্বতন্ত্রভাবে ঐ মতগুলি কোন মঙ্গল দানে সক্ষম হয় না। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পথসমূহ নিরপেক্ষ নহে, তাহারা ভক্তিমুখাপেক্ষ।

যথা—কর্ম্মপ্রশংসা—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

উপসংহার-মন্তব্য—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

জ্ঞান-প্রশংসা—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

মন্তব্য—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ (গীঃ ১৮।৫৪)

যোগ-প্রশংসা—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ (গীঃ ৬।৪৬)

মন্তব্য—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গীঃ ৬।৪৭)

শ্রীগীতা সকল পথের প্রশংসা করত তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন বা শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাহাদের স্বতন্ত্র বৃত্তিকে প্রশংসা করেন নাই। সকল প্রকার যোগকে ভক্তিপথের সোপানস্বরূপে বর্ণন করিয়া চরম উপসংহারে অন্য সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করাকেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বলিয়াছেন। যথা—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার পথ বা মত বা তত্ত্বের ভজন পরিত্যাগ করত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই গীতার চরম উপদেশ। ইহাই গোঁড়ামি বা চরম নিষ্ঠা।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

শ্রীগুরুপূজা, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীআম্নায়পূজা ও শ্রীআচার্য্যপূজা একই তাৎপর্য্যপর। গুরুই ব্যাস, ব্যাসই গুরু। যাঁহারা চিদ্বিলাস স্বীকার করেন, তাঁহারাই গুরুপূজার অধিকারী। গুরুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই আছে। আবার শ্রীগুরুদেব নিজে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার পরম সহায়। শ্রীগুরুদেব নর নহেন, তিনি চিদ্বিলাস-বিষ্ণুপাদ বা ভগবৎপাদ। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, তিনি ভগবৎপরিকর। শ্রীগুরুদেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার তনু অপ্রাকৃত। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ। শ্রীগুরুপূজায় সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তবে গুরুপূজায় অধিকার লাভ হয়। সমর্পিতাত্মা, শরণাগত, দীন, সরল ব্যক্তিই গুরুসেবা পায়। দাম্ভিক, কপট ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুরুসেবা দূরের কথা, গুরুর দর্শনই পায় না।

গুরুপূজা ব্যতীত গৌরাঙ্গপূজা ও কৃষ্ণপূজা হয় না। কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগোবিন্দকে দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। কৃষ্ণকে দান করিবার জন্যই তাঁহার এ জগতে অবতরণ।

শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞই গুরুপূজা-মহোৎসব। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার হয়। সেই নামরূপী কৃষ্ণকে যিনি কৃপা করিয়া দান করেন, তিনিই গুরু। এই গুরুদেবের পূজা মনুষ্যপূজা নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্ণশক্তির পূজা—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের পূজা এবং তাহাই প্রকৃত কৃষ্ণের পূজা।

গত ২রা পৌষ ১৩৯৯, ইং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২, শুক্রবার শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য তথা অস্মদীয় গুরুপাদ-পদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠপ্রাঙ্গন ও শ্রীমন্দির পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, বিচিত্রবর্ণের রঙ্গিন পতাকা ও পুষ্প প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক উপাচারে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মন্দিরের পার্শ্বে একটী পৃথক্ বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্যসমূহ স্থাপন করা হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্পর্কে

নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চনান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত সকলেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। ভোগারাত্রিকান্তে আহুত, অনাহুত, রবাহুত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুবলসখা দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরমেশকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমনোহরকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গীয় প্রচারকেন্দ্র শ্রীনৃসিংহগোপাল গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীরোহিনীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভু এই গুরুপূজা-মহোৎসবে আমাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র ও সকল শাখামঠ-সমূহে বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে দীনের

প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

নিত্যানন্দের স্বরূপ, ব্যাসাভিন্ন গুরুরূপ,
শিক্ষা দাও অনুগত জনে।
ভাগবত্তত্ত্ব-বিস্তার, জীবে করিলে নিস্তার,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ১ ॥
হে করুণাঘন মূর্ত্তি! কৈলা কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তি,
দিব্যজ্ঞান দিলা কতজনে।
পরদুঃখে সদা দুঃখী, জীবে কৈলা কৃষ্ণোন্মুখী,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ২ ॥

প্রচারিলা গৌরবাণী, জীবের কল্যাণ জ্ঞান',
হরিনাম দিলা জনে জনে।
মঠ-মন্দির বিস্তারিলে, মায়াবাদী নিস্তারিলে,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৩ ॥
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,
কৃপা কর এই দীনজনে।
বেদান্তের সার—ভক্তি, দেখাইলে শাস্ত্র-যুক্তি,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৪ ॥
নবদ্বীপ-পরিক্রমা, প্রকাশি' ধাম-মহিমা,
বিলাইলে গৌরপ্রেম ধনে।
গৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশি' প্রচারিলে জগদ্ব্যাপী,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৫ ॥
করি সিংহের হুঙ্কার, নাশি' মায়া অন্ধকার,
ধর্ম্মসভা করি স্থানে স্থানে।
কৈলা ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, শুদ্ধভক্তি সদাচার,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৬ ॥
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সর্ব্বজ্ঞাতা, অতিমর্ত্ত্যাচিন্ত্যকথা,
বন্দি সেই গুরুর চরণে।
স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজীব হিতে রত,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৭ ॥
তব আবির্ভাব-তিথি, তাহাতে এই দুর্ম্মতি,
শরণ লইনু শ্রীচরণে।
তব পদে এই আশ, নিত্যপদে কর দাস,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৮ ॥
তুলসী-দল হস্তোপরি, প্রসাদী মালা গলে ধারি'
দেখি' নৃত্য করে ভক্তগণে।
আরতি কীর্ত্তনমুখে, পুষ্পাঞ্জলি দেয় সুখে,
ভূলুণ্ঠিত প্রণমি চরণে ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরুসেবাভিলাষী—
—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : নব-২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৯ (ইং ৩।৩।৯৩) বুধবার হইতে ২৫শে ফাল্গুন, '৯৯ (ইং ৯।৩।৯৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—২৯শে পৌষ, '৯৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে সমিতির **'সাধারণ-সম্পাদক'**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৯৩), বুধবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৯৩), বৃহস্পতিবার ;— (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের পঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৯৩), শুক্রবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের **পাট**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৯৩), শনিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৯৩), রবিবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৯৩), সোমবার ; —**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৯৩), মঙ্গলবার ; —**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা, ঘটি ও এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৯৩) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৪শ বর্ষ | ৬ গোবিন্দ, গর্ভোদশায়ী, ৫০৬ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, শুক্রবার, ১৩৯৯, ইং ১২/২/৯৩ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকেশবায় নমঃ

নব-প্রিয়কমঞ্জরীরচিত-কর্ণপূর-শ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতীকলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্।
দরোচ্ছ্বসিত-যূথিকাগ্রথিত-বল্গু-বৈকক্ষকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১ ॥

অভিনব কদম্ব-মঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, বিকশিত মালতী-মালায় যাঁহার মৌলি সুশোভিত ও যিনি ঈষৎ-বিকশিত অতি সুন্দর যূথিকামালা গলদেশে ধারণ করিয়া সায়ংকালে বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে।
ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ২ ॥

"হে পিশঙ্গি! হে মণিকস্তনি! হে প্রণতশৃঙ্গি! হে পিঙ্গেক্ষণে! হে মৃদঙ্গমুখি! হে ধূমলে! হে শবলি! হে হংসি! হে বংশপ্রিয়ে?"—ইত্যাদি সম্বোধন-বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

ঘনপ্রণয়-মেদুরান্ মধুর-নর্ম্মগোষ্ঠী-কলা-
বিলাস-নিলয়ান্ মিলদ্বিবিধ-বেশ-বিদ্যোতিনঃ।
সখীনখিল-সারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহারা প্রগাঢ়-প্রণয়হেতু অতি-স্নিগ্ধ, সুমধুর পরিহাস-বাক্যে ও নৃত্য-গীতাদি কলাবিলাসে কুশল এবং যাঁহারা নানাপ্রকার বেশ-ভূষায় সুশোভিত, এবম্বিধ বয়স্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শ্রমাম্বু-কণিকাবলী-দরবিলীঢ়-গণ্ডান্তরং
সমূঢ়-গিরিধাতুভির্লিখিত-চারু-পত্রাঙ্কুরম্।
উদঞ্চদলিমণ্ডলী-রুচিবিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৪ ॥

বিন্দু-বিন্দু শ্রমজলে যাঁহার গণ্ডদেশ সুশোভিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা পত্রাঙ্কুর লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার কুটিল-কুন্তলের শোভায় মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

নিবদ্ধ-নব-তর্ণকাবলী-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎ-খুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৫ ॥

যে-সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া খুরাগ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, তাহাদিগকে বেণুনিনাদ-দ্বারা নিবর্ত্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্ব-শ্রিয়ং
চলত্তরল নৈচিকীনিচয়-ধূলি-ধূম্রস্রজম্ ।
মরুল্লহরী-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৬ ॥

যিনি ধ্বজ-বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রে ধাবমান গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলি-পটলে যাঁহার বনমালা ধূম্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ-মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে ।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৭ ॥

যিনি বিলাস-মুরলীর মধুর-ধ্বনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃতুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনা-গণের চিত্ত উল্লসিত ও অতিশয় আনন্দহেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরং-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮ ॥

দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরূঢ়, ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষ-মালায় যিনি সংকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর-গতির ন্যায় তাহাদিগের কুচাগ্রমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দদ্বয়ে
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখা-সখঃ ॥ ৯ ॥

যিনি ব্রজ-রমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল-ধীসম্পন্ন করিয়া নিজ-পাদপদ্মে অচলা রতি জন্মাইয়া চিরসুখী করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভজন

১। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে কৃষ্ণানুশীলন করেন?

"পুরীতে * * * আমি গোপীনাথ পণ্ডিতকে আমার পাঠের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিলাম। প্রথমে সমস্ত দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শ্রীধরস্বামীর টীকার সহিত আমি তাঁহার নিকট পড়িলাম। আমার সঙ্গে তখন হরিহরদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ৫/৭ দিনের মধ্যে উঁহারা এত পশ্চাৎপদ হইলেন যে, শেষে আমার নিকট পড়িতে লাগিলেন। উঁহারা তৎপূর্ব্বে নদীয়া ও কাশীতে ন্যায়-বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছিলেন। * * * পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া 'ষট্সন্দর্ভ' নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম। বেদান্তের বলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য লিখিয়া লইয়া পড়িলাম। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পড়িলাম। 'হরিভক্তিকল্পলতিকা' লিখিয়া লইলাম। নিজে কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা করিতে লাগিলাম। 'দত্তকৌস্তুভ' নামক সংস্কৃত-গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অনেক শ্লোকই সেই সময়ে রচনা করি। * * * পরমানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন আমার নিকট ভাগবত পড়েন। ঐসময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের বাটীতে আমাদের ভাগবত-সংসদ হয়। মহান্ত নারায়ণদাস, মোহনদাস, উত্তরপার্শ্বের মহান্ত হরিহরদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই সেই সভায় যান। কান্থাধারী রঘুনাথ-দাস বাবাজী মহাশয় আমাদের সে সভার বিরোধী হইয়া অনেকগুলি লোককে সে সভায় যাইতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথদাস বাবাজী তখন হাতী আখড়ায়

থাকেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা করিয়া কহিলেন,—'আপনাকে তিলক-মালা না দেখিয়া আমার অবজ্ঞা করা অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।' আমি বলিলাম,—'বাবাজী মহাশয়! আমার দোষ কি? তিলক-মালা দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন, প্রভু আমাকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষাগুরু দেন নাই। আমি কেবল মালায় হরিনাম জপ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক-মালা লওয়া কি ভাল?' বাবাজী মহাশয় সকল কথা বুঝিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। আমাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুগত থাকিলাম।

টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাতাসন-ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অনুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যা-কালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট-বাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—'তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না'।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

২। পুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপভাবে ভজন করিয়াছেন?

"পুরীতে থাকায় * * * আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম। মহাপ্রসাদ অরহর ডাল না খাইলে একদিনও তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন আমাকে প্রত্যহই ডাল আনিয়া দিত।

মন্দিরের এক পার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ ; সেখানে শাসন-ব্রাহ্মণ-মাত্র বসিতে পান, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। সেদিকে গেলে আমার মন তুষ্টি লাভ করিত না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে অথবা শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট বসিতাম। আমরা বসিলে মুক্তিমণ্ডপের অনেক পণ্ডিত আসিয়া তথায় বসিতেন। আমি ঐ স্থানটিকে ভক্ত-প্রাঙ্গণ বলিয়া নাম দিয়াছিলাম ; সেইখানেই ক্রমশঃ আমাদের বিদ্বৎসভার উন্নতি হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির যেরূপ উচ্চও মনোহারী, সেবাও তদ্রূপ অপরূপ। যে লীলাই দর্শন করা যায়, তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যা-আরাত্রিক প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব দেখিতে প্রত্যহই ৫/৭ শত লোক উপস্থিত থাকেন, কি আনন্দ! পর্ব্বযাত্রায় নানাবিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিয়া থাকে ; দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। * * * দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী হয়। আমার প্রতি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। * * পর্ব্বকালে যাত্রীদিগকে যে পরিশ্রমের সহিত দর্শন করাইতাম, তাহা আমি আর নিজে কি লিখিব। যাত্রীদিগের দর্শন-সুবিধা ও শীঘ্র প্রসাদ-সেবনের সুবিধা করিতে গিয়া অনেক লোকের বিরাগভাজন হইতাম। রাজা প্রভৃতি মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ কখনও কখনও স্বার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে অন্যায় কার্য্য করিতেন। আমি সেই সকল নিবারণ করিতে গিয়া রাজা ও রাজার লোকদিগের শত্রুতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রভু জগন্নাথদেব আমার সহায় থাকায় কেহ আমার কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি স্বচ্ছন্দে প্রায় পাঁচ বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় কাটাইয়াছিলাম। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বাসা বদল করি। * * * ১২৮০ সালের ২৫শে মাঘ বিমল রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের অন্নপ্রাশনাদি সকল শুভকর্ম্ম শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদদ্বারা নির্ব্বাহ হয়। সকল কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া আমরা প্রসাদনিষ্ঠ হইয়াছিলাম।"

— ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা কি তত্ত্ব ?

"JAGANNATH is the emblem of God having no other form than the eyes and hands. They mean to show that God sees and knows and creates. BALARAM is the source of Jiva-Shakti of God ; SUBHADRA is the Maya-Shakti. SUDARSAN is the energy of will."

—The Temple of Jagannath at Puri

৪। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ 'ভজনকুটী' কেন আশ্রয় করিলেন ?

"আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজন-কুটীরে উপবিষ্ট। বিদ্বম্মণ্ডলী-

পরিসেবিত বহুজনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই বা আমরা এই সুদূর প্রদেশে পলাইয়া আছি? বহু দিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই সজ্জন-তোষণী পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটী আশা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসারসেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনাঃ হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণ-মনঃ ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ক্রমে-ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাতিরিক্ত ভাব-দর্শনে যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখর তাপে যে সমুদয় খদ্যোতিকাপ্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করত উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আসুরিধ ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক-স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-তরণীর আশ্রয়ে বক্তৃতা-ছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগি-স্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জগজ্জঞ্জাল পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জনসমাজে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠাভূষায় ভূষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মত-নিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থার দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে

আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিল,—

'কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয় নিচয়।
ভক্তিপথ এবে কোটি কণ্টকাদিময়॥
কোথা যাব, কি করিব, হ'য়েছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপা-বল॥'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট-স্থান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—

'অয়ি সজ্জনতোষণি! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্ম-জন্মান্তরীণ স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমা শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে, তৎকৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।' হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উত্তালতরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম।"

—'নববর্ষে আর্ত্তি-নিবেদন', সঃ তোঃ ১৫।১

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়; আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা শ্রীহরি-কীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। জীবনে, মরণে হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল আত্মা সেবারসে স্নাত হয়। যেমন দর্পণের উপর ধূলা পড়িলে আত্মদর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কৃত্যের দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে। আকর্ষকের কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহবশে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে তাঁর শতকরা শতপরিমাণে অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তাহলে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁর বন্ধুবর্গ বহির্জগতের বস্তু নন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় ব'ললে আমার মূর্খতা যায়, তাঁরা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন।

সাধুগণের বৃত্তি batterya action-এর মত। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel ও সদ্‌বস্তুকে attract করে। সাধুগণের বৃত্তিদ্বারা সদ্‌বৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁরা অসাধু, তাঁরা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অতীন্দ্রিয় বস্তু। জাগতিক কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু তিনি নন। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু unchallengeable but not unapproachable, সেবোন্মুখতা নিয়ে তাঁর কাছে আমরা যেতে পারি। তিনি অচিন্ত্যবস্তু কিন্তু সেবোন্মুখের চিন্ত্য। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ।

শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্য বস্তু। তাঁর কথা সমগ্র পৃথিবীতে অন্য সব কথা থেমে গিয়ে সব সময়ের জন্য আলোচনা হো'ক; তাহলে জীবের মঙ্গল হবে—সকলেরই অতিমানুষিক-বস্তি করতলগত হবে, অতিমর্ত্ত্য বিষয়ের উপলব্ধি হবে। বাস্তব-সত্যের সন্ধান পেয়ে মনে হবে—একমাত্র চৈতন্যের কথাই মঙ্গলজনক, আর সকল কথাই অমঙ্গলের কারণ।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রস্তররাজি—সকলেই তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-

ছিল। ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাদৃশ দান করিয়া এ যুগে ক্ষান্ত হন নাই; তিনি এই যুগে এক অনর্পিতচর বস্তু দান করিয়াছেন। তিনি আত্মার সেবার প্রকার জানাইয়াছেন। তিনি উজ্জ্বলরসের ভক্তিশ্রী জগতের লোককে বিতরণ করিবার জন্য এজগতে আসিয়াছিলেন। যাহা মানুষ জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই। যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌর-হরি আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র কৃত্য। এইটী তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য, নারদাদির অগম্য ব্যাপার পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বৈষ্ণবনিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত ক'রতে হবে। ইহার নাম তৃণাদপি সুনীচেতা ও সহিষ্ণুতা। কিন্তু যখন কেহ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকবেন, তখন আমি জান্‌ব—যে-সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন, ভগবান্ তা'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান করে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বার করে আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান দুনিয়ার নিন্দা সহ্য করতে না শিখলে হরিনাম ক'রবার অধিকার হয় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা হরিকীর্ত্তন নয়। যা'র দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ হয়, সেটীই হরিকীর্ত্তন।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ভোগ হইয়া যাইবে। এক মিনিটকালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদপদ্মধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।

কৃষ্ণচেষ্টা ব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হইলে অসুবিধা হইবে। তজ্জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্ত্তন বিচার হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।

ভগবানের তনু কেহ এ চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। যদি তাঁহার দেখার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। তবে তিনি আমাদের মলিন চিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন; সেইজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়।

যিনি সত্যসত্যই নিজের সুবিধা চাহেন, তিনি সত্যসত্যই সাধুর দেখা পান এবং সেই সাধুর কৃপায় সাধুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন। যিনি ভগবানের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই ভালবাসে না, এইরূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়।

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে দুস্তর অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুকুরশৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না। সর্ব্বাত্মায় আশ্রিতপদ ব্যক্তির উপর ভগবানের দয়া শতকরা শত পরিমাণে আসিয়া যায়।

জগতে যত লোক আছে, তাহাদের যত কথা, সমস্তই ভোগের কথা। তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাওয়া যাইবে না। সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মাধুর্য্য অনুভূত হয়। শ্রীনাম-সেবা ও কৃষ্ণ-সেবা একই বস্তু। মুক্তকুলই শ্রীনামভজন করেন।

গোঁড়ামি কি সঙ্কীর্ণতা ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর]

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

এই উক্তিটী বর্ত্তমানে বহুল প্রচারিত মতানুসারে গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা এবং অনুচিত বলিয়া সুবুদ্ধিহীন জনগণকর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহাকে অনুদারতা বলিয়া বিচার করত 'সকল ধর্ম্মমতই সমান'—এই প্রকার মতবাদ সত্য এবং আদরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য—ইহাই তাঁহাদের বিচার। ইহার সত্যাসত্যতা বিচার করিবার অক্ষমতা হইতেই এবম্বিধ ধারণা হীনযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। পরন্তু উল্লিখিত পয়ারস্থিত মতটী আমাদের ন্যায় সাধারণ মায়ামুগ্ধ জনের উক্তি নহে। ইহা সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালদর্শী, অভ্রান্ত দৃষ্টি, শাস্ত্রপ্রণেতা এবং শাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ, এমন কি ভগবদবতারের বাক্য। ইহা পরমসত্য। ইহা তথাকথিত তামসিক-রাজসিক সমাজনেতা বা কর্ম্মবীরের আপাত মধুর উক্তি নহে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই পদ্যানুবাদের মূল সংস্কৃত শ্লোকটী বর্ত্তমান।—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ (ভাঃ ১।১।২)

অর্থাৎ—এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি—শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকী-রূপে আবির্ভূত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব, অন্য শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শ্রীধরস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—'প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।'

অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।৬-৭ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

অর্থাৎ—শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদ ঋষির উপদিষ্ট ভক্তিযোগস্থ সমাধিতে দর্শন করিলেন যে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীবিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জীবের সংসারভোগ নিবৃত্ত হয়। তজ্জন্য সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলহেতু শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন এবং সেই পারমহংসী সংহিতা—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

ইহা অতিস্তুতি বা মিথ্যা বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা বর্ত্তমান। পাণ্ডববংশধর শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।—

শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী "লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্।"—এই বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে—এই অভিসম্পাৎ শ্রবণ করত পরীক্ষিৎ মহারাজ রাজত্ব ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান মজঃফরনগরস্থিত শুকরতল নামক স্থানে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই গঙ্গাতীরস্থ সভায় সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী ঋষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। যথা—

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥
অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ॥
মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনির্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ॥
অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে॥

উপস্থিত নানামত বা পথাবলম্বী সাধুগণকে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—(ভাঃ ১।১৯।২৪)

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছামিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥

অর্থাৎ—হে বিপ্রগণ, আমি বিশ্বাসের সহিত একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের পাপসম্পর্করহিত কি কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বলুন।

কিন্তু ঋষিগণ নিজ নিজ মত বা পথ—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি অনুসারে পরম কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিলে, তাঁহাদের মতানৈক্য ঘটিল; সকল মত বা পথ এক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এস্থলে টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"তত্র তেষু যাগ-যোগ-তপোদানাদিভির্ব্বিবাদমানেষু সৎসু যদৃচ্ছয়া গাং পর্য্যটন্ ব্যাসপুত্রস্তত্রাভবৎ।" তৎকালে সমবেত সাধুগণ সকলেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ততেজঃ তাঁহাকে লক্ষণের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়া, স্ব-স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজও যথোচিত শ্রেষ্ঠ পূজা করত তাঁহাকেও সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা॥
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্॥ (ভাঃ ১।১৯।৩৭-৩৮)

অর্থাৎ—যতপ্রকার যোগী (কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্ত) বর্ত্তমান, আপনি তাঁহাদের পরমগুরু; আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—এই সংসারে সম্যক্-সিদ্ধিলাভের উপায় কি? যে-সমস্ত মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন, কোন্ কার্য্যই বা সর্ব্বথা করা উচিত।

প্রভো! মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা আবশ্যক, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, আর যাহা তদ্বিপরীত তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন। তখন স্ব-স্ব মতে সিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার পথের প্রবর্ত্তক মুনিগণের সমক্ষে শ্রীব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে,—সংসারিজীবের তপযোগাদি মোক্ষমার্গ বহু থাকিলেও শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগই একমাত্র সমীচীন পন্থা। **অন্য পন্থা মঙ্গলময়, সুখরূপ ও নির্ব্বিঘ্ন নহে**। সকল মতে বা পথে একইপ্রকার মঙ্গলময় ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। তজ্জন্য হে রাজন্! শ্রীহরিই মনুষ্যগণের একমাত্র শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য। ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত বেদশাস্ত্র স্বীয় মনীষাদ্বারা তিনবার বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়াছেন যে, যাহাতে প্রিয়তম হরিপদে রতি জন্মে সেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতম পথ। যথা—(ভাঃ ২।২।৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭)

> ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
> বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥
> ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
> তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥
> তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
> শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥
> পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
> পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

অতএব, শ্রেষ্ঠশাস্ত্রবর্ণিত এই মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত বা পথ বলিয়া গোঁড়ামি করা কি উচিত নহে?

এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সনাতন-বিচারধারা তাহা আমরা শ্রদ্ধেয় পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।—

> বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

মর্ম্মার্থ—যাহা অদ্বয়জ্ঞান, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' এবং 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

> অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
> 'ব্রহ্ম', আত্মা', 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ॥ (চৈ চঃ আঃ ২।৫৩,

উল্লিখিত বাক্যের 'ব্রহ্ম', 'আত্মা' ও 'ভগবান্' — এই পদ তিনটী আপাত বিচারে এক-তাৎপর্য্যপর বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাহার ফল বিচারে তাহা অতীব তরতম বা নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট ভেদাত্মক। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মতত্ত্বকে লাভ করিলে যে-প্রকার লাভ বা সুখ, ভগবত্তত্ত্বলাভে অনুভব বা সুখের সহিত তুলনায় তাহা অতীব অপকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র। ভক্তির মাহাত্ম্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিষয়ক মোক্ষের মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা সাধ্যফল-স্বরূপে নহে, যেহেতু তাহাতে বাস্তব সুখের গন্ধও নাই। যে-প্রকার রোগমুক্তাবস্থায় এবং সুষুপ্তিকালে নিজকে সুখী বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিষয়ক মোক্ষসুখও কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ এই মোক্ষকে অজ্ঞান বলিয়াই কথিত হয় এবং প্রকৃত মোক্ষতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ জনগণের ইহা রুচিকর। ইহা শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী।

(ভাঃ ১০।১৪।২৬)

অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষলাভ উভয়ই মিথ্যা। তন্মতে বন্ধমোক্ষও মিথ্যা; পার্থিব দিবারাত্র-জ্ঞানদ্বারা সৌরবিম্বে দিবারাত্র-জ্ঞান যেরূপ কল্পনা ও মিথ্যা।

শাস্ত্রের সুষ্ঠুবিচারে আরও দেখা যায়—ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্ববিদ্গণ যে মোক্ষকে বহুমানন ও সিদ্ধির জন্য বহুক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা ভগবন্নামগ্রহণাত্মক ভক্তি-পথিকের অত্যন্ত অনায়াসলভ্য হইয়া থাকে। এই মুক্তির জন্য শ্রীভগবানের নামের সেবার প্রয়োজন হয় না, কিঞ্চিন্মাত্র কোনপ্রকার পরিহাস বা অবহেলনাদি রূপে একবার উচ্চারণমাত্রেই, জিহ্বাগ্রে গ্রহণদ্বারাই অথবা কর্ণমধ্যে প্রবেশমাত্রই মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। এমন কি অত্যন্ত পাপাচারিব্যক্তিও এইরূপ নামাভাসে মোক্ষলাভ করে। যথা—

বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি।
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥ (ভাঃ ৬।৩।২৪)

শ্রীভগবন্নাম শ্রবণমাত্রেই মোক্ষপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ-উপাখ্যানারম্ভে দৃষ্ট হয়—

'কস্মিঞ্জলে মগ্নং জপপরং ব্রাহ্মণং ভক্ষয়িতুমাগতস্য ব্যাঘ্রস্য তেনৈব ব্যাধেন হতস্যাকস্মাদ্দগত ভগবন্নাম শ্রবণেনৈব মুক্তির্জাতা।' অর্থাৎ—জলমগ্ন জপরত কোন এক ব্রাহ্মণকে একটী ব্যাঘ্র আক্রমণ করাকালে একটী ব্যাধও ব্যাঘ্রটীকে

নিহত করে। মৃত্যুকালে অকস্মাৎ উদ্গত ভগবন্নাম শ্রবণ করায় ব্যাঘ্রটীর মুক্তি-লাভ ঘটিয়াছিল।

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া যে বিচার করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের বিচার-নৈপুণ্যহীনতারই পরিচায়ক। মোক্ষের রমণীয়তা-প্রকাশক বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের মত এই প্রকার,—১। অশেষ প্রকার দুঃখনিবৃত্তি মোক্ষ, অথবা ২। নৈয়ায়িক মতে—আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, ৩। কোন কোন বৈদান্তিক মতে—অবিদ্যা এবং কর্ম্মের ক্ষয়ই মুক্তি, ৪। বিবর্ত্তবাদিবৈদান্তিক মুখ্যমত—মায়াকৃত ভেদজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মানুভূতি। যথা—'মুক্তির্হিত্বাঽন্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।' দেহাত্মবাদিবিবর্ত্তবাদমতে—জীবস্বরূপানুভূত-চিৎকণ সচ্চিদানন্দাংশানুভব।

প্রথম দুই পক্ষে—কেবল দুঃখনিবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছে; সুখ-প্রাপ্তির উল্লেখ নাই। অন্যপক্ষীয় মতবিচারে সুখের উল্লেখ থাকিলেও, সে সুখ অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর। সচিদানন্দঘন শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবাজনিত ভক্তিসুখের তুলনায় তাহা মহাসমুদ্র এবং গোষ্পদখনিত গর্ত্তের পরিমাণগত জলস্বরূপ বুঝায়। শাস্ত্রে মোক্ষকে যদিও সুখ বলা হইয়াছে, পরন্তু তাহা দুঃখাভাবই এবং 'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ' ন্যায়ানুসারে বলা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তিসুখের মাহাত্ম্যাধিক্য বুঝাইবার জন্যই তাহা বলা হইয়াছে।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে সত্য এবং এই ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিকার ও নিশ্চেষ্ট বলা হইয়াছে। অতএব এইপ্রকার ব্রহ্মের অনুভবদ্বারা কোনও সদ্গুণের অনুভব হইতে পারে না। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' বাক্যটী এই প্রকার ব্রহ্মের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এই ব্রহ্ম যে আনন্দময় তাহাও কেহ বলিতে পারে না, কারণ তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁহার কোনও ভক্তসঙ্গী নাই। তিনি কেবল এককই বর্ত্তমান। তিনি আনন্দময় কি দুঃখময় তাহা অনুভব করিবারও কেহই নাই। অতএব তাঁহাকে আনন্দময় বলা নিরর্থক। আরও এই ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। তাঁহার চিন্তাদ্রতাদি ক্রিয়া নাই। তাঁহার মনোহর বিচিত্র মূর্ত্তিবৈভব নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়—তাঁহার শ্রেষ্ঠ রসান্বিত রূপ-বেণু-লীলা-প্রেমাদি মাধুর্য্যও নাই। সুতরাং এইরূপ ব্রহ্মানুভব সত্ত্বেও অসীম সুখানুভব কিরূপে সাধিত হইতে পারে? এতদ্দ্বারা ভগবত্তত্ত্বেরই আনন্দময়ত্ব বিঘোষিত হইতেছে।

ভগবত্তত্ত্বই পরব্রহ্ম (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম), তিনিই পরমাত্মা (সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী), তিনিই পরমেশ্বর (ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের নিয়ন্তা), তিনি সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তিমান্। অতএব তিনি অচিন্ত্য, অদ্ভুত, বিবিধ মহিমার মহাসমুদ্রস্বরূপ। এই কারণেই 'পরম' পদটী 'ব্রহ্ম' ও 'আত্ম' পদদ্বয়ের পূর্ব্বে যোজিত করিয়া 'ভগবৎ'-তত্ত্বের

মহিমার সর্ব্বোত্তমতা বর্ণিত হইয়াছে। 'ভগবৎ'-তত্ত্ব অপেক্ষা অন্য কোনও তত্ত্বের মাহাত্ম্যাধিক্য এমন কি সমতাও নাই বলিয়া 'ভগবৎ'-পদটীর পূর্ব্বে কোথাও 'পরম' পদটী যুক্ত অর্থাৎ "পরম ভগবান্" পদের ব্যবহার নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীতা ৭।৭)

গীতায় ও ভাগবতে তাঁহাকে অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন **তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ** কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।
(গীঃ ১১।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধববাক্য—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥
(ভাঃ ৩।২।২১)

ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বমধ্যে ভগবত্তত্ত্বের বর্ত্তমানতা নাই; পরন্তু ভগবৎ-তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের পরিপূর্ণ বর্ত্তমানতা বিদ্যমান আছে। যথা—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রঃ সং ৫।৪০)

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্বকে তাঁহারই আশ্রিততত্ত্ব বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহহম্।' (গীঃ ১৪।২৭)

অক্ষরব্রহ্মনিষ্ঠ শনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শনজন্য বৈকুণ্ঠে দ্বারপালদ্বয়-কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, অক্ষরব্রহ্মজনিত আনন্দ অপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট প্রেমানন্দ লাভ করত রোমাঞ্চ কলেবর হইয়াছিলেন। যথা—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ সবিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥
(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

নির্গুণব্রহ্মাবিষ্ট শ্রীশুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে ভগবন্মহিমাকৃষ্টির কথা নিজমুখে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা (ভাঃ ২।১।৯, ১০)—

পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্ধধতাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতীঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৪।১০ শ্লোকটী ভগবত্তত্ত্বেরই পারতম্যের জাজ্জ্বল্যমান্ প্রমাণ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—এই বাক্যে ব্রহ্ম, পরমাত্ম প্রভৃতি সকলপ্রকার তত্ত্বনিষ্ঠপুরুষের ভগবদ্গুণদ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকায় ভগবত্তত্ত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচারিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, শ্রীভগবত্তত্ত্বের উপাসক ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করত ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রাদিতে একটীও নাই।

আরও দেখা যায়—মোক্ষকামিগণ গো-বিপ্রঘাতী এবং বেদ ও যজ্ঞের বিরুদ্ধাচারী অসুরগণকে শাস্ত্রাদিতে নিন্দা করিয়া থাকেন। পরন্তু মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ যে মোক্ষকে লাভ করেন, নিন্দনীয় অসুরগণও সেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষ কি বিচারে মাহাত্ম্যপূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? এই মোক্ষ নিন্দিতজনের প্রাপ্য বলিয়া তাহাকে নিন্দনীয় বলাই সঙ্গত। কংস, পূতনা, অঘাসুর প্রভৃতি গো-বিপ্র এবং যজ্ঞ-বিপ্রাদির বিরোধী। ইহারাও শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হওয়ায় মোক্ষলাভ করিয়াছে। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদারতা এবং অসুরগণও মোক্ষলাভ করে বলিয়া মোক্ষের হীনতা প্রকাশ পায়।

এইরূপে শাস্ত্রবিচারে ব্রহ্ম, পরামাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের মহিমা একরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহাদের পথ বা মতকেও কখনই সমফলপ্রসূ বলা সঙ্গত নহে। শাস্ত্রের এই সংসিদ্ধান্ত নিষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করাই গোঁড়ামি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

"শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকট-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

সনাতন-বিধান

শুন শুন বিশ্বজন
করি এই বিজ্ঞাপন।
যে কথা শুনিলে হন
সদা বন্ধন মোচন ॥
কদাচন যে বচন
নাই তার উল্লঙ্ঘন।
সতত করে পালন
সুমঙ্গল অনুক্ষণ ॥
দেখ দেখ জগজ্জন
যে কথা নয় বিস্মরণ।
সর্ব্বদা তাঁর স্মরণ
যে করে অনুশীলন ॥
সঙ্গে রহে সুবিধান
আত্মশান্তি সুকল্যাণ।
বেদবাক্যে গুরুজ্ঞান
যাঁর হয় সুসন্ধান ॥
উপনিষৎ-রামায়ণ,
শ্রীভাগবত-পুরাণ।
যে নিয়ন্তা নিরঞ্জন
অন্তর-বাহ্যে অবস্থান ॥
নিরন্তর ঋষিগণ
গান করে সর্ব্বক্ষণ।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ত্রিবিক্রম
পাতালাদি লোক হন ॥
বিরাট্ চৌদ্দভুবন
নিত্য যাঁর অবস্থান।
এই বিদ্বৎ-বচন
যিনি অবগত হন ॥
কালরূপ ধরি রণ
যে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বক্ষণ।
কালচক্রে সুশাসন
নিত্য করে অনুক্ষণ ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশন
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারণ।
ত্রিবিধ রূপ হয়েন
করেন বিশ্বচালন ॥
ঋষি-দেব-মুনিজন
সদা নিয়ন্ত্রিত হন।
মর্ত্ত্যবাসী লোকজন
মনু আদি রাজগণ ॥
গ্রহগণ অনুক্ষণ
কালদণ্ডে ভ্রাম্যমান।
সপ্ত পাতাল যে জন
যে যন্ত্রে চালিত হন ॥
ভূতভৃৎ ভূতভাবন
কলনেতে ক্রিয়মান।
কর্ম্মদণ্ডে জন্মদান
যোনিদণ্ডে জন্ম পান ॥
ত্রিগুণের যে বন্ধন
ঊর্দ্ধ্ব অধঃ সবে হন।
জন্ম-মৃত্যু সবে পান
দণ্ডধারীর এ বিধান ॥

সবে হও সাবধান
দণ্ড কভু নাই তান।
শান্তি রাজ্যে যাও মন
দিব্যদেহ সে-যৌবন ॥
অশোক-অভয় স্থান
অমর আনন্দ পান।
জন্ম-মৃত্যু ত্রিতাপন
না রহে তাঁর কখন ॥
বিধি-নিষেধ-পালন
সদা হরিসঙ্কীর্ত্তন।
যানে করি, আরোহণ
যান তিনি বৃন্দাবন ॥
কাম-ক্রোধ-লোভে মন
নিজ স্বার্থে বিচক্ষণ।
আর অসচ্চিন্তায় মন
বিদ্যা-বুদ্ধি সর্ব্বক্ষণ ॥
দুর্ব্বুদ্ধি দুষ্কর্ম্মে লীন
না মানিল বিধিগণ।
অশান্তি কৈলে বরণ
কভু নহে সুকল্যাণ ॥
যদি চাও সুবিধান
হরিপদে দাও মন।
ছাড় তুমি কুল-ধন
বিদ্যা-বল-অভিমান ॥

জন্ম-মৃত্যু নিবারণ
কালদণ্ড নিয়ন্ত্রণ।
সাধুসঙ্গে দাও মন
তবে হবে উদ্ধারণ ॥
এই গান মহাজন
যুগধর্ম্ম—নাম-কীর্ত্তন।
তরে জীব সর্ব্বক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ-নারায়ণ ॥
যায় বিপদ তখন—
হরিপদ বিস্মরণ।
ভব-ভয় নিবারণ
যদি হও সচেতন ॥
লভে ভক্তি সে তখন
জন্ম-বন্ধ অকারণ।
এই শান্তির বিধান
সর্ব্ব বিশ্বে সুকল্যাণ ॥
ভ্রান্তি ত্যজ জীবগণ
—এই ধর্ম্ম সনাতন।
পরম পিতার সেবন
অন্তে মুক্তি তার তখন ॥
দেখ, শুন সর্ব্বজন
ছেড়ে যাবে দেহ-ধন।
শাস্ত্রবাক্যে দাও মন।
গায় দাস হরিজন ॥

শ্রীগুরু-গৌর-দাসানুদাস—
—**শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন (মহারাজ)**

গৃহকর্ম্ম—বন্ধন-স্বরূপ বিস্মৃতির ফল

অণুচৈতন্য জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ পূর্ণচৈতন্যরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক। শ্রৌতপথে অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই। জড়জগতে জড়বস্তুর সহিত সান্নিধ্যক্রমে বদ্ধজীব জড় অহংকারে প্রণোদিত হইলে নিজের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি ঘটে অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ সেবাই আমার ধর্ম্ম' এই কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। ভগবদ্‌বিস্মৃতি হইলেই বদ্ধজীব বিভিন্ন ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এবং ভোগধর্ম্মক্রমে শয্যা, আসন, ভ্রমণ, বৃথাগল্প, ক্রীড়া, আহার ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধিহীন জনগণ প্রত্যেকে স্ব-স্ব জড়াভিমানবশতঃ ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নিজ নিজ ভোগের কার্য্যে ব্যস্ত হয়—ইহাই তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা।

ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়, সেইকালে তাহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া জীব মায়িক শরীর আশ্রয় করত মায়ার গুণে জড়বস্তুতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। আপন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম-জরা-মরণ-মালা গলায় পরিয়া সে কখনও উচ্চ, কখনও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হয়। সংসারে দ্রব্যের অভাবে সে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করে, নানাবিধ পীড়ার দ্বারা তাহার শরীর সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হইতে থাকে। গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখনও কখনও সে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেও বাধ্য হয়।

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলেই জীবকে নশ্বর জগতে সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির স্বীকার হইতে হয়। জীব যখনই আনন্দময় ভগবানের সেবারহিত হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভোগী মনে করিয়া নিজ ভগবদ্বিমুখ উপাধিবশে আসক্ত হয়, তখনই তাহাকে নানাবিধ অমঙ্গল আক্রমণ করিয়া থাকে। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার বিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে এবং সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া জগতে ভগবদিতরানুভূতির সহিত প্রণয় বা বিদ্বেষ করিয়া থাকে, কিন্তু উহা যে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত নহে—এই কথা বুঝিতে পারে না।

প্রপঞ্চে ভগবৎপ্রীতির অভাববশতঃ জীবের অবৈধ বাসনা, বিষ্ণুর রূপ-রস-গন্ধাদির সেবা করিতে অক্ষমতাহেতু সে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া অশেষ যন্ত্রণা

ভোগ করে। এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে পরন্তপ, ভক্তিধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করে।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও পাওয়া যায়,—"দেবগণেরও বাঞ্ছিত দুর্ল্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা চিরকালের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করে মাত্র।" শ্রীভাগবতে "গুণৈর্বিচিত্রা" শ্লোকে (ভাঃ ৩।২৬।৫) ভগবান্ শ্রীকপিলও মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—"চিৎকিরণ-স্বরূপ জীবের সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের দ্বারা বিচিত্ররূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী মায়াকে দেখিয়া মোহ হয়। তখন মায়ার জ্ঞান-আবরিকা শক্তি অবিদ্যা তাহার স্বরূপভ্রম উদয় করে। ভগবদনুবৃত্তিই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, ইহাই জীবের বন্ধনের হেতু।"

শ্রীহরিভজনই সংসার-বন্ধন ছেদনের নিশ্চিত খড়্গ

কৃষ্ণমায়ায় বিমুগ্ধ কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং মঙ্গলময় ভগবানের বিস্মৃতির জন্য অমঙ্গলসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। নিত্যমঙ্গল কি বস্তু—তাহা তাহার প্রতীতিগোচর হয় না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হরিসেবোন্মুখতা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই তাহার সকল অমঙ্গল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেহেতু কৃষ্ণকে ভুলিয়া তাহাকে অসংখ্য প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, সেইহেতু কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিলে তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম জাগরূক হইবে। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে উদিত হইলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হন। যেরূপ অজ্ঞানতার জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়; তদ্রূপ অজ্ঞানহেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার কৃষ্ণস্মৃতির উদয়ে উহা বিনষ্ট হয়। ভগবৎস্মৃতিতে কেবলমাত্র অমঙ্গল বিনষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু বাস্তবমঙ্গল প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়।

জীবাত্মা দেহী ভক্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে ভগবদ্বিমুখ সংসার-ধর্ম্মে বিমূঢ় করিয়াছে এবং জন্ম, মরণ, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ক্লেশ দিতেছে, তখন তিনি হরিস্মরণ ব্যতীত—বৈকুণ্ঠোপলব্ধি ব্যতীত মায়িকবিচারে অবস্থান করেন না। বদ্ধজীবের কর্ম্ম ও মায়িকজগতের গুণসমূহ হইতে যে সৃষ্টি হয়, সমস্তই ত্রিগুণময়। নিত্য ভগবৎসেবাপর জনগণ ভক্তিযোগের দ্বারা গুণত্রয়কে পরাজিত করিয়া স্বরূপে গুণাতীতরাজ্যে বাস করেন এবং ভগবদ্ভাবসমূহের সেবা করিতে সমর্থ হন। কোন কোন স্থানে জীবন্মুক্তগণও (ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিলে) সংসার বাসনা লাভ করেন; কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্ত-যোগিগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসারে লিপ্ত হন না।

সাংসারিক জীবগণ নানাবিধ বিষয়-কথায় অহোরাত্র যাপন করে, তাহাদের পরমার্থ-কথা শ্রবণ করিবার সময় নাই। তথাপি ঘটনাক্রমে অল্পক্ষণের জন্য নিত্যভগবদ্ভজনশীল সাধুগণের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিলে প্রাপঞ্চিক ক্লেশসমূহ লাভের জন্য বদ্ধজীবের উৎসাহ হ্রাস পায়। মুক্তপুরুষগণের দর্শন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ, তাঁহাদিগের আচরণ-স্মরণাদিতে জীবের ভোগজনিত মায়াবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি হ্রাস পায়—ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ (ভাঃ ১১।২।৩৭)

—"পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমান-জনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণ-মায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্যভক্তি-সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন।" গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত ভগবৎস্মৃতি উদয়ের অন্য কোন উপায় নাই। ভগবৎস্মৃতির নিশ্চিত খড়্গই গৃহকর্ম্ম-বন্ধনরূপ মহাশত্রু-সংহারে সতত সমর্থ—ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর]

এইভাবে স্বর্গলোকের পরে মহ, জন, তপঃ, সত্য—আরও চারটে লোক আছে। সত্যলোক মানে লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্থান। এই সাতটা লোকই মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু স্থানে গিয়ে আমাদের কি লাভ আছে? যাঁরা স্বর্গকামী, তাঁরা স্বর্গে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু ওখানে গিয়ে ত' লাভ নাই, আবার পুনরাবর্ত্তন হচ্ছে। তাই ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, —দেখ অর্জ্জুন, আমার যেখানে স্থান, সেটা তোমারও স্থান ছিল। তুমি বর্ত্তমানে বাস্তুচ্যুত হয়েছ, তা তুমি বুঝতে পারছ না।—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যেখানে গেলে আর এই ধরাধামে ফিরে আসতে হবে না, এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে এসে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হতে হবে না, সেইটাই হল তোমার স্থান, সেইটা হল আমার স্থান—বৈকুণ্ঠধাম। 'Baikuntha is our heritage, earth's but a players' stage'—সেইকথা বুঝাচ্ছেন। 'Back to God and back to Home—Eternal Home'—সেই কথা বলেছেন। ভগবানের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, সেইটা হল আমাদের পূর্ব্ব বাসস্থান।

আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড—চোদ্দটা কারাগারের কারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গাদেবীর কাছে বন্ধদশাই প্রার্থনা করছি। পরন্তু কেউ মুক্তি প্রার্থনা করছি না। তিনি মুক্তি দিতে পারেন না, তিনি Recommend করতে পারেন। কিন্তু সেই Recommendation পেতে গেলে আমাকেও ত' সেইরকম ধরণের আর্জ্জি করতে হবে। Application—দরখাস্তটা সেইভাবে দিতে হবে। আমি কিছু শিখি নাই, জানি নাই, কি করে শিখব, জানব ? সেই মায়াদেবী আমার উপর কখনও বিমুখমোহিনী, আবার কখনও উন্মুখমোহিনী। যখন পার্থিব বিষয়ে আমার অযোগ্যতা—অকিঞ্চিৎকরতা জেনে, বুঝে হে দেবি ! তুমি আমাকে ভগবানের দিকে পৌঁছে দাও, দেখিয়ে দাও আমাকে সেই পথ—এই প্রার্থনা করি, তখন তিনি সেই পথ আমাকে দেখিয়ে দেন। তখন তিনি আমার কাছে উন্মুখমোহিনী মায়া। আর যখন পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, অর্থাৎ বঞ্চিত হতে চাচ্ছি, তখন তিনি পার্থিব জিনিস দিয়ে বিমুখমোহিনী মায়ারূপে আমার কাছে প্রকাশিতা। সুতরাং আমি কি চাইব, সেটা ত' আমাকে শিখতে হবে। তাঁর নিকট কি প্রার্থনা রাখব, সেটাও ত' আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

ঈশ্বরের সেবার কথা সকল মৌলিক শাস্ত্র-গ্রন্থে বলা আছে, দেব-দেবীর সেবার কথা বলা হয় নাই। 'ভক্তি'-শব্দটা ভগবানকে কেন্দ্র করে, কোন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে নয়—এটাও আপনারা জানবেন। "ভক্তিঃ অস্য ভগবতঃ ভজনম্।"

'হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' 'হৃষীক্' হল ইন্দ্রিয় ; অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতিই হৃষীকেশ ভগবান্। তাঁরই সেবাই হল ভক্তি। অন্য কোন দেব-দেবী বা বদ্ধজীবের সেবা ভক্তি নয়। সেটা সনাতন শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। 'হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা, ইহা ভক্তি পরম-কারণ।' এটা সনাতন ধর্ম্মের Theory। অসনাতনী তৎকালিক ধর্ম্মের মধ্যে দেবতান্তরের উপাসনার কথা এসেছে। বহ্বীশ্বরবাদ—বহু ঈশ্বর কল্পনা বা

Polytheism এবং তারই ভিতরে এসে গেছে Henotheism বা পঞ্চোপাসনার কথা। এটা সনাতন ধর্ম্মের কথা নয়, গীতা-ভাগবতের কথা নয়।

'যান্তি দেবব্রতা দেবান্'—দেবযাজিগণ অনিত্য দেবলোকে যাচ্ছেন। 'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ'—যারা পিতৃপুরুষগণের উপাসনা করছেন, তারা যাচ্ছেন পিতৃলোকে —ভুবলোকে। 'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা'—যারা ভূত, প্রেত, পিশাচের উপাসনা করছেন, তারা ভূত-প্রেতাদিলোকে যাচ্ছেন। 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্'—হে অর্জ্জুন! যাঁরা আমার যজন-যাজন করেন, আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমার নিত্যধামে গমন করেন। সুতরাং সাধন-ভজনের ফলটা ত'এক হল না, উপাসনা-আরাধনার ফল ত' এক হল না। আমরা সবটার ফল এক করে দিতে যাচ্ছি কেন? এটা কোন্ শাস্ত্রে কোথায় লেখা আছে?—কোথাও লেখা নাই। সুতরাং উপাস্য-বস্তুর তারতম্যানুসারে সাধন-ভজনের এই বৈপরীত্য বা পার্থক্য গীতা-ভাগবতাদ শাস্ত্রে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। আসলে তুলনামূলকভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনার অভাব হয়েছে আজ। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি, গণ্ডগোল হচ্ছে আজ। তত্ত্বদর্শন কেউ আমরা জানতে চাচ্ছি না, বুঝতে চাচ্ছি না। 'সবই সমান' বলে সাফাই গাইছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুন ত'! এর থেকে আত্মবঞ্চনা আর কি হতে পারে?

এই সংসারে বাস করি আমি। আমি যখন বাজার-হাট করতে যাচ্ছি, হাতে ব্যাগ রয়েছে। আলুর দোকানে গেছি, এক কেজি আলু দরকার। সুন্দর নিটোল আলু বেছে বেছে টুকরীতে রাখলাম। দোকানদারকে বললাম,—ওজন করে দাও। কেন? দোকানদার যে কোন আলু তুলে দিলে সেগুলো ত' নিয়ে নিতে পারি। সব ত' সমান, কেন তাহলে বাছাবাছি? ওটা পোকা লাগা, ওটা পচা, ওটা কাটা—এসব বাছাবাছি কেন? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত ওয়াকিবহাল, ভীষণ সাবধান। কিন্তু যখনই ধর্ম্মের কথা আলোচনায় আসবে, তখনই 'সব সমান' বলে দিয়ে বসে আছি। এ যেন Logic এর Fallacy। এর মত ফাঁকি আর আছে কিছু দুনিয়ায়? মানুষ আজ নিজকে এইভাবে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। আত্মকল্যাণচিন্তার কথা যখনই আসে, তখনই আমরা বলে দিই 'সব ধর্ম্ম সমান'। আত্মতুষ্ট ভাব লাভ করবার জন্য ওরকম বলতে পারি আমি, কিন্তু বাস্তবে আত্মতুষ্টি ওতে হবে না, ওতে নিজকে বঞ্চিত করাই হবে। জগৎকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং নিজকেও বঞ্চনা করা হচ্ছে ঐ ব্যাপারে। বাস্তবে কিন্তু সব সমান নয়। সব সমান কি করে? প্রমাণ করা যাবে কি? কেউ প্রমাণ করে দিতে পারবেন কি?

'আত্মদর্শনে সাম্যবাদ'—ঋষিগণের উক্তি, গীতা-ভাগবতের মধ্যে সুষ্ঠু বিচার রয়েছে। আত্মদর্শনে সাম্যবাদ প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া শাস্ত্রেই রয়েছে সাম্য, স্বাধীনতা মৈত্রীর কথা। সেই কথা বর্ত্তমানে রাজনীতি ধার করে বলে যাচ্ছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ওকথা বা বিচার নাই। Equality, Liberty, Freternity ধর্ম্মজগতের কথা, অধ্যাত্মবাদের কথা। ভগবান্ যেখানে অধ্যাত্ম-বাদের কথা প্রকাশ করেছেন, আত্মদর্শন যেখানে জানিয়েছেন লোককে, সেইখানে একথা বলা আছে। ঋষিগণ বোকা ছিলেন না, তাঁরা সবই বুঝতেন, জানতেন। 'সর্ব্বজ্ঞ' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী ঋষি তাঁদের বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ সান্দীপনি গুরুর গৃহে গেছেন। সান্দীপনি গুরু কি উপদেশ করেছিলেন ভগবানকে। স্বয়ং ভগবান্ শিষ্য হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ঋষি তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। বেদ অধ্যয়ন করতে গেছেন। বেদ অধ্যয়ন করতে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ভগবানের? বেদ ত' সেই ভগবানেরই নিঃশ্বসিত বাণী। সেটা আবার অধ্যয়ন করতে গেলেন কেন?—জগতের শিক্ষার জন্য? হে জগদ্বাসী! তোমরা জান, বোঝ, শেখ যে গুরুকরণের প্রয়োজন আছে। সদ্গুরু গ্রহণের দরকার ও তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশের প্রয়োজন আছে। তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ নিয়েই আমরা সাধন-ভজনপথে ঠিক ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারি। সেইজন্য ভগবান্ গুরুকরণ করলেন।

গুরুগৃহে গেছেন ভগবান্। সেখানে গুরুসেবা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। অন্যান্য সতীর্থগণকেও তিনি গুরুসেবা শিক্ষা দিয়েছেন, বর্ণনা আছে ভাগবতে। তথায় গুরু কিরূপ উপদেশ করেছেন কৃষ্ণকে?—তিনি একাধারে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ করেছেন। তা হলে ঋষিগণ সব বিষয় জানতেন না—একথাটা কে বলছেন?—আজকালকার তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় একথা বলছেন! এখনও পর্য্যন্ত সেই ঋষিগণের বিচার নিয়ে চলছে সবকিছু, সমগ্র বিশ্ব একাধারে চলছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি যা কিছু হয়েছে সব ঋষিগণেরই গ্রন্থ নিয়ে।

আপনারা শুনলে অবাক হবেন, মহাভারত লক্ষ শ্লোক-সমন্বিত গ্রন্থ। এর মধ্যে ২৫ হাজার শ্লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। বর্ত্তমানে তার সন্ধান মিলেছে। কি হয়েছিল? সেই শ্লোকগুলো কোথায় গেল? লক্ষ শ্লোক-সমন্বিত যে গ্রন্থ তার নাম মহাভারত। আমরা মহাভারত (Original Text) যখন আলোচনা করছি, তখন দেখছি তার ভিতরে ৭৫ হাজার শ্লোক। বাকী ২৫ হাজার শ্লোক কোথায়

গেল ? এ নিয়ে Research চলছিল। Research এ মিলেছে সেই ২৫ হাজার শ্লোক। জার্ম্মান সরকার ওটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। এর ভিতরে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উন্নতির কথা আছে। সেইগুলো এখন রপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাই ছেড়ে দিয়েছে ঐ ২৫ হাজার শ্লোক-সমন্বিত Chapter গুলো। সেইগুলো নিয়েই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে—পাশ্চাত্ত্য দেশ স্বীকার করছেন এটা। অস্বীকার করবার উপায় নাই। ঋষিগণের সব নিয়েই ত' সবাই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছেন। তাহলে সর্ব্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মৌলিকত্ব কোথায় ? Discovery আর Invention এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—Discoveryর যে সুনাম সেটা ঠিক আছে, কিন্তু Invention এর ক্ষেত্রে সুনাম সর্ব্বত্র এক নহে। সেই মৌলিক অবদান ঋষিগণের, তবে সনাতন আর্য্যঋষিগণের প্রতি অবমাননা কেন ? তাঁদের প্রতি উপেক্ষা কেন, অনীহা কেন, অশ্রদ্ধা কেন ? সেইটা বর্ত্তমান সমাজের কাছে প্রশ্ন। বিশ্বের যত সুধীসমাজ আছেন, শিক্ষিত সমাজ আছেন, বিদ্বজ্জনবরেণ্য আছেন, তাঁরা আজ এই প্রশ্ন রেখেছেন সমগ্র জগতের সামনে। এইরকম যে ঋষিগণ—যাঁদের কাছে আমরা চিরদিন ঋণী আছি, চিরদিন ঋণী থাকব, তাঁদের সমালোচনা কেন ? অজ্ঞ মনুষ্য আমরা জানি না আমাদের নিজস্ব কি সম্পদ্ আছে ? আমাদের কি গুপ্তধন আছে ? আমাদের জন্য কি রেখেছেন ঋষিগণ—এটা এখনও সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাই আমাদের ভিতরে এত দুঃখ-দৈন্যভাব।

মুনি-ঋষিগণ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাণী ও সমস্ত সম্পদ রেখে গেছেন তাঁদের ভাবী বংশধরগণের জন্য। ঋষিগণের মূল্যবান শিক্ষা—যেগুলো আজ পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে ইংরেজী অনুবাদ হয়ে আমাদের দেশে এসেছে—

"Socalled examinations are the enimies of education,
Degrees and diplomas are the armours of a fool ;
Charactor is the only security of a true administration ;
No state-ministry, but morality can rule a country."

শুনলে মনে হবে বোধ হয় এই সেদিনকার কথা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণেরই কথা ইংরেজী অনুবাদ হয়ে এসেছে আমাদের দেশে। সেই সনাতন ঋষিগণ কি বোকা ছিলেন ? বলছেন—State-Ministry দেশ রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু Morality এই দেশকে রক্ষা করতে পারে।

আমাদের যাঁরা Superior, গুরুজন, Guardian আছেন, তাঁদের বর্ত্তমানে আমরা সম্মান করতে শিখি নাই। ঋষিগণ সেই কথাটাও দুঃখ করে বলেছেন,

—"We think our forefathers and superiors fool, our wiser sons and daughters will no doubt think us so." অর্থাৎ আমরা আমাদের যে-সব ঋষিগণ, মনীষিগণ, ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ আছেন, তাঁদের যদি আমরা সম্মান দিতে না পারি, তাহলে আমাদেরও কেউ সম্মান দেবে না। আমাদের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে যদি আমরা সম্মান দিতে পারি, তাহলে আমরা সম্মানের দাবীদার হতে পারি।

পাশ্চাত্ত্য দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে "World Congress of Faiths" ধর্ম্মসভা হয়েছিল, সেইখানে পোপ—Arch Bishop যে কথাটা বলেছিলেন, সেটা একটা গৌরবের কথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। কোন্ ভারতবর্ষ?—অধ্যাত্ম ভারতবর্ষ, ধার্ম্মিক ভারতবর্ষ, নীতি-আদর্শপরায়ণ ভারতবর্ষের পক্ষে একটা গৌরবের কথা ছিল। আপনারা নিশ্চয় সেটা শুনেছেন, আমি পুনরায় সেটা বলতে পারি—"India guided by God, can lead the world back to sanity." 'India guided by God'—এই কথাটা পাশ্চাত্ত্য দেশ বলেছেন। ভগবান্-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, পরিচালিত অধ্যাত্ম ভারত কি করতে পারে?—'Can lead the world'—সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করতে পারে—সেই ক্ষমতা রাখে অধ্যাত্ম ভারত। 'Back to sanity'—তাহলে বর্ত্তমান দুনিয়াকে Insanity তে পেয়েছে, পাগলামিতে পেয়েছে। সে পাগলামি কি? যুদ্ধোন্মাদনা, রণোন্মাদনা, মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি। এতেই সমগ্র দুনিয়াকে পেয়ে বসেছে। এর হাত থেকে অধ্যাত্ম ভারত, নীতি-আদর্শপরায়ণ ভারত সমগ্র জগতের মোড় ঘোরাতে পারে, রক্ষা করতে পারে। ভারত সম্বন্ধে এর থেকে সুন্দর Idea আর কি হতে পারে বলুন ত'? আমরা ভারতবাসী, ঋষি অধ্যুষিত দেশের লোক, আমাদের এগুলো চিন্তা-ভাবনার বিষয়। আমরা বর্ত্তমানে এইসব চিন্তা করতে পারছি না। বড় দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে চলছি আমরা, আমাদের কিসে কল্যাণ হতে পারে? সচ্চিন্তা, সদ্ভাবনা ছাড়া মঙ্গল কোথায়?

ঋষিগণ আমাদের জন্য সবকিছু সম্পদ্ রেখে দিয়ে গেছেন। আমরা সেগুলো আহরণ করতে পারি ইচ্ছা করলে, কিন্তু তা না করে আমরা তাকিয়ে আছি পাশ্চাত্ত্য দেশ আমাদের কি দেবে, তার দিকে। তারা কি দেবে? তারা যেটুকু এখান থেকে Research করেছেন সেইটুকুই ত' তারা দিচ্ছেন। এখান থেকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে সেই মাল তৈরী করে শতগুণ দামে আমাদের নিকটেই বিক্রি করছেন। এই ত' বাহাদুরি! ঋষিগণের যে অবদান, তাঁদের সেই অবদানের তুলনা নাই। সে অবদানের কাছে আমরা চিরদিন ঋণী আছি, থাকব—এটাই

সব থেকে বড় বিবেচনার কথা। ভগবান্ আছেন, তিনি চিরসত্য, চিরনিত্য-তত্ত্ব। তিনি আছেন কি নাই —এই আলোচনা তখনই সার্থক হবে যখনই আমরা এই প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হব। একটা Academic discussion এর দ্বারাই আমাদের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব-অনুসন্ধিৎসার যেন সমাপ্তি না ঘটে।

মানুষ কিছু আলোচনা করতে চায়, ভালমন্দ বিচার করতে চায়। কিন্তু সে বিচারটা বাস্তবে রূপায়িত হবে কখন ?—যখন আমরা সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হব, তখনই সেটা Practical হয়। তা না হলে শুধু আমার শুনতে ভাল লাগে শুনলাম, পড়তে ভাল লাগে কোন সদ্গ্রন্থ পড়লাম, তাতে কি হবে ? সেই বিচার, সেই উপদেশ, সেই নির্দ্দেশ যদি প্রতিটি মানুষের সাধন-ভজন ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে তার বাহাদুরি আছে, তবে সেই শ্রবণ সার্থক। শ্রবণ কাকে বলছেন ?—সুপ্রাচীনকালে ভাগবত-ধর্ম্মসভায় মুনি-ঋষি বহু শ্রোতা বসেছিলেন। আজ এখানে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান হচ্ছে, ধর্ম্মকথা আলোচনা হচ্ছে। এরকম ধর্ম্মকথা বহুবার হয়েছে বহু জায়গায়। আজও হচ্ছে, বহুকাল পূর্ব্বেও হয়েছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের তিনটে অধিবেশন হয়েছিল। একটা আদি অধিবেশন হয়েছিল। সেই অধিবেশনে ভাগবত-পারায়ণও হয়েছিল। সেখানে সহস্র সহস্র ঋষি বসেছিলেন। ভাগবত-পারায়ণ যখন শেষ হয়, তখন কোন এক বিশেষ ব্যক্তির জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবানের প্রেরিত একখানি বিমান এসেছিল। শ্রোতাগণ সবাই অবাক। আমরা সবাই ভাগবত-কথা, সনাতন-ধর্ম্মতত্ত্বকথা শ্রবণ করলাম, আর ভগবানের এ'কি বিচার—শুধু এই একটা প্রেতের জন্য এই একখানি বিমান এসেছে। সত্যই সেই প্রেতকে বৈকুণ্ঠে লওয়ার জন্য বিমান পাঠিয়েছিলেন ভগবান্। দুজন বিষ্ণুদূত এসেছেন। তাঁরা ভাগবতকে প্রণাম করেছেন। যিনি ভাগবত পাঠ করছিলেন (গোকর্ণ) তাঁকে বললেন,—আমরা একে নিয়ে যেতে এসেছি, প্রভু আমাদের একে গোলোক-ধামে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। যান্, নিয়ে যান। কিন্তু অন্য শ্রোতা যাঁরা ছিলেন সবাই কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন। এই প্রেতও ভাগবত শ্রবণ করেছে, আমরাও শ্রবণ করলাম, আমাদের জন্য কেন বৈকুণ্ঠ থেকে বিমান আসে নাই ? আমাদের কি শ্রবণ হয় নাই ? তখন গোকর্ণ বললেন,—আপনাদের শ্রবণ হয় নাই। আপনাদের যদি সুষ্ঠু শ্রবণ হত, তাহলে আপনাদের জন্যও বিমান আসত। এই প্রেত যেভাবে শ্রবণ করেছে, এর শ্রবণ সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। এর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যুগপৎ হয়েছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যুগপৎ কেমন করে হয় ? কবি বর্ণনা করেছেন। কোন্ কবি ?—বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"

সেই অবস্থাটা বর্ণনা করেছেন। আপনাদের ঠিক ঠিক শ্রবণ হয় নাই, তাই আপনাদের জন্য বিমান আসে নাই। সুতরাং পুনরায় শ্রবণ করুন আপনারা। গোকর্ণ বললেন,—হাত তুলুন আপনারা। যদি ওখান থেকে ভগবানের ডাক আসে, তাহলে আপনারা সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন ত'? হাত একখানা দু'খানা করে ওঠে, সব হাত উঠছে না। তখন তিনি বললেন,—আপনারা ত' সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নন, তাহলে আমি আবার পরিশ্রম করব কেন? ধীরে ধীরে সব হাতগুলো উঠল। তখন গোকর্ণ বললেন,—আচ্ছা, আমি তাহলে দ্বিতীয়বার আবার ভাগবত-পারায়ণ করছি। পুনর্ব্বার পারায়ণের পর সকল শ্রোতৃমণ্ডলীকে লওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে অসংখ্য বিমান এসেছে। প্রেমময় ভগবান্, অনন্ত বিশ্বাত্মা যে ভগবান্, তিনি ত' সব সময়েই জীবনিচয়কে তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। কে তিনি? Full magnetic power।—তিনি হলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। আকর্ষণ-বিকর্ষণ আছে তাঁর। অনন্ত বিশ্বকে, অনন্ত জীবাত্মাকে তিনি সব সময় তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। লৌহখণ্ডসদৃশ জীবাত্মা সতত আকৃষ্ট হচ্ছেন তাঁর প্রতি। সেই প্রেমময় ভগবানের অহৈতুকী কৃপা, স্নেহ-মমতা অনন্ত বিশ্বের পরে প্রসারিত আছে, কিন্তু আমরা সেই ভগবানকে জেনে বুঝে উঠতে পারছি না, এটাই হল আমাদের দুর্দ্দৈব। আমরা আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করতে পারছি না। এ দোষ ত' ভগবানের নয়।

সাধন-ভজনের দ্বারা সেই ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, মুক্তিলাভ করা যায়। 'মুক্তি' কাকে বলে? 'মুক্তি' মানে কি? ভগবানের সঙ্গে Dialuted হয়ে যাওয়া—মিশে যাওয়া নয়। ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করাকেই 'মুক্তি' বলেছেন। সেই মুক্তি লাভ হয় ভক্তের। ভগবান্ নারায়ণের যেমন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, ভক্তের ঐরূপ চতুর্ভুজ রূপ লাভ হয়। ভগবানের মত ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয় এবং ভগবানের সমীপে তল্লোকে বাস হয়। তা না হলে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভ কিরূপে সম্ভব? ঐকান্তিক ভক্ত মুক্তিসুখকেও তুচ্ছ করিয়া মানেন,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সাধনার ক্ষেত্রে জীবাত্মা পরমাত্মাস্বরূপ সেই ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করে ধন্য হন। সেই কথাটা শাস্ত্রে বুঝিয়েছেন 'মুক্তি' শব্দে। "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভম্"। তাঁর পাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা লাভকেই 'মুক্তি' বলেছেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

প্রকৃত সুখ কি ?

আজন্মকাল আমরা যে সুখ-আকাঙ্ক্ষার পিছনে লালায়িত হয়ে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো ধাওয়া করে চলেছি, আমরা কি জানি—'আমাদের প্রকৃত সুখ কি ?' না, আমরা জানি না। জানি না বা জানতে চেষ্টা করি না—কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হল এই, জেনেও হয়ত' কখনও জানাবার এতটুকু চেষ্টা করি না। ক্ষণিক সুখের লোভে প্রকৃত সুখের ভিত্তিভূমিকে একেবারে আচ্ছাদিত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলি। হায়! কি হতভাগ্য আমরা!

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু কেঁদে ওঠে, কিন্তু কেন ? সে প্রশ্নের উত্তরে কেউ বা বলেন,—পৃথিবীর আবহাওয়া শিশুটির কাছে হঠাৎ ভয়াবহ মনে হয়, কেউ বা বলেন—শিশুটি নিজকে অসহায় মনে করে, কেউ বা বলেন—শিশুটি নিজের সুখগহ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বলে। মা শিশুটিকে কোলে করলেই শিশুর কান্না থেমে যায়। অর্থাৎ, আমরা বুঝতে পারছি, শিশুটি তার জীবনকে এক মুহূর্তের জন্যও সুখসাগর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় না। এই সুখের মধ্যে বেঁচে থাকবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিল তিল করে বড় হতে থাকে শিশুর মধ্যে। তাই শিশুরা শৈশবে মাকে কাছে পেতে চায় এবং না পেলেই কাঁদতে থাকে অনবরত।

শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে যখন ছোট্ট ছেলেটা, তখন মায়ের চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনেক বেশী সুখ পায়। তাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকে এবং সেটাই তাদের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশঃ মা শিশুর থেকে একটু দূরে সরে যান। তারপর আসে যৌবন, যৌবনের পদার্পণেই কামনা-বাসনার দোলায় দুলতে দুলতে কৃত্রিম সুখের সাগরে ভাসতে থাকে। মা তখন সরে যান অনেক দূরে, তখন সবচেয়ে বেশি প্রিয় .হয় ওঠে অন্য একজন, তারপর আসে বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক্যে নাতি-নাতনীদের নিয়ে আবার নূতন করে সংসার পেতে সুখ-সমুদ্রে বেঁচে থাকে। এই সুখ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য মানুষের কতই না আকাঙ্ক্ষা।

আর সবশেষে মৃত্যুর পর ঐ মানুষটি যাতে পরলোকে সুখে থাকতে পারে, তার জন্য হরিধ্বনি দিয়ে গীতা পাঠ, ভাগবতপাঠ করে কীর্তন গেয়ে শশ্মান-পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গেল আমাদের কৃত্রিম সুখের ক্রমপরম্পরা ডালি। সুখলোভী মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারে না, এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। এই সুখ জীবনকে প্রথমে অমৃতের দিকে ঠেলে পরে নিয়ে যায় বিষ-সাগরে। সেই বৈষয়িক সুখই হয় মানব জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা। শ্রীগীতার ভাষায়,—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

কিন্তু এই রাজস সুখকে কেন্দ্র করে একটা মানবজীবন গড়ে উঠতে পারে না। তাই আসল সুখের সন্ধানে আমাদের সুখ-পিয়াসী মনকে অতীন্দ্রিয় পথে পরিচালিত করতেই হবে। প্রকৃত সুখ হল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তথা শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তি। ভক্তি থেকে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে সুখ। এই ভক্তি কিন্তু লৌকিক ভক্তি নয়, এ ভক্তি শুধু নামাপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার ভক্তি নয়, এ ভক্তি শুধু জীবিকা উপার্জ্জনের মাধ্যম নয়, এ ভক্তি হল ভগবানকে ভালবাসার মাধ্যম। আর এই রকম ভালবাসাতে যে সুখ, তা চিরস্থায়ী, তা অমৃতের সন্ধান দেয়। কিন্তু সে ভালবাসা কতজন বাসতে পারে? সে ত' বহুজন্ম পর হয়। যখন মানুষ জানতে পারবে—যে ভগবানই সব, যখন জানতে পারে—'বহুনাং জন্মনামন্তে···বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।'

এখন প্রশ্ন, সেই প্রকৃত সুখ কেমন করে পাব এবং কবে পাব? এই সুখ পেতে গেলে আমাদের বহু জন্ম অপেক্ষা করতে হয়। শুধু অপেক্ষা করলেই হবে না, আমাদের আজই এই মুহূর্ত্ত থেকেই ভগবানকে ভালবাসতে হবে। সে ভালবাসা কেমন? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষায় বলতে হয়,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥

আমি যা করব, যা ভাবব, যা কিছু খাব; সবই তাঁকে সমর্পণ করব। আমার ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, কাজ-অকাজ আমি তাঁকেই নিবেদন করব। আমার কোন-রকম স্বকীয়তা থাকবে না। সেই পরম পুরুষই হবেন আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, আদর্শ। আমি তাঁকে ভালবাসব নীল আকাশকে ভালবাসার মত।

পরমপুরুষকে ভালবাসতে থাকলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাব আমরা। এ সুখ হল সেই সুখ; যার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নেই, যার মধ্যে আগে-পিছে বেদনার কথা নেই। শুধু আছে পরম সুখের ছোঁওয়া, আমাদের প্রত্যেককেই সেই সুখের সন্ধানে যেতে হবে। বর্ত্তমানে কৃত্রিম সুখে না ভুলে, বিষকে অমৃত না ভেবে, অমৃতকে অমৃত ভাববার অবকাশ প্রয়োজন। সবধর্ম্ম ছেড়ে শুধুমাত্র তাঁর শরণ নিয়ে পরম সুখের সাগরে ভাসবার সময় এসেছে আজ। সেই সময়কে পায়ে না ঠেলে, সোণায় সোহাগা সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের। আমাদের জীবনের মহামন্ত্র হবে—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।'

প্রকৃত সুখ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য অনন্তকাল ধরে। আমরাই কেবল সোণা ছেড়ে কাচের পিছনে ছুটছি। আর নয়। এবার তাঁর শ্রীচরণে ভরসা রেখে, তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে সত্যিই ভালবাসব।

—**শ্রীমতী কুহু বেরা**, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও 'শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব' বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা ও তদীয় প্রিয়পার্ষদ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রকট-তিথিবরা উপলক্ষে বিগত ২৬শে মাঘ (ইং ৯।২।৯৩), মঙ্গলবার হইতে ২৮শে মাঘ ইং ১১।২।৯৩), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান-সূচী কলিকাতার বহুল প্রচারিত 'বর্ত্তমান', 'আনন্দবাজার' ও 'আজকাল' পত্রিকায় তিনদিন প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে প্রথম দিবসে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির আবির্ভাব-তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে তদীয় চরিতাবলী পাঠ এবং পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি এবং সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও উপস্থিতিতে স্তবপাঠ, অঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি সকল অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃগণের বক্তৃতান্তে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৭শে মাঘ (ইং ১০।২।৯৩), বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রীব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে বিভিন্ন বক্তাগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-ধারার বিভিন্ন দিগ্‌দর্শনপূর্ব্বক বক্তব্য রাখেন।

২৮শে মাঘ (ইং ১১।২।৯৩), বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও স্তবপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ ও কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও অবদান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। অদ্য মধ্যাহ্নে উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বলাবাহুল্য এই শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সমিতির সকল শাখামঠসমূহেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবে

"গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি"র প্রতিষ্ঠাতা।
ভারতে বহু গৌড়ীয় মঠ-প্রাণদাতা॥
বৈষ্ণব-বিশ্বের স্তম্ভ, শ্রীমৎ কেশব।
আমাদের সকলের জীবনের সব॥
বাহিরে বজ্রসম, অন্তরে কোমল।
ঠিক যেন পরিপূর্ণ সু-পবিত্র জল॥
জীবের গতিতে যাঁ'র ব্যথিত হৃদয়।
করুণায়-বেদনায় বিগলিত হয়॥
তাঁর পুতঃ পদধ্বনি বছরে বছরে।
পরম শান্তির বাণী জীবচিত্ত ভরে॥
মানব-কল্যাণে আসে এক শুভলগ্ন।
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হয় আনন্দেতে মগ্ন॥
মাঘী-কৃষ্ণ-তৃতীয়া তেরশো চার সন।
মহারাজ শ্রীকেশব আবির্ভূত হন॥

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,** (সেবাসুহৃদ্) সাংবাদিক পি. টি. আই.

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২৫·০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১৪·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া** পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা 'প্রকাশক' **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ ; ২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৮। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৯। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২০। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২১। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rai Ramananda, ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ৩৪। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য।

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B./NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কন্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—বান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)

BOOK-POST Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office Ph : 33-8973
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004